হুগলী জেলার পুরাকীর্তি

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

হুগলী জেলার পুরাকীর্তি

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা : দেবলা মিত্র
অবসরপ্রাপ্ত মহানির্দেশক
ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণ

सत्यमेव जयते

প্রত্নতত্ত্ব অধিকার
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রকাশনা এবং ©
প্রত্নতত্ত্ব অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মানচিত্র : শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ : আঁটপুরের মন্দিরের টেরাকোটা ভাস্কর্য
[প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আলোকচিত্রটি শ্রীঅপূর্ব আশ কর্তৃক গৃহীত এবং 'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত]

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, নির্ঘণ্ট, প্রুফ-নিরীক্ষা ও সার্বিক তত্ত্বাবধান :
অরিন্দম বসু, প্রত্নতত্ত্ব অধিকার

অঙ্গসৌষ্ঠব : শ্রীপ্রতাপ সিংহ, শ্রীতুলসীদাস বসাক [বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড] এবং শ্রীঅরিন্দম বসু [প্রত্নতত্ত্ব অধিকার]

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট, ১৯৯৩

মুদ্রণ : বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট,
কলিকাতা–৭০০ ০১২

মন্ত্রী
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পৌর বিষয়ক
বিভাগ এবং নগর উন্নয়ন বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

যে কোন জনগোষ্ঠী উন্নততর বিকাশের উপাদান খুঁজে পায় তার অতীত ইতিহাসের পরম্পরা থেকে। এইদিকে দৃষ্টি রেখেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পুরাকীর্তিগুলির উপর বাংলায় একটি গ্রন্থমালা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। সেই গ্রন্থমালাতে সাম্প্রতিকতম সংযোজন 'হুগলী জেলার পুরাকীর্তি'। এই গ্রন্থমালার সূচনায় প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ্ রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন—"সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থরাজি পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তি-বিষয়ক এক আকর গ্রন্থের অভাব পূরণ করিবে।" আশাকরি এই বইটিও সেই উদ্দেশ্য সাধন করবে।

হুগলী জেলার ইতিহাসে সমগ্র বাংলার ইতিহাসের মূল সূত্রটি খুঁজে পাওয়া যায়। বিভিন্ন ধারার মিশ্রণেই গড়ে উঠেছে বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি। আর এই মিশ্রণেরই নানা স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে এই জেলার সর্বত্র। এই বইটিতে এইরকম দুশর বেশী প্রত্নস্থল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আশাকরি এ বই পড়ে প্রত্নতত্ত্বের ছাত্রছাত্রী, গবেষক এবং সাধারণভাবে ইতিহাসমনস্ক জনসাধারণ উপকৃত হবেন। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, এই গ্রন্থমালায় উত্তর চব্বিশ-পরগনা জেলার পুরাকীর্তি এবং মালদহ জেলার পুরাকীর্তি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার কাজ চলছে। আমি এই প্রয়াসের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

২৯ জুলাই ১৯৯৩

(বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য)

প্রাক্-কথন

১৯৬০ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম দিকে এই অধিকার তার সংগ্রহশালার জন্য পুরাবস্তু সংগ্রহ এবং উৎখননের মাধ্যমে নতুন আবিষ্কার এই দুটি বিষয়েই বেশি মনোযোগী ছিল। ১৯৬৯ সালে প্রথম পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে-প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা পুরাকীর্তিগুলির তালিকা ও বিবরণী প্রস্তুত করা এবং সাধারণের বোধগম্য ভাষায় সেগুলি প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই প্রকল্পের সূচনায় প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছিলেন— ''সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের পুরাকীর্তিগুলির এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণী অবিলম্বে সংকলিত হওয়া প্রয়োজন এবং যোগ্যতার সহিত এ কাজটি সম্পন্ন করিতে পারিলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের দাবী করিতে পারিবেন।''

পুরাকীর্তি গ্রন্থমালার সপ্তম সংযোজন হুগলী জেলার পুরাকীর্তি। এই গ্রন্থমালায় ইতোপূর্বে বাঁকুড়া, বীরভূম, কুচবিহার, নদীয়া, হাওড়া ও মেদিনীপুরের উপর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও মালদহ জেলার পুরাকীর্তি প্রকাশিত হবে। আশা করা যায়, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সবকটি জেলার পুরাকীর্তির উপর গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হবে।

২৯.৭.৯৩

গৌতম সেনগুপ্ত
প্রত্নতত্ত্ব অধিকর্তা
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কৃতজ্ঞতা

চিত্র ৩, ৬, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ৩২, ৩৩, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২ এবং ৪৮ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক প্রণব রায় কর্তৃক গৃহীত এবং তাঁর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

চিত্র ৭, ৯, ২৬, ২৭, ২৮, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪৩ এবং ৪৪ পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত। এর ৭, ৯, ২৬, ২৭, ২৮, ৪৪ ও ৪৩ শ্রী জয়প্রকাশ কুণ্ডু কর্তৃক ; ৩৫ ও ৩৮ শ্রী অপূর্ব আশ কর্তৃক এবং ৩৬ শ্রী পুলক দাস কর্তৃক গৃহীত।

চিত্র ৩০ এবং ৩১-এর স্বত্ব ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সর্বেক্ষণ-এর।

চিত্র ৪৬ এবং ৪৭-এর স্বত্ব পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকার-এর।

চিত্র ৪৩ শ্রী তারাপদ সাঁতরা কর্তৃক গৃহীত এবং লোকশ্রুতি পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অবশিষ্ট চিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত।

পশ্চিমবঙ্গ
হুগলী জেলা
বর্ধমান জেলা
বাঁকুড়া জেলা
মেদিনীপুর জেলা
হাওড়া জেলা
নদীয়া জেলা
২৪ পরগণা (উঃ)
৮৮° পূঃ
২৩° উঃ
উত্তর
কালনা
গুপ্তিপাড়া
সোমড়া-বাজার
বলাগড়
সুখারিয়া
জিরাট
জামগ্রাম
ইলছোবা
খামারগাছি
ইনচুরা
বৈঁচি
বর্ধমান
সিমলাগড়
পাণ্ডুয়া
গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড
খন্যান
দীঘা
গুড়াপ
গুড়বাড়ি
পলাশী
ভাণ্ডারা
মহানাদ
ত্রিবেণী
মগরা
আদি সপ্তগ্রাম
বাঁশবেড়িয়া
ব্যাণ্ডেল
হুগলী
চুঁচুড়া
দ্বারবাসিনী
পুইনান
শ্রীনিবাসবাটি
রুদ্রাণী
দশঘরা
গোপীনগর
পোলবা
পাঁউনান
রামনগর
চন্দননগর
চন্দনপুর
তারকেশ্বর
ভদ্রেশ্বর
বৈদ্যবাটি
দেউলপাড়া
পুরশুড়া
চাঁপাডাঙ্গা
বাকসা
হরিপাল
বগমারবপুর
সিঙ্গুর
নসিবপুর
শেওড়াফুলি
শ্রীরামপুর
শিয়াখালা
মাহেশ
রাজবলহাট
আঁটপুর
খারহাট
জাঙ্গীপাড়া
মুন্ডেশ্বরী
কোটালপুর
জঙ্গলপাড়া
জনাই
চণ্ডীতলা
বিষড়া
কোন্নগর
কানাইপুর
বেগমপুর
কোতরং
উত্তরপাড়া
হাওড়া
রাধানগর
আরামবাগ
কামারপুকুর
শ্যামবাজার
বদনগঞ্জ
গোঘাট
গড় মান্দারন
সেলিমপুর
গৌরহাটি
খানাকুল
রাজহাটি
শিলাই নং
০ ১০ ২০
কিলোমিটার
জেলা সীমারেখা
মহকুমা সীমারেখা
সড়কপথ
রেলপথ
নদনদী
প্রত্নস্থল

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ত বিভাগের তৎকালীন মন্ত্রী শ্রী সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের পুরাকীর্তি বিষয়ে সহজ বাংলা ভাষায় লেখা জেলাভিত্তিক স্বল্পমূল্যের গ্রন্থরাজি প্রকাশের প্রকল্প গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার প্রথম গ্রন্থ "বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি"। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে; লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরবর্তী কয়েক বৎসরে আরও কয়েকটি জেলার প্রত্নকীর্তির উপরে পুস্তক প্রকাশিত হয়ঃ "বীরভূম জেলার পুরাকীর্তি" (১৯৭২), লেখক দেবকুমার চক্রবর্তী; "কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি" (১৯৭৪), লেখক শ্যামচাঁদ মুখার্জী; "নদীয়া জেলার পুরাকীর্তি" (১৯৭৫), লেখক মোহিত রায়; "হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি" (১৯৭৬), লেখক তারাপদ সাঁতরা, "মেদিনীপুর জেলার প্রত্ন-সম্পদ" (১৯৮৬), লেখক প্রণব রায়; এবং "পুরাকীর্তি সমীক্ষাঃ মেদিনীপুর" (১৯৮৭), লেখক তারাপদ সাঁতরা।

পুরাকীর্তিগুলির অনুসন্ধান ও অনুধ্যান এবং প্রাচীন শিল্প-সংস্কৃতিগত ঐতিহ্যের অনুশীলন ও বিশ্লেষণ জাতির অগ্রগতির পথে একান্ত প্রয়োজনীয়। বস্তুত, সমাজচেতনায় ও সভ্যতার মূল্যায়ণে প্রত্নতত্ত্বের গুরুত্ব যে অপরিমেয় তা আজ সর্বজন স্বীকৃত। বাংলাভাষায় সহজভাবে লেখা এই পুরাকীর্তির বর্ণনা পড়ে বাঙ্গালী পাঠকেরা নিজ জন্মভূমির প্রত্ন-সম্পদ ও কৃষ্টির ঐশ্বর্যময় দিকটির প্রতি সচেতন হবেন এবং নূতন আবিষ্কার ও পুরাকীর্তির সংরক্ষণের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন। অজানা পুরাকীর্তি ও পুরাবশেষ তাঁদের গোচরীভূত হলে সঙ্গে সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করাবেন। কালস্রোতে ও বিভিন্ন বিপর্যয়ের ফলে বহু প্রত্নকীর্তি আজ লুপ্ত। যেগুলি এখন টিকে আছে, সেগুলির ক্ষতি যাতে আর না হয় তার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখবেন।

পুরাকীর্তি গ্রন্থরাজিতে নতুন সংযোজন "হুগলী জেলার পুরাকীর্তি"। লেখক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড: নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। উল্লেখযোগ্য স্থানগুলির পুরাকীর্তি বিষয়ে তিনি বিবরণ ও তথ্যভিত্তিক ইতিবৃত্ত পরিবেশন করেছেন। এই বিষয়ে যে সকল তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং যে সকল

গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার সকল উপাদানই এই গ্রন্থে উদ্ঘাটিত। এর ফলে হুগলী জেলার পুরাকীর্তি ও পুরাবস্তুর সম্বন্ধে একটি পরিষ্কার চিত্র এই গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। আমার বিশ্বাস, উৎসাহী জনসাধারণ এই গ্রন্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত হবেন এবং গবেষকরাও হবেন উপকৃত। আশা করা যায় এই গ্রন্থরাজিতে প্রকাশিত পুস্তকগুলির মত এই গ্রন্থটিও জনপ্রিয়তা অর্জন করবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের এই সাংস্কৃতিক প্রয়াস জনগণের অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করবে, বিশেষ করে যখন সমস্ত জেলাগুলির পুরাকীর্তির বিবরণী প্রকাশিত হবে।

দেবলা মিত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

'হুগলী জেলার পুরাকীর্তি' রচনার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্তবিভাগের তরফ থেকে আমাকে অর্পণ করা হয় ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক প্রকল্পটি পরিত্যক্ত অথবা স্থগিত অথবা বাক্সবন্দী হয়ে যায়। স্বাভাবিকভাবে আমিও হাত গুটিয়ে বসে থাকি, যদিও বর্তমান গ্রন্থে ব্যবহৃত তথ্যাবলী তখনই সংগৃহীত হয়। দীর্ঘকাল পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ প্রকল্পটিকে আবার পুনরুজ্জীবিত করেন এবং এটিকে কার্যকর করার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের উপর অর্পিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই বিভাগের প্রত্যেকেই হয় আমার বন্ধু নয় আমার ছাত্র, কেননা নিজের পেশাগত কারণে এই বিভাগের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বরাবরই খুব ঘনিষ্ঠ। বস্তুতঃ এই বিভাগের অধিকর্তা শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত, প্রাক্তন উপ-অধিকর্তা শ্রীশ্যামচাঁদ মুখোপাধ্যায় এবং অধীক্ষক শ্রীমতী শাশ্বতী চক্রবর্তীর চাপে পড়ে এবং প্রধান সম্পাদিকা শ্রীমতী দেবলা মিত্রের অনুপ্রেরণায় কাজটাকে দ্রুত সম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে যেহেতু এই গ্রন্থের অধিকাংশ তথ্য প্রায় আঠারো বছর পূর্বে সংগৃহীত, কোন কোন ক্ষেত্রে বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির কিছুটা অসঙ্গতি থাকতেই পারে। অনেক পুরাকীর্তি একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে যা কিছুকাল আগেও বর্তমান ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ চুঁচুড়ার ডাচ গীর্জাটির কথা বলা যায় যেটিকে মাত্র পাঁচ বছর আগেই ভেঙে ফেলা হয়েছে। এই ধরনের অসঙ্গতির জন্য পাঠকদের মার্জনা ভিক্ষা করি। এছাড়া কিছু কিছু পুরাকীর্তি বা কোন স্থান হয়ত নজর এড়িয়ে গেছে। এমনও দু'একটি ক্ষেত্র আছে যেখানে প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ সম্ভব হয়নি, সেক্ষেত্রে অপরের রচনার সাহায্য নিতে হয়েছে। এই সকল ত্রুটি পরবর্তী সংস্করণে নিশ্চয়ই সংশোধিত হবে। এই গ্রন্থে চিত্রাবলী ছাড়াও একটা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী দেওয়া হয়েছে। যাঁরা হুগলী নিয়ে বিশদ গবেষণা করতে চান এই গ্রন্থপঞ্জী তাঁদের কাজে লাগবে। গ্রন্থটি রচনার কাজে প্রয়াত সুধীরকুমার মিত্রের নিকট যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আর যাঁরা সহায়তা করেছেন তাঁদের মধ্যে শবরী ঘোষাল, অমল চট্টোপাধ্যায়, প্রণব রায়, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাসচন্দ্র পাল ও অমলা দাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকারের শ্রী অরিন্দম বসু গ্রন্থটির মুদ্রণ ও সৌকর্যসাধনের ব্যাপারে বিশেষ সহায়তা করেছেন। এঁদের সকলের নিকটই আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

১ ॥ হুগলী: নাম প্রসঙ্গ

হুগলী জেলার নামকরণ এই জেলার অন্যতম প্রধান শহর হুগলীর নামানুসারে হয়েছে। হুগলী নামটির উৎপত্তির প্রকৃত কারণ অজ্ঞাত। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে ষোড়শ শতকের অপরার্ধে পর্তুগীজ বণিকেরা সপ্তগ্রাম থেকে সরে এসে এতদঞ্চলে তাদের পণ্য মজুত করার জন্য যে সকল গুদাম বা গোলা তৈরি করেছিল, সেই 'গোলা' শব্দ থেকেই হুগলীর নামকরণ হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পর্তুগীজ ভাষায় 'গোলা' শব্দের অর্থ দুর্গপ্রাকারের বহির্দেশের উপরিভাগের উদ্গত অংশ। সেই হিসাবে হুগলী নামটির সঙ্গে কোন দুর্গের সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। যদুনাথ সরকারের মতে পর্তুগীজদের মুখের ভাষায় যা 'ও-গোলিম' বা 'ও-গোলি', বাঙালীর জিহ্বায় তা 'হুগলী' নামে উচ্চারিত হয়েছে। শম্ভুচন্দ্র দে অবশ্য ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর মতে অতীতে এখানে ভাগীরথীর তীরে প্রচুর হোগলা গাছ ছিল এবং এই হোগলা গাছ থেকেই হুগলী নামটি বিকৃত হয়ে 'গোলিন' বা 'গোলিম' হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন যে ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে হুগলী নামটি সুস্পষ্টভাবেই উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে যে সাতগাঁও এবং হুগলী বন্দরদ্বয় মাত্র অর্ধ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত ছিল এবং উভয় বন্দর ছিল বিদেশীদের প্রভাবাধীন। আইন-ই-আকবরীর রচনার অল্প কিছুকাল পরে রচিত পর্তুগীজ লেখক ফারিয়া সোউজার গ্রন্থে 'গোলিন' নামটি ব্যবহৃত হয়েছে। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হিউগেস ও পার্কারের পত্রাবলীতে হুগলীকে 'গোল্লিন' নামে অভিহিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ লেখক মাথুজ ফান দেন ব্রুক এই অঞ্চলটিকে *Oegli* এবং *Hoegli* নামে আখ্যাত করেছেন যা দেশী 'হুগলী' নামের কাছাকাছি। তাই শম্ভুচন্দ্রের মতে হুগলী কোন বিদেশীদের দেওয়া নাম নয়। তৃতীয় একটি মত অনুযায়ী পর্তুগীজরা ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে বর্তমান হুগলী জেলখানা ও বাবুগঞ্জের অন্তর্বর্তী অঞ্চলে গোলঘাট (গোলগোট, গোলগোটা, গোলগোথা, ঘোলঘাট) নামক স্থানে দুর্গ নির্মাণ করে, এবং এই গোলঘাট দুর্গ থেকেই হুগলীর সূচনা হয়। ডি. জি. ক্রফোর্ড এই ধারণা পোষণ করতেন। গোলঘাটকে কেন্দ্র করে হুগলী নগরীর গড়ে ওঠা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়, কিন্তু হুগলী নামটি কিছুতেই গোলঘাট থেকে নিষ্পন্ন হতে পারে না।

১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত জাও দে বারোজের মানচিত্রে হুগলী নামক কোন স্থানের উল্লেখ নেই, কিন্তু ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রালফ ফিচ সুস্পষ্টভাবেই হুগলীকে *(Hugeli)* পর্তুগীজ অঞ্চল বলে উল্লেখ করেছেন। ১৬১৬ এবং ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগীজ লেখক বোকার্‌রো হুগলীকে যথাক্রমে *Ogolim* এবং *Ugolim* বলে অভিহিত করেন। মুসলমান লেখকগণ কিন্তু বরাবরই হুগলী নামটি ব্যবহার করেছেন। আবুল ফজলের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল হামিদ লাহোরী হুগলী বন্দর এবং সেখানে পর্তুগীজ প্রাধান্যের কথা বলেছেন। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মানওয়েল *Golim* নামটি ব্যবহার করেছেন। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ের হুগলীকে *Ogouli* বলে উল্লেখ করেছেন। কর্নেল ইউল সম্পাদিত হেজের ডায়েরীতে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের যে সকল নথিপত্র সন্নিবিষ্ট হয়েছে তাতে *Hugly, Hughley, Hukely, Hukley, Hewgly, Hewghly* প্রভৃতি বিচিত্র বানানে হুগলীকে পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে হ্যামিলটন *Hughly*, মধ্যভাগে আইভ্‌স *Houghley* এবং শেষভাগে স্টাভোরিনাস ও ফ্রান্সিস *Houghly, Hughley* প্রভৃতি বানান ব্যবহার করেছেন। সীটন কার, জেমস লঙ প্রভৃতি লেখকেরাও 'হুগলী' বানানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে সরস্বতী নদী ষোড়শ শতকে পলি জমে মজে যেতে শুরু করলে সপ্তগ্রামের অবনতি ঘটে, এবং তখনই পর্তুগীজ বণিকেরা হুগলীতে তাদের কর্মকেন্দ্র সরিয়ে নিয়ে আসে। হুগলীকে তারা *Porto Pequeno* আখ্যা দিয়েছিল। কিন্তু ষোড়শ শতকের ষষ্ঠ দশকের পূর্ব পর্যন্ত হুগলী সম্পর্কে পর্তুগীজদের কোন আগ্রহ ছিল না। ভিনিসীয় পর্যটক ফেদেরিচি, যিনি ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম পরিভ্রমণ করেন, হুগলীর কোন উল্লেখই করেন নি। হুগলীতে পর্তুগীজদের প্রথম বসতির কাল সঠিকভাবে নির্ণয় করার অসুবিধা আছে, যদিও পর্তুগীজ দিয়েগো রেবেল্লো ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তগ্রামে আসেন। প্রথমে ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান মাহমুদ শাহের নিকট থেকে এবং পরে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের নিকট থেকে সনদ পেয়ে তারা বেশ জাঁকিয়ে বসে। কেননা ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দেই সপ্তগ্রামের ভারপ্রাপ্ত মুঘলদের ফৌজদার মীর্জা নজত খান উড়িষ্যার কতলু লোহানীর নিকট পরাজিত হয়ে হুগলীর পর্তুগীজ গভর্নরের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করেন।

২ ॥ সীমানা : প্রাকৃতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিভাগ

হুগলী জেলা (অক্ষাংশ ২২° ৩৯′ ৩২″—২৩° ০১′ ২০″ উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশ ৮৭° ৩০′ ২০″—৮৮° ৩০′ ১৫″ পূর্ব) ভাগীরথী বা হুগলী নদীর

পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই জেলার উত্তরে বর্ধমান, উত্তর-পশ্চিমে বাঁকুড়া, পশ্চিমে মেদিনীপুর ও দক্ষিণে হাওড়া অবস্থিত। মানচিত্রে হুগলী জেলাকে একটি প্রজাপতির মত দেখায় যার পশ্চিমমুখী ক্ষুদ্রতর পক্ষটি মেদিনীপুর সংলগ্ন এবং পূর্বমুখী বৃহত্তর পক্ষটি ভাগীরথীকে স্পর্শ করে। দুইটি পক্ষের মধ্যবর্তী দামোদর নদ সোজাসুজি উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত। হুগলী জেলার মোট আয়তন ১২১৬ বর্গমাইল বা ৩১৪৯.৪ বর্গকিলোমিটার (অপর একটি পরিমাপ অনুযায়ী ১২১২.১ বর্গমাইল বা ৩১৩৯.৩ বর্গকিলোমিটার)।

হুগলী জেলাকে দুইটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা যায়—পলিবাহিত সমভূমি অঞ্চল এবং উচ্চভূমি অঞ্চল। দারকেশ্বর নদ এই দুই অঞ্চলকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করে। হুগলী জেলার সর্বাধিক অংশই পলিনির্মিত সমভূমি অঞ্চল। এই অঞ্চলকে তিনটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়—দারকেশ্বর-দামোদর বিধৌত সমভূমি, দামোদর-ভাগীরথী বিধৌত সমভূমি এবং চরভূমি। দারকেশ্বরের পশ্চিমের উচ্চভূমির মোট এলাকা ৩৭৮ বর্গকিলোমিটার, সমগ্র জেলার এক-অষ্টমাংশ। সর্বোচ্চে অবস্থিত বদনগঞ্জ এলাকায় বাঁকুড়া পর্বতাঞ্চলের অবশেষ স্বরূপ এখানে ওখানে পাথরের চাঙড় দেখা যায়। উচ্চভূমির ঢাল উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বমুখী।

দামোদর ও ভাগীরথী নদীদ্বয় বরাবরই হুগলী জেলার ভাগ্যনিয়ন্তার ভূমিকা পালন করেছে। দুটি নদীই তাদের গতিপথ বারবার পরিবর্তন করেছে যার প্রভাব হুগলীর জনজীবন ও বসতিবিন্যাসের উপর প্রচণ্ডভাবে পড়েছে। হুগলী জেলার জনবসতির বিকাশ উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম দিক থেকে দামোদর ও তৎসংলগ্ন নদীগুলিকে অবলম্বন করে শুরু হয়েছিল এবং তার ব্যাপ্তি ঘটেছিল পূর্বদিকে সরস্বতী নদী পর্যন্ত। পূর্বে ভাগীরথীর মূল ধারাটি সরস্বতী নদীর খাত দিয়েই প্রবাহিত হত এবং এই সরস্বতীর কূলেই গড়ে উঠেছিল সপ্তগ্রাম বন্দর। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সরস্বতীতে পলি জমতে শুরু করে এবং ক্রমশ এই নদী নাব্যতা হারিয়ে ফেলে। সরস্বতীর গতি রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে ভাগীরথীর বর্তমান ধারাটি কিছুটা পুষ্টিলাভ করে এবং ভাগীরথীর পশ্চিমাঞ্চল ক্রমশ সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চল ছাড়া আরও কয়েকটি নদী অঞ্চলে হুগলী জেলাকে ভাগ করা যায়। শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর রেললাইনের উত্তরে ঘিয়া-কুন্তী অববাহিকা এবং ওই একই রেলপথের দক্ষিণে সমগ্র শ্রীরামপুর মহকুমা এবং হরিপাল ও সিঙ্গুরসহ গঙ্গা-দামোদর অন্তর্বিভাগ মোটামুটিভাবে দামোদর, সরস্বতী-কুন্তী, ঘিয়া, কানা নদী বা কানা দামোদর, কৌশিকী, বেহুলা, কান্তুল প্রভৃতি নদীর দ্বারা গঠিত। তৃতীয় অঞ্চলটি দামোদর অববাহিকায়

বর্তমান পুরশুড়া থানা এবং ধনিয়াখালি, তারকেশ্বর ও জাঙ্গীপাড়ার পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত। আরামবাগ মহকুমার অবশিষ্ট অঞ্চল দামোদর-উত্তর ভূভাগ যা দারকেশ্বর, রূপনারায়ণ, রণের খাল, তারাজুলি, কানা দারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী প্রভৃতি নদীনির্ভর।

পূর্বে হুগলী জেলা বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য বর্ধমান জেলাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, এবং বর্ধমানের দক্ষিণাংশ নিয়ে হুগলী জেলার সৃষ্টি করা হয়। তখন সমগ্র হাওড়া জেলা এবং মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত চন্দ্রকোনা ও ঘাটাল হুগলী জেলার মধ্যে ছিল। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া জেলাকে হুগলী থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। ১৮৮১-র পূর্ব পর্যন্ত হুগলী জেলা দুইটি মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল—সদর ও শ্রীরামপুর। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে জাহানাবাদ নামক একটি পৃথক মহকুমার সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু বিহারের গয়া জেলায় আর একটি জাহানাবাদ থাকার দরুন ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীর জাহানাবাদ মহকুমার নাম পরিবর্তন করে আরামবাগ রাখা হয়। হুগলীর চতুর্থ মহকুমা চন্দননগরের সৃষ্টি হয় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে।

হুগলী জেলার মহকুমা চতুষ্টয় একুশটি থানায় বিভক্ত। সদর মহকুমায় চুঁচুড়া, পোলবা, দাদপুর, ধনিয়াখালি, মগরা, পাণ্ডুয়া ও বলাগড়; শ্রীরামপুর মহকুমায় শ্রীরামপুর, উত্তরপাড়া, চণ্ডীতলা, ডানকুনি ও **জাঙ্গীপাড়া**; আরামবাগ মহকুমায় আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল ও পুরশুড়া এবং চন্দননগর মহকুমায় চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, হরিপাল, সিঙ্গুর ও তারকেশ্বর। পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর পৌর অঞ্চলগুলি ছাড়া জেলার সর্বত্র গ্রামাঞ্চলকে আঠারোটি ব্লকে এবং ২০১টি পঞ্চায়েত অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। এই আঠারোটি ব্লকের নাম চুঁচুড়া-মগরা, পাণ্ডুয়া, বলাগড়, পোলবা-দাদপুর, ধনিয়াখালি, সিঙ্গুর, হরিপাল, তারকেশ্বর, শ্রীরামপুর-উত্তরপাড়া, চণ্ডীতলা-১, চণ্ডীতলা-২, জাঙ্গীপাড়া, পুরশুড়া, আরামবাগ, গোঘাট-১, গোঘাট-২, খানাকুল-১ এবং খানাকুল-২।

হুগলী জেলাকে তিনটি সুনির্দিষ্ট অঞ্চলে বিভক্ত করা যায়—শহরাঞ্চল, আধা-শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল। শহরাঞ্চল বলতে উত্তরপাড়া থেকে ত্রিবেণী পর্যন্ত গঙ্গাতীরবর্তী এলাকাকে বোঝায় যার পশ্চিম সীমা হাওড়া-ব্যাণ্ডেল রেলপথ পর্যন্ত প্রসারিত। আরামবাগ **ব্যতিরেকে** সকল পৌর ও মহকুমা শহর এই এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আধা-শহরাঞ্চল বলতে গঙ্গাতীরে উত্তর বরাবর ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লুপ লাইন, শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর রেলপথের উপর কিছু কিছু এলাকা এবং ব্যাণ্ডেল-বর্ধমান **রেল ও** সড়কপথের নিকটস্থ অঞ্চলগুলিকে বোঝায়। জেলার অবশিষ্ট অংশ মোটের উপর গ্রামাঞ্চল। মহকুমা শহর হিসাবে ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও আরামবাগ হুগলী জেলার অন্যান্য আধা-শহরাঞ্চলগুলির

মত কার্যত একটি পরিবর্ধিত গ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়। তারকেশ্বরের পরিচিতি নিছকই তীর্থস্থান হিসাবে। স্বাধীনতার পর যোগাযোগ ও পরিবহনব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার ফলে কিছু কিছু গ্রাম অবশ্যই গঞ্জে রূপান্তরিত হয়েছে। আধুনিক ধরনের ঘরবাড়ি, হিমঘর, দোকানবাজার, সিনেমাগৃহ প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চলেও দেখা গেছে। তৎসত্ত্বেও মূল অঞ্চলবিন্যাসের ক্ষেত্রে কোনও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি।

৩॥ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

হুগলী জেলায় প্রাগৈতিহাসিক বা আদি ঐতিহাসিক যুগের কোন নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়নি। গঙ্গা-দামোদর ও তাদের উপ ও শাখানদীগুলির ঘনঘন গতি পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট যে পলি সঞ্চয়ের উপর হুগলী জেলার সমভূমি গড়ে উঠেছে সেখানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন নিদর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। একমাত্র গোঘাট থানার কোন কোন অংশে মাকড়ার সমাবেশের মধ্যে হয়ত কোন প্রাগৈতিহাসিক আয়ুধ পাওয়া যেতে পারে, যদিও এখনও কিছু পাওয়া যায়নি।

প্রাচীন রচনাসমূহের সাক্ষ্য থেকে অনুমিত হয় যে প্রাচীন যুগে হুগলী জেলা সুহ্ম বা দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল। রাঢ় অঞ্চলের অপর একটি অংশের নাম ছিল বজ্রভূমি। এতদঞ্চলে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর একদা পরিভ্রমণ করেছিলেন বলে জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। **সুহ্ম** জনপদের কথা আচারাঙ্গসূত্র, কল্পসূত্র, ভগবতীসূত্র প্রভৃতি জৈন শাস্ত্রগ্রন্থ ছাড়াও মহাভারত, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা, পতঞ্জলির মহাভাষ্য ও বিভিন্ন পুরাণে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ **সংযুক্তনিকায়** এবং জাতকসমূহেও **সুহ্ম** জনপদ উল্লিখিত হয়েছে। সিংহলী মহাবংশ ও দীপবংশে বলা হয়েছে যে বিজয়সিংহের পিতা সীহবানু লাঢ় বা লাট বা রাঢ়দেশের অধিপতি ছিলেন এবং তাঁর রাজধানী ছিল সীহপুর বা সিংহপুর। এই লাঢ় বা রাঢ় রাষ্ট্র যে পশ্চিমবঙ্গের রাঢ়ভূমি একথা জোর দিয়ে বলা যায় না, কেননা গুজরাতেও একটি লাট অঞ্চল বর্তমান ছিল এবং সেই অঞ্চলটিরও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি ঘটেছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক বিজয়সিংহের রাজধানী সিংহপুরকে হুগলী জেলার সিঙ্গুরের সঙ্গে সনাক্ত করেন। বলা বাহুল্য এ সবই অনুমানমূলক।

গ্রীক লেখকেরা গাঙ্গেয় যে অঞ্চলটিকে গাঙ্গারিদেই বলে উল্লেখ করেছেন তার সঙ্গে হুগলী জেলাকে সম্পর্কিত করার চেষ্টা অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিক করেছেন, যদিও এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে বলার মত কোন তথ্য আমাদের হাতে নেই। গ্রীক লেখকেরা গাঙ্গারিদেই বলতে নিম্নগাঙ্গেয় অঞ্চলের একটা ব্যাপক এলাকাকে বুঝিয়েছেন। টলেমি এবং **'পেরিপ্লাস'** গ্রন্থের লেখক গাঙ্গে নামক একটি বন্দরনগরীর উল্লেখ করেছেন। টলেমি বলেন যে সমুদ্রগামী গঙ্গার পাঁচটি

ধারার মধ্যে দ্বিতীয়টি মেগা নামে পরিচিত ছিল এবং তারই কুলে গাঙ্গে-রেগিয়া নগরী গড়ে উঠেছিল। স্ত্রাবো অবশ্য গঙ্গার একটি ধারার কথাই বলেছেন, যেখানে প্লিনি বলেছেন বহু ধারার কথা। এগুলিকে সনাক্ত করা দুঃসাধ্য। অনেকে টলেমি-বর্ণিত মেগার সঙ্গে ভাগীরথীকে এবং অন্যান্য ধারার সঙ্গে সরস্বতী প্রভৃতি নদীকে সনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ সমস্তই ব্যক্তিগত অনুমাননির্ভর।

মৌর্যযুগে হুগলীর ঐতিহাসিক অবস্থান কিরকম ছিল, তা মৌর্য সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল কিনা এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। হিউয়েন সাঙ বলেছেন যে তিনি পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তিতে অশোক-নির্মিত স্তূপ দেখেছিলেন। যেহেতু এই চারটি অঞ্চল হুগলী জেলার চারদিকে দূরবর্তীভাবে পড়ে, সেইহেতু পারিপার্শ্বিক এবং কিছুটা নেতিমূলক সাক্ষ্যের সাহায্যে ধরে নিতে পারা যায় যে হুগলী হয়ত মৌর্যদের অধিকারে ছিল। বগুড়া জেলার মহাস্থানে প্রাপ্ত খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের একটি লেখে বঙ্গদেশে মৌর্যাধিকারের পরিচয় থাকলেও সেই অধিকারের সীমা কতদূর ছিল জানা যায় না।

হুগলী জেলার মহানাদ থেকে কুষাণ ও গুপ্ত আমলের কয়েকটি মুদ্রা পাওয়া গেছে। বঙ্গদেশে গুপ্ত অধিকারের বিস্তৃতি ঘটেছিল, এবং অনুমান করা যায় যে হুগলী জেলাসহ সমুদয় রাঢ় অঞ্চল গুপ্তদের অধীন ছিল। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে জানা যায় যে তিনি চন্দ্রবর্মা নামক একজন নৃপতিকে পরাজিত করেছিলেন। এই চন্দ্রবর্মার সঙ্গে শুশুনিয়া-লেখে উল্লিখিত ওই একই নামের জনৈক নৃপতিকে সাধারণভাবে সনাক্ত করা হয়ে থাকে, যাঁর শাসনকেন্দ্র ছিল বাঁকুড়া জেলার পুষ্করণ নামক স্থানে। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে যখন তাঁর নাম করা হয়েছে তখন ধরে নিতে হবে যে তিনি নেহাত ছোটখাট রাজা ছিলেন না, বাঁকুড়াকে কেন্দ্র করে অনেকটা অঞ্চল নিয়ে তিনি রাজত্ব করতেন এবং বাঁকুড়ার সন্নিহিত হুগলী জেলাও তাঁর রাজ্যসীমার মধ্যে ছিল। তাঁকে পরাজিত করেই সমুদ্রগুপ্ত রাঢ় অঞ্চলকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের কুক্ষিগত করেন।

খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের গোড়ার দিকে, গুপ্তযুগের শেষ পর্যায়ে, রাঢ় অঞ্চলের কিছু অংশ বর্ধমানভুক্তি নামে পরিচিত ছিল। সম্ভবত হুগলী জেলা তখন এই বর্ধমানভুক্তির অন্তর্গত ছিল। এই বর্ধমানভুক্তির শাসক ছিলেন বিজয়সেন যিনি গুপ্তবংশীয় বৈন্যগুপ্তের অধীন ছিলেন। গোপচন্দ্রের মল্লসারুল তাম্রশাসনেও এই বর্ধমানভুক্তির উল্লেখ আছে। গোপচন্দ্রও গুপ্তদের সামন্ত নৃপতি ছিলেন এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের যুগে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁর রাজত্ব

পূর্ববঙ্গেও প্রসারিত হয়। ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া থেকে প্রাপ্ত তাঁর অপর একটি তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে বৈন্যগুপ্তের অধীন অঞ্চলগুলি তাঁর হাতে এসেছিল, এবং সেই হিসাবে হুগলী জেলাও তাঁর অধিকারে ছিল এমন অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু অনুমান প্রমাণ নয়।

গুপ্তসাম্রাজ্যের ভাঙনের যুগে গৌড়, বঙ্গ, সমতট প্রভৃতি নামে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বিভাজন ঘটে। এই নবগঠিত রাজ্যগুলির তৎকালীন প্রকৃত সীমানা কি ছিল তা নিয়ে সংশয় আছে। মৌখরি বংশীয় রাজা ঈশানবর্মার সঙ্গে গৌড়ের রাজার সংঘাত হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাংশে, যা থেকে মনে হয় যে রাঢ় অঞ্চলের বেশ কিছু অংশ গৌড়ের অধীন হয়েছিল। গৌড়াধিপ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ, বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার চিরুটি রেল স্টেশনের নিকট রাঙামাটি-কানসোনাপুর। শশাঙ্কের রাজ্যসীমার যে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় সেই পরিপ্রেক্ষিতে নিঃসংশয় হয়ে বলা যায় যে হুগলী জেলা ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শশাঙ্কের অধিকারে ছিল। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অষ্টম শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বঙ্গদেশে একটা ব্যাপক নৈরাজ্য চলেছিল যাকে মাৎস্যন্যায় আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

পালবংশীয় নৃপতিরা বঙ্গবিহারে তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করলেও, তাঁদের রাজত্বের গোড়ার দিকে হুগলী জেলায় একটি শূর বংশের অধিকার বজায় ছিল। এই শূরেরা হয় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন, না হয় পালদের সামন্ত নৃপতি হিসাবে দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। ধর্মপালের রাজত্বকালে উড়িষ্যার ভৌম-কর রাজবংশের প্রথম শিবকর রাঢ় অঞ্চল কিছুকালের জন্য অধিকার করেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন সম্ভবত উক্ত শূর বংশের কোন নৃপতি যিনি অপর-মন্দার অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। অপর-মন্দার নামক রাজ্যটি রূপনারায়ণ ও দামোদরের মধ্যবর্তী আরামবাগ মহকুমাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। আজও পর্যন্ত গড়-মান্দারণ নামটির মধ্যে মন্দার শব্দটি খুঁজে পাওয়া যায়। নবম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে উড়িষ্যার শুল্কিবংশীয় ভৌম-করদের সামন্তরাজা রণস্তম্ভ দক্ষিণ রাঢ়ের কিছু অংশ অধিকার করেন। দশম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এই এলাকা কিছুকালের জন্য চন্দেল্লবংশীয় রাজা ধঙ্গের অধীন হয়। বঙ্গদেশের উপর পালদের অধিকার তখন শিথিল হয়ে গেলেও হুগলী অঞ্চলে তখনও শূরদের অধিকার বর্তমান ছিল।

দক্ষিণের চোলবংশীয় রাজা রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালাই লেখ থেকে জানা যায় যে তাঁর বঙ্গদেশ অভিযানের সময় (১০২১-২৩) দক্ষিণ রাঢ়ের রণশূর নামক নৃপতি তাঁর নিকট পরাজিত হয়েছিলেন। এই রণশূর অপর-মন্দারে রাজত্ব করতেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে অপর-মন্দারের নৃপতি লক্ষ্মীশূর বিশেষ

শক্তিশালী সামন্ত রাজা হিসাবে উল্লিখিত হয়েছেন। যে কয়জন সামন্তরাজার সহায়তায় পালবংশীয় রাজা রামপাল নিজ অধিকার পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিলেন লক্ষ্মীশূর তাঁদের অন্যতম ছিলেন।

পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ মেদিনীপুরের মধ্য দিয়ে মন্দার রাজ্য আক্রমণ করেন এবং ওই রাজ্যের রাজধানী আরাম্য (আরামবাগ) লুণ্ঠন করেন। অনন্তবর্মার এই অভিযান ঘটেছিল ১১৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে। এই সময় মন্দার রাজ্য বলতে যে পুরো হুগলী জেলাকেই বোঝাত তার প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে অনন্তবর্মার লেখসমূহে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এই যুদ্ধ ঘটেছিল ভাগীরথীর তীরে। জনশ্রুতি অনুযায়ী, অনন্তবর্মা ত্রিবেণীতে একটি ঘাটের প্রতিষ্ঠা করেন।

পরবর্তীকালে হুগলী সেনবংশীয় রাজাদের অধিকারে আসে। সেনবংশের বিজয়সেন, যিনি ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন, ভাগীরথী ও সরস্বতীর সংযোগস্থলে অবস্থিত ত্রিবেণী অধিকার করেন এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে নিজ নামানুসারে বিজয়পুর নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। হুগলীর সঙ্গে বিজয়সেনের প্রত্যক্ষ সম্পর্কের পরিচয় তাঁর বারাকপুর তাম্রশাসন থেকে পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছে যে তিনি দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত অপর-মন্দার রাজ্যের শূরবংশীয়া রাজকুমারী বিলাসদেবীকে বিবাহ করেন। বিজয়সেন বৈবাহিকসূত্রেও অপর-মন্দার রাজ্যের অধিকার পেয়ে থাকতে পারেন। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন সমগ্র রাঢ় অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন এবং সেই হিসাবে হুগলীও তাঁর অধীন ছিল। তাঁর পুত্র লক্ষ্মণসেনও (১১৭৯-১২০৫) এই অধিকার বজায় রেখেছিলেন। বিজয়সেন প্রতিষ্ঠিত বিজয়পুর নগরকে বর্তমানে সনাক্ত না করা গেলেও ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত এই নগরের বর্ণনা লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোয়ী রচিত পবনদূত কাব্যে পাওয়া যায়।

১২০১ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে বঙ্গদেশে তুর্কী অধিকার প্রসারলাভ করতে শুরু করলেও হুগলী জেলায় তুর্কী অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে সময় লেগেছিল অনেক বেশি। দক্ষিণ রাঢ়সহ সমগ্র হুগলী জেলা সেনরাজাদের পতনের পর উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজাদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে যাদের উৎখাত করা তুর্কীবাহিনীর পক্ষে সহজে সম্ভবপর হয়নি। ত্রয়োদশ শতকের বঙ্গের তুর্কীশাসক রুকনুদ্দীন কৈকায়ুমের রাজত্বকালে (১২৯১-১৩০১) তাঁর সেনাপতি জাফরখান গাজী ত্রিবেণী ও সপ্তগ্রাম আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁর পরবর্তী শাসক সামসুদ্দীন ফিরুজ শাহের (১৩০১-১৩২২) সময়েই সপ্তগ্রামসহ হুগলীর অনেকটা অঞ্চল তুর্কী অধিকারে আসে। তিনি তাঁর নামে ত্রিবেণীর নতুন নামকরণ করেন ফিরুজাবাদ। ত্রিবেণী এবং পরে সপ্তগ্রাম স্থানীয় তুর্কী শক্তির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

সপ্তগ্রামে তাঁরা একটি মুদ্রা প্রস্তুতের কারখানা গড়ে তোলেন। এখানে প্রস্তুত একটি মুদ্রার তারিখ ৭২৯ হিজরী, অর্থাৎ ১৩২৯ খ্রীষ্টাব্দ।

দিল্লীতে যখন তুঘলক বংশীয় সুলতানদের রাজত্ব, বঙ্গদেশের তুর্কী অধিকৃত অঞ্চল তখন তিনটি শাসনতান্ত্রিক বিভাগে বিভক্ত ছিল—লখনৌতি, সোনারগাঁও এবং সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম)। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ফকরুদ্দীন মুবারক শাহ দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করে বঙ্গদেশে স্বাধীন সুলতানীর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর রাজত্বকালে বিখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা সপ্তগ্রাম পরিভ্রমণ করেন (১৩৪৫-৪৬)। ইলিয়াস শাহী বংশের আমলে বঙ্গদেশের উপর দিল্লীর অধিকার একেবারেই শিথিল হয়ে যায়। এই বংশের দ্বিতীয় সুলতান সিকন্দর শাহ (১৩৫৮-৯১) লখনৌতি, সোনারগাঁও এবং সাতগাঁওকে বঙ্গের সুলতানীর অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। ইলিয়াস শাহী বংশ রাজা গণেশ কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুত হয়। রাজা গণেশ হুগলীর উপর প্রভুত্ব না করলেও তাঁর পুত্র যদু বা জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৫-১৪৩০) সাতগাঁও-এর উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এই সময়ে সপ্তগ্রামের উপর তুর্কী অধিকার থাকলেও হুগলীর পশ্চিমাঞ্চল সম্ভবত উৎকলাধিপতি কপিলেন্দ্রদেবের প্রভাবাধীন ছিল।

রাজা গণেশের বংশ উৎখাত হয়ে যাওয়ার পর নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহের (১৪৩৭-৫৫) মাহমুদশাহী বংশ বঙ্গদেশে অধিষ্ঠিত হয়। নাসিরুদ্দীনের সঙ্গে উৎকলাধিপতি কপিলেন্দ্রদেবের সংঘর্ষের প্রমাণ আছে। তাঁর পুত্র রুকনুদ্দীন বারবকের (১৪৫৫-৭৪) আমলে শাহ ইসমাইল গাজী পশ্চিম হুগলী অধিকার করেন। 'রিসালৎ-ই-শুহাদা' নামক একটি ফার্সী গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে ইসমাইল গাজী মান্দারণের বিদ্রোহী রাজা গজপতিকে পরাস্ত ও নিহত করে মান্দারণ দুর্গ অধিকার করেন। এর অন্তর্নিহিত অর্থ এই যে তিনি গজপতি বংশীয় উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্রদেবের কোন সেনাধ্যক্ষকে পরাজিত করেন। ১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখ থেকে জানা যায় যে এই সময়ে ভাগীরথীর অপর তীরে হাবেলী পরগণা (হাবেলি শহর বর্তমান ২৪-পরগণার হালিশহর) সপ্তগ্রামের অন্তর্গত ছিল। এই লেখটি ত্রিবেণী থেকে প্রাপ্ত। হুসেন শাহী বংশের আমলে (১৪৯৩-১৫৩৬) সপ্তগ্রাম প্রদেশের সীমানা পশ্চিমে দামোদর পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

হুসেন শাহী বংশের শেষ রাজাকে উচ্ছেদ করে শের শাহ বঙ্গদেশ অধিকার করলে হুগলী জেলাও তাঁর দখলে চলে যায়। এই ঘটনা ঘটে ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে। শের শাহ বঙ্গদেশকে যে কয়টি শাসনতান্ত্রিক বিভাগে ভাগ করেন সেগুলির মধ্যে গৌড়, শরীফাবাদ, চট্টগ্রাম ও সাতগাঁও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে শের শাহের পুত্র ইসলাম শাহ সুরের মৃত্যুর পর সপ্তগ্রামের শাসক

সামসুদ্দীন মুহম্মদ শাহ গাজী স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজ নামে রৌপ্যমুদ্রা চালু করেন। কিন্তু ১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার মুকুন্দ হরিচন্দন ত্রিবেণী পর্যন্ত অঞ্চল তুর্কো-আফগানদের কাছ থেকে দখল করে নেন। পরে বিহারের আফগান শাসক সুলেমান করনানী হুগলী পুনরুদ্ধার করেন। উড়িষ্যাধিপতি দামোদরের পশ্চিমে কোটসামা বা কোটশিমুলের দুর্গে পশ্চাদাপসরণ করতে বাধ্য হন। সুলেমান দামোদরের তীরে সলিমাবাদ নগরের পত্তন করেন।

সুলেমানের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী দায়ুদের সঙ্গে মুঘলদের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সম্রাট আকবর প্রথমে মুনিম খান ও পরে রাজা তোডরমলকে দায়ুদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। তোডরমল তাঁর সৈন্যবাহিনী নিয়ে বর্ধমান থেকে গড়মান্দারণে উপস্থিত হন, এবং এখানেই ঘাঁটি করে দায়ুদের সঙ্গে চূড়ান্ত বোঝাপড়ার জন্য তৈরি হন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তুকারাওর যুদ্ধে দায়ুদ পরাস্ত হলে বঙ্গদেশ মুঘল অধিকারে আসে। কিন্তু মুঘল শিবিরের অনৈক্য ও দলাদলির সুযোগ নিয়ে স্থানীয় শক্তিগুলি ক্রমাগত বিদ্রোহ করতে শুরু করে। বিদ্রোহী আফগানরা উড়িষ্যার নানা স্থানে তাদের ঘাঁটি তৈরি করেছিল যেখান থেকে প্রায়ই তারা মুঘলদের উপর হামলা করত। এর ফলে সাতগাঁও-এর সামরিক গুরুত্ব মুঘলদের কাছে বেড়ে যায়, কেননা উড়িষ্যা থেকে আক্রমণ রোখার জন্য হুগলী জেলার ভৌগোলিক অবস্থান খুবই কার্যকর ছিল।

সম্রাট আকবর নিযুক্ত মুঘলশাসক হুসেনকুলি বেগ, যিনি খান-ই-জাহান নামেও পরিচিত ছিলেন, মীর্জা নজত খানকে সাতগাঁও-এর শাসক পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু আফগানরা উড়িষ্যা থেকে কতলু খানের নেতৃত্বে নজত খানকে পরাজিত করেন। নজতখান হুগলীতে পর্তুগীজ দুর্গে আশ্রয় নেন। কিন্তু সমগ্র হুগলী জেলাই মুঘল-আফগান সংঘর্ষের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়, এবং অবস্থা সামাল দেবার জন্য সম্রাট আকবর ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা মানসিংহকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করেন। রাজা মানসিংহ ভাগলপুর ও বর্ধমান হয়ে জাহানাবাদ বা বর্তমান আরামবাগে আসেন। সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করে তিনি তাঁর পুত্র জগৎসিংহকে কতলু খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন, কিন্তু জগৎসিংহ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন এবং আহতাবস্থায় বিষ্ণুপুরের মল্ল রাজা বীর হাম্বিরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কতলু খানের আকস্মিক মৃত্যুর পর মুঘলদের সঙ্গে আফগানদের একটা সাময়িক সন্ধি ঘটলেও পুনরায় সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মানসিংহ দ্বিতীয়বার হুগলীতে আসেন, এবং আফগানদের উৎখাত করেন। এই দীর্ঘকালীন যুদ্ধে দামোদরের পশ্চিমাঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান আরামবাগ মহকুমার চরম ক্ষতি হয়,

যদিও মুঘল যুগের ঐতিহাসিকেরা দাবি করেছেন যে শত্রুপক্ষের দশ হাজার মানুষ এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল এবং ৪,৪০০ খ্রীস্টান নরনারীকে বন্দী করা হয়েছিল, বাস্তবে মাত্র ৪০০ জন ফিরিঙ্গীকে বন্দী অবস্থায় ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ জুলাই তারিখে মুঘল দরবারে হাজির করা হয়েছিল। সম্রাট শাহজাহান রাজকুমার সুজাকে ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্গদেশের শাসক নিযুক্ত করেন এবং সুজা ২১ বছর, অর্থাৎ ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, এই পদে বহাল থাকেন। তাঁর আমলেই ফরমান লাভ করে ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণের অধিকার পায়। ১৬৪০ থেকে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই কোম্পানীর তের জন এজেন্ট হুগলীতে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে সর্বশেষ ছিলেন জোব চার্নক। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনের দ্বন্দ্বে সুজার পতনের পর সম্রাট ঔরঙ্গজেব কর্তৃক মীরজুমলা বঙ্গদেশের শাসক নিযুক্ত হন। মীরজুমলা ইংরাজদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন না, কেননা সুজার বিরুদ্ধে যখন চুঁচুড়ার ডাচ কর্তৃপক্ষ মীরজুমলার প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন ইংরাজরা তখন 'দেখা যাক কি হয়' এই নীতি অবলম্বন করে নিশ্চুপ ছিল। তিনি ইংরাজদের পণ্যের উপর করের হার বৃদ্ধি করেন ও অন্যান্য নানা উপায়ে তিনি তাদের হয়রান করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য একটা বোঝাপড়া হয় এবং ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারি তারিখে মীরজুমলা একটি দস্তক বা পরোয়ানার দ্বারা শাহজাহান ও সুজা প্রদত্ত সুযোগসুবিধাসমূহ ইংরাজদের ফিরিয়ে দেন।

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদার হয়ে আসার পর ইংরাজদের দুর্গতি আরও বৃদ্ধি পায়, কেননা শায়েস্তা খান তাঁদের কাছ থেকে প্রচুর কর আদায় করতেন। ১৬৭৮-এর জুলাই থেকে ১৬৭৯-র অক্টোবর পর্যন্ত শায়েস্তা খানের পরিবর্তে শাহজাদা মুহম্মদ আজম বাংলার সুবাদার ছিলেন, কিন্তু তখনও ইংরাজদের সঙ্গে মুঘলদের খারাপ সম্পর্কের কোন হেরফের হয়নি। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে শায়েস্তা খান দ্বিতীয়বার বাংলার সুবাদার হন এবং ১৬৮৮ পর্যন্ত এই পদে বহাল থাকেন। মুঘলদের জুলুমে অতিষ্ঠ হয়ে কোম্পানীর এজেন্ট উইলিয়ম হেজেস বিলাতে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের লেখেন যে মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলত বসতি স্থাপন করতে না পারলে এখানে বাণিজ্য করা যাবে না। কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ বঙ্গদেশে সৈন্য, সমরোপকরণ ও জাহাজ প্রেরণ করার অনুমোদন ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসের কাছ থেকে আদায় করে নেন, এবং তদনুযায়ী এখানে সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হয়। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ অক্টোবর তারিখে হুগলীতে একটি সামান্য ঘটনাকে উপলক্ষ করে ইংরাজদের সঙ্গে মুঘলদের একটি যুদ্ধ হয়ে যায়। চুঁচুড়ার

ডাচ বণিকেরা উভয় পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করতে রাজি হয়, কিন্তু যুদ্ধ বিরতির সুযোগ নিয়ে হুগলীর ইংরাজরা তল্পিতল্পা গুটিয়ে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ডিসেম্বর তারিখে সুতানুটিতে পালিয়ে যায়। তখন কোম্পানীর এজেন্ট ছিলেন জোব চার্নক।

সুতানুটি তথা কলকাতায় প্রতিষ্ঠা পেতে এবং দুর্গ নির্মাণ করতে ইংরাজদের বহু হাঙ্গামা পোহাতে হয়েছিল, এমনকি যুদ্ধ বিগ্রহও করতে হয়েছিল, কিন্তু সে ইতিহাস স্বতন্ত্র। তবে ১৬৮৮-তে বিদায়ের প্রাক্কালে শায়েস্তা খান ইংরাজদের বঙ্গদেশে তাদের বাণিজ্যিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে যান। শায়েস্তা খানের পর বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন বাহাদুর খান (জুলাই ১৬৮৮—জুন ১৬৮৯) এবং তারপর ইব্রাহিম খান (১৬৮৯—১৬৯৭)। ইব্রাহিমের সঙ্গে ইংরাজদের একটা ভালো বোঝাপড়া হয়ে যায়। বঙ্গদেশে ইচ্ছামত বাণিজ্য করার ফরমান তারা বাদশাহের কাছ থেকে পেয়ে যায়। মাদ্রাজ কাউন্সিল জোব চার্নককে দ্বিতীয়বার বঙ্গদেশে কোম্পানীর এজেন্ট করে পাঠায়। চার্নক ১৬৯০-এর ২৪ আগস্ট সুতানুটিতে অবতরণ করেন। ওই দিন থেকেই কলকাতা শহরের সূচনা ধরা হয়। ওই বছরেই ফরাসীরা চন্দননগরে একটি গ্রাম ক্রয় করে ফরাসী বসতির প্রতিষ্ঠা করে। চন্দননগরে এর দু'বছর আগেই দালান্দ ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিলেন।

ইব্রাহিম খান যখন বাংলার সুবাদার তখন শোভা সিংহ নামক মেদিনীপুর জেলার একজন জমিদার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে ব্যাপক লুণ্ঠন শুরু করেন। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি তিনি একটি সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে অভিযান শুরু করেন। বর্ধমানের রাজস্ব-সংগ্রাহক রাজা কৃষ্ণরাম তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে পরাস্ত ও নিহত হন। তাঁর দলে যোগদান করেন উড়িষ্যার আফগান সর্দার রহিম খান। বর্ধমান লুণ্ঠন করে তাঁরা হুগলী আক্রমণ করেন। মুঘল ফৌজদার নুরুল্লা খান হুগলীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন, কিন্তু শোভা সিংহের বাহিনী এই দুর্গ অবরোধ করে এবং হুগলীতে ব্যাপক লুঠপাট করে। রাত্রির অন্ধকারে নুরুল্লা খান পালিয়ে গিয়ে চুঁচুড়ার ডাচদের আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ডাচেরা তাঁর অনুরোধে হুগলীতে গোলাবর্ষণ করে শোভা সিংহের দলবলকে হটিয়ে দেয়। তৎসত্ত্বেও শোভা সিংহ ভাগীরথীর পশ্চিমে প্রায় ১৮০ মাইল জায়গা জুড়ে নিজের স্বাধীন বিচরণভূমি গড়ে তোলেন এবং যথারীতি ধ্বংস ও লুণ্ঠন চালিয়ে যান। কিন্তু দুর্বুদ্ধির বশে একদিন তিনি বর্ধমানের প্রয়াত রাজা কৃষ্ণরামের কন্যার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে সেই তেজস্বিনী রমণী ছুরিকাঘাতে তাঁকে নিহত করেন।

শোভা সিংহের এই আকস্মিক অভ্যুত্থানে বঙ্গদেশের মুঘল প্রশাসনের সামগ্রিক ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে চুঁচুড়ার ডাচ, চন্দননগরের ফরাসী ও কলকাতার

ইংরাজরা তাদের আত্মরক্ষার প্রয়োজনে দুর্গ নির্মাণের অনুমতি চেয়ে ঢাকায় মুঘল সুবাদার ইব্রাহিম খানের কাছে আবেদন করে এবং সেই আবেদন মঞ্জুর হয়। কলকাতায় ইংরাজরা ফোর্ট উইলিয়ম, চন্দননগরে ফরাসীরা আর্লিয়া এবং চুঁচুড়ায় ডাচরা গুস্তাফ দুর্গ গড়ে তোলে।

১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খান যখন বঙ্গদেশে যুগপৎ দেওয়ান নবাব-নাজিম পদে নিযুক্ত হন তখন হুগলীর ফৌজদার ছিলেন আসানুল্লা খান যিনি ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকিবাজারে অস্টেন্ড কোম্পানীর বাণিজ্যকুঠি ধ্বংস করেন। পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দীন তাঁর বন্ধু সুজা কুলি খানকে হুগলীর ফৌজদার নিযুক্ত করেন। পরবর্তী নবাব সরফরাজ খান ঘেরিয়ার যুদ্ধে আলিবর্দীর নিকট পরাজিত হওয়ার পর ক্ষমতার হাতবদল হয়। আলিবর্দীর আমলে হুগলী মারাঠাদের দ্বারা অধিকৃত হয়। শিব রাও হুগলীর মারাঠা শাসক নিযুক্ত হন। আলিবর্দী মারাঠাদের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেও তাদের উৎপাতের হাত থেকে বঙ্গদেশকে বাঁচাতে পারেন নি। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করিয়েও তিনি সুবিধা করতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে সুবর্ণরেখার তীর পর্যন্ত উড়িষ্যার অঞ্চল মারাঠাদের ছেড়ে দিয়ে তিনি তাদের সঙ্গে পাকাপাকিভাবে সন্ধি করেন। মারাঠারা হুগলী ছেড়ে গেলেও হুগলী বন্দরের তারা প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল। এরপর ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে আলিবর্দীর মৃত্যু পর্যন্ত হুগলীতে শান্তি বজায় ছিল।

আলিবর্দী তাঁর সৎ-ভাই মুহম্মদ ইয়ার খানকে হুগলী বন্দরের অধিকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁর সহকারী মীর মুহম্মদ রেজা ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ কর্তৃক বন্দী হন। এরপর সামান্য কিছুকাল মারাঠা শিব রাও হুগলীর শাসক ছিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে মহারাজ নন্দকুমার একই সঙ্গে হুগলীর দেওয়ান ও ফৌজদার পদে সাময়িকভাবে বহাল ছিলেন। ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক পদাধিকারী ওয়াটস্ উমিচাঁদ মারফৎ তাঁকে বারো হাজার টাকার উৎকোচ এবং হুগলীর বরাবরের ফৌজদারী প্রদানের প্রস্তাব দেন এই শর্তে যে তিনি ফরাসীদের কোনপ্রকার সাহায্য করবেন না। নন্দকুমার অবশ্য এই শর্ত পালন করেছিলেন যদিও ওয়াটস্ তাঁর কথা রাখতে পারেননি। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভের পলাশী অভিযানের সময় হুগলীর শাসক ছিলেন শেখ আমিনুল্লা। ক্লাইভ তাঁকে এই বলে শাসান যে তাঁর পলাশী অভিযানে কোন বাধা সৃষ্টি করলে তিনি হুগলী শহর ধ্বংস করবেন। আমিনুল্লা কোন বাধার সৃষ্টি করেন নি, কেন না ইতিপূর্বে ১৭৫৭-র জানুয়ারি মাসে তিনি এবং ওয়াটসন হুগলী লুণ্ঠন করেন।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌল্লার পরাজয়ের পর, মীর জাফরের সঙ্গে যে চুক্তি হয় তার বারো নম্বর ধারায় একটি শর্ত থাকে যে অতঃপর নবাব হুগলী নদীর নিম্নাঞ্চলে কোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারবেন না। ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলের গভর্নর ভান্সিটার্টের সঙ্গে মীর কাশিমের যে নূতন চুক্তি হয় তদনুযায়ী কোম্পানী বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামে পাকাপাকিভাবে নিজেদের সৈন্যবাহিনী রাখার অধিকারী হয়। তখন হুগলী জেলা বর্ধমান চাক্‌লার অন্তর্গত ছিল। এর ফলে হুগলী কার্যত ইংরাজ অধিকারে চলে আসে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলম আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী প্রদান করার পর হুগলী জেলার উপর ইংরাজ অধিকার আইনসিদ্ধ হয়। ১৭৭২ পর্যন্ত হুগলী জেলার নিজামত বা ফৌজদারী প্রশাসন কাগজে কলমে নবাবের হাতে থাকে। ১৭৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী একটি পৃথক রাজস্ব অঞ্চল হিসাবে ঘোষিত হয়, এবং ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী নূতন বৃটিশ ধরনের শাসনতান্ত্রিক পরিকাঠামোয় স্বতন্ত্র জেলা হিসাবে পরিগণিত হয়।

১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে হুগলীতে পর্তুগীজদের পতনের পর পার্শ্ববর্তী চুঁচুড়ায় ডাচ বা ওলন্দাজরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বঙ্গদেশে তাদের বাণিজ্যবসতি ছিল ঢাকা, মালদহ, কালিকাপুর,বরাহনগর প্রভৃতি স্থানে। এ ছাড়া বিহার ও উড়িষ্যায় তাদের কয়েকটি বাণিজ্যবসতি ছিল। নিজস্ব প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য তারা কলকাতা থেকে পঁচিশ মাইল উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিম কূলে অবস্থিত চুঁচুড়া শহরটিকেই নির্বাচিত করে। ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহজাহান চুঁচুড়ায় ডাচদের বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি দেন। পরে ডাচরা মুঘলদের কাছ থেকে আরও তিনটি সনদ লাভ করে ১৬৫০ থেকে ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। চুঁচুড়া শহরের আনুষ্ঠানিক পত্তন হয় সম্ভবত ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলার নবাবদের বদান্যতায় ডাচরা চুঁচুড়ায় প্রকৃত ভৌম অধিকার লাভ করে, এবং সেখানে তারা গুস্তাফ দুর্গ নির্মাণ করতে শুরু করে সপ্তদশ শতকের অষ্টম দশক থেকে। একটি বৃহৎ বাণিজ্যকুঠি হিসাবেই এই দুর্গ নির্মাণের সূচনা হয়, কিন্তু তৎকালীন রাষ্ট্রীয় অরাজকতা, শোভা সিংহের বিদ্রোহ প্রভৃতি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা ১৬৯৬-এর মধ্যেই ওই দুর্গকে প্রতিরক্ষামূলক করে তোলে। ১৬৯৬-র ১ আগস্ট তারিখে শোভা সিংহ হুগলী দখল করেন, কিন্তু পরদিনই ডাচরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করে বিদ্রোহীদের হটিয়ে দেয়। এই ঘটনায় বাংলা সরকারের কাছে তাদের মর্যাদা খুবই বেড়ে যায়।

চুঁচুড়ার ওলন্দাজ প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ সর্বতোভাবে বাটাভিয়ার কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অধীন ছিল। খোদ হল্যান্ড থেকেও মাঝে মাঝে নির্দেশাবলী আসত।

চুঁচুড়ার ডাচ সরকার গঠিত ছিল একজন ডিরেক্টর বা গভর্নর ও সাতজন সদস্য নিয়ে। এই গভর্নর রাজকীয় মর্যাদা ও আড়ম্বরের সঙ্গে গুস্তাফ দুর্গের অভ্যন্তরে গঙ্গার তীরে একটি প্রাসাদোপম গৃহে বাস করতেন। গুস্তাফ দুর্গের মূল এলাকাটি ছিল গঙ্গার দুই বাঁকের—দক্ষিণে বর্তমান দত্তঘাট ও উত্তরে বর্তমান কাছারি ঘাটের–মধ্যবর্তী অংশে। মূল দুর্গটি এখন আর নেই, ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে সেটিকে ভেঙে ফেলা হয়। সেখান থেকে যে সকল ফলক পাওয়া গেছে তাতে ১৬৮২ এবং ১৬৮৭ এই দুটি তারিখ দৃষ্ট হয়। ডিরেক্টর বা গভর্নর ছাড়া কাউন্সিলের সদস্যবর্গের মধ্যে থাকতেন কালিকাপুরের বাণিজ্য বসতির প্রধান, মুখ্য প্রশাসক, বাণিজ্যাধ্যক্ষ, পণ্যাধ্যক্ষ, সমরাধ্যক্ষ, চুঁচুড়া শহরের শেরিফ ও মেয়র (একই ব্যক্তি) এবং ডিরেক্টরের সচিব যিনি একই সঙ্গে ছিলেন কোষাধ্যক্ষ। এ ছাড়া একটি সাধারণ বিভাগ ও বিচার বিভাগ ছিল। বিচার বিভাগ মৃত্যুদণ্ড দানের অধিকারী ছিল,কিন্তু তা কেবল গুস্তাফ দুর্গের অভ্যন্তরস্থ বাসিন্দা এবং জাহাজের লোকদের উপর, এবং বাটাভিয়া কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে। দুর্গ এলাকার বাইরের লোকদের ক্ষেত্রে নবাব সরকারের ব্যবস্থাই কার্যকর ছিল। চুঁচুড়ার যে সকল স্থান ডাচদের অধিকারভুক্ত ছিল তা থেকে ১৩,১২২ টাকা রাজস্ব আদায় হত।

বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ডাচরা স্বাভাবিকভাবেই ইংরাজ ও ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং মুর্শিদাবাদের নবাব দরবারের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল কখনও ভালো কখনও মন্দ। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাদের সমসাময়িক রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়তে হয়। বঙ্গদেশের মুঘল সুবাদার শাহজাদা সুজার আরাকান অভিযানে সহায়তা করতে রাজি না হওয়ায় তাদের আমদানি ও রপ্তানির প্রতিটি সামগ্রীর উপর শতকরা কুড়ি ভাগ বাড়তি কর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তবে তাদের নৌশক্তিকে বঙ্গদেশের শাসকরা কিছুটা সমীহ করতেন এবং প্রয়োজনে কাজে লাগাতেন। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তারা উড়িষ্যার বিদ্রোহী জমিদারদের দমনের ব্যাপারে হুগলীর ফৌজদারকে সাহায্য করেছিল। শোভা সিংহের কথা আগেই বলা হয়েছে। শায়েস্তা খান নানা অজুহাতে তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতেন। মুর্শিদকুলি খানের সঙ্গে ডাচরা বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তাঁর কৃপায় তারা হয়রানির হাত থেকে রেহাই পায়। মুর্শিদকুলি ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে ডাচদের একটি নূতন ফরমান পাইয়ে দেন, এবং তাদের প্রদেয় বাণিজ্য করের হার চার শতাংশ থেকে আড়াই শতাংশে কমিয়ে দেন। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে তারা মুঘল সম্রাট জহান্দার শাহের নিকট থেকে একটি নূতন ফরমানের দ্বারা চুঁচুড়া, বরাহনগর ও বাজার মীর্জাপুরের ইজারা নেয়, এবং নিজস্ব মুদ্রার মূল্যমানও কিছু বাড়িয়ে

নেয়। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে ফরুখশিয়ার কর্তৃক প্রদত্ত ফরমান তাদের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী করে দেয়।

কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের চালে কিছু ভুল হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় রাজনৈতিক উত্থানপতনের ক্ষেত্রে তারা বরাবরই ভুল ঘোড়ার উপর বাজি ধরেছিল। তারা বাংলার মসনদ নিয়ে লড়াই-এর ক্ষেত্রে আলিবর্দীর বদলে সরফরাজ খানকে সাহায্য করেছিল, ফলে আলিবর্দী তাদের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। আলিবর্দীর মসনদে বসার পরেও তারা নবাবের মন ভিজানোর চেষ্টা করেনি, বরং মারাঠা আক্রমণকারীদের সঙ্গে তারা হাত মিলিয়েছিল। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরাজুদ্দৌল্লা কলকাতা আক্রমণ করলে তারা নিরপেক্ষ থেকে ইংরাজদের চটিয়ে ছিল। ইংরাজদের কাছ থেকে কলকাতার লুণ্ঠিত পণ্য সিরাজ ডাচদের বেশি দামে ক্রয় করতে বাধ্য করেছিলেন। ইংরাজরা কলকাতা পুনরুদ্ধার করার পর ১৭৫৭-র ২ জানুয়ারি তারিখে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ ডিরেক্টর অ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে অভিনন্দিত করেন, কিন্তু তাতে ইংরাজদের প্রতিকূল মনোভাব দূর হয়নি। দুর্বলের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা ওলন্দাজদের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়েছিল। ইংরাজেরা ১৭৫৭-র মার্চে চন্দননগর দখল করলে সেখানকার ফরাসী নরনারীরা চুঁচুড়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু ক্লাইভের ধমকে ডাচ ডিরেক্টর আদ্রিয়ান বিসডম তাদের বিতাড়িত করতে বাধ্য হন।

পলাশীর যুদ্ধের সাফল্যের পর চুঁচুড়ার ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষ ইংরাজদের অভিনন্দিত করলেও ভিতরে ভিতরে ঈর্ষান্বিত হয়। এদিকে নবাব মীর জাফরও ইংরাজদের তাঁবেদারিতে অসুখী ছিলেন। হলওয়েল লিখেছেন যে এই সময় চুঁচুড়ার ডাচরা মীর জাফরের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি করে এবং স্থির হয় যে তারা বাটাভিয়া থেকে সৈন্যবাহিনী আমদানি করে ইংরাজদের উৎখাত করবে। নবাবের সঙ্গে বাস্তবে এরকম কোন চুক্তি হয়েছিল এমন কোন প্রমাণ নেই, তবে একটি ডাচ রণতরী ১৭৫৯-র আগস্টে গঙ্গাবক্ষে হাজির হয়েছিল যাতে ইউরোপীয় ও মালয়ী সৈন্য ছিল। এই বিষয়ে ডাচদের বক্তব্য ছিল যে ওই জাহাজটির গন্তব্যস্থল ছিল নেগাপত্তম, কিন্তু দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও জলাভাবের দরুন তা হুগলী নদীতে ঢুকে পড়ে। ১৭৫৯-র ২২ অক্টোবর তারিখে কলকাতার ইংরাজ কাউন্সিল কোর্ট অফ ডিরেক্টর্সদের কাছে এই প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে জানায় যে বিষয়টির সহজেই নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। এই চিঠিতে প্রমাণিত হয় যে নবাব ডাচদের সঙ্গে চক্রান্তে লিপ্ত এমন কাহিনী কলকাতার কাউন্সিল বিশ্বাস করেন নি।

কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস ও হলওয়েল ডাচদের শায়েস্তা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, এবং ক্লাইভও এই প্রচেষ্টায় সামিল হন। ১৭৫৯-র ২০ নভেম্বর তারিখে

কর্ণেল ফোর্ড বরাহনগরের ডাচ কুঠি দখল করেন, এবং ২৪ নভেম্বর তারিখে চুঁচুড়ায় উপস্থিত হন। ওই তারিখেই শাঁকরাইলে ইংরাজেরা ছয়টি ডাচ রণতরীকে জখম করে। পক্ষান্তরে ডাচদের দ্বারা ইংরাজদের 'ডিউক অফ ডোরসেট' জাহাজটি রীতিমত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২৫ নভেম্বর চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মধ্যবর্তী বেদারা নামক স্থানে উভয় পক্ষের যুদ্ধ হয়। ডাচ বাহিনীতে সাতশো ইউরোপীয় ছাড়াও মালয়ী ও দেশি সৈন্য ছিল, এবং ডাচদের সেনাপতি হয়েছিলেন কর্ণেল রুমে নামক জনৈক ফরাসী। মাত্র আধ ঘন্টার যুদ্ধেই ডাচরা পরাজিত হয়, এবং পুনরায় তারা যুদ্ধে লিপ্ত হবে না এই শর্তে ডাচরা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে।

বেদারার পরাজয়ের পরও ডাচরা ইংরাজদের বিব্রত করার চেষ্টা থেকে বিরত হয়নি। পক্ষান্তরে বাংলার নবাব ও ইংরাজরাও ডাচদের ক্ষমতা আরও খর্ব করে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য বৃটিশ ও নেদারল্যান্ডস সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে বাংলার ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী চুঁচুড়ার ডাচদের সম্পর্কে সহযোগিতামূলক মনোভাব গ্রহণ করে। চুঁচুড়ায় ডাচরা তাদের হৃত মর্যাদা ফিরে পায়। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চুঁচুড়ায় ডাচ অধিকার বজায় ছিল। ওই বছরের ৭ই মে তারিখে ইংরাজ অধিকৃত সুমাত্রার সঙ্গে ডাচ অধিকৃত চুঁচুড়ার হাতবদল হয়, এবং চুঁচুড়া ইংরাজ অধিকারে আসে।

চুঁচুড়ার পার্শ্ববর্তী চন্দননগরে (আসল নাম চন্দ্রনগর বা চাঁদের নগর) ফরাসীরা ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি ছোট বাণিজ্যবসতি গড়ে তোলে। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দালান্দ এখানে একটি বৃহৎ বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করেন। এই নবাগত প্রতিদ্বন্দ্বীদের চুঁচুড়ার ডাচরা বলপূর্বক চন্দননগর থেকে উৎখাত করে, কিন্তু ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের প্রদত্ত ফরমানের বলে তারা চন্দননগরে পুনরায় তাদের অধিকার ফিরে পায়। শোভা সিংহের বিদ্রোহের ফলে উদ্ভূত অরাজক পরিস্থিতির সুযোগে ফরাসীরাও ইংরাজ ও ডাচদের মতো নবাব সরকারের কাছ থেকে প্রতিরক্ষামূলক দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পেয়ে যায় এবং তারা গঙ্গাতীরে আর্লিয়াঁ দুর্গ গড়ে তোলে। ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগর পণ্ডিচেরীর ফরাসী কর্তৃপক্ষের অধীন হয়, কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রথম তিন দশক পর্যন্ত ফরাসীদের ব্যবসাবাণিজ্য মোটেই ভালো চলেনি। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী কোম্পানীর অধিকর্তা হিসাবে জোসেফ ফ্রাঁসোয়া দুপ্লের আগমনের পর অবস্থার পরিবর্তন হয়। অতি দ্রুত চন্দননগর বাণিজ্যের শীর্ষে উন্নত হয়। এখান থেকে পণ্যবাহী জাহাজ পশ্চিম এশিয়া ও চিনে যেতে শুরু করে। স্থলপথে তিনি তিব্বতের সঙ্গেও বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেন। ভারতের অভ্যন্তরীণ বাজারকেও তিনি অবহেলা করেননি। চন্দননগর শহরটিকে তিনি সুন্দর করেন।

১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দে দুপ্লে পণ্ডিচেরীতে বদলি হয়ে গেলে, চন্দননগরের বাণিজ্যিক অবনতি পুনরায় শুরু হয়। ইংরাজদের সঙ্গেও তাদের সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে। যদিও ফরাসীরা সিরাজুদ্দৌল্লার কলকাতা আক্রমণের সময় ইংরাজদের তাদের দুর্গে আশ্রয় দিতে রাজি হয়েছিল, ইংরাজরা কিন্তু মনে করত যে নবাবের সঙ্গে ফরাসীদের গোপন আঁতাত আছে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ মার্চ ইংরাজেরা আকস্মিকভাবে চন্দননগর আক্রমণ করে এবং ২৩ মার্চ চন্দননগর দখল করে নেয়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে (১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্যারিসের সন্ধির শর্তানুযায়ী) ফরাসীরা চন্দননগর ফেরত পায়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে এখানেও ইংরাজেরা চন্দননগর দখল করে নেয়। ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে উভয় তরফে সন্ধি ঘটলে চন্দননগর আবার ফরাসী অধিকারে আসে। ফ্রান্সে বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব সংঘটিত হলে চন্দননগরেও একটি ছোটখাট ফরাসী বিপ্লব ঘটে, এবং গভর্নর সহ রাজতন্ত্রীদের বন্দী করে ফ্রান্সে চালান দেওয়া হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিস সেই জাহাজ দখল করে বন্দীদের মুক্ত করেন। অন্য একটি বিবরণ অনুযায়ী, বিপ্লবের সূচনায় গভর্নর স্বয়ং তাঁর অনুগামীদের নিয়ে কলকাতায় এবং সেখান থেকে পণ্ডিচেরীতে পালিয়ে যান। ফ্রান্সে বিপ্লব-পরবর্তী যুদ্ধের সূত্র ধরে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা আবার চন্দননগর দখল করে। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে আমিয়েন্সের সন্ধি অনুযায়ী ফরাসীরা চন্দননগর পুনরায় ফিরে পেলেও কয়েকমাস পরে ইংরাজেরা আবার তা দখল করে নেয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগর আবার ফরাসীদের হাতে আসে এবং তখন থেকে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২ মে পর্যন্ত তা নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের হাতে থাকে। ভদ্রেশ্বর ও চাঁপদানির মধ্যবর্তী গরুটিতে একটি ছোট ফরাসী কলোনী ছিল। চন্দনগরের একটি লৌকিক নাম ছিল ফরাসডাঙ্গা যা এখন অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

পার্শ্ববর্তী ভদ্রেশ্বর শহরটি ডেন বা দিনেমার, বেলজিয়ান ও জার্মানদের আকর্ষণ করেছিল। ডেনীয় বসতিটি এখনও দিনেমারডাঙা নামে পরিচিত, কিন্তু তারা পরে শ্রীরামপুরে চলে যায়। বেলজিয়ানরা ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানে বসতি করেছিল, কিন্তু তাদের বাণিজ্যকুঠি ছিল গঙ্গার অপর পারে বাঁকিবাজারে। এই অঞ্চলে জার্মানরা অধিকতর সফল হয়েছিল। তাদের অস্টেন্ড কোম্পানী (প্রুশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মিলিত উদ্যোগ) উন্নতমানের বাণিজ্য ও সততার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, কিন্তু ইংরাজ, ফরাসী ও ডাচদের দুর্নীতিপূর্ণ, উৎপীড়নমূলক ও নিকৃষ্টধরনের পণ্যনির্ভর বাণিজ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা এবং ততোধিক দুর্নীতিগ্রস্ত উৎকোচলোভী নবাব-সরকারের অসহযোগিতা তাদের এদেশীয় রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল।

ডেন বা দিনেমাররা ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের নাতি শাহজাদা আজিমুদ্দীনের নিকট থেকে ফরমান পেয়ে বঙ্গদেশে বাণিজ্য শুরু করে। ডেনরা প্রথম দিকে চন্দননগরে থেকেই কাজ কারবার চালায়, কিন্তু পরে তাদেরও নিজস্ব এলাকায় বাণিজ্যবসতি গড়ে তোলার প্রয়োজন দেখা দেয়। ডেনীয় কোম্পানীর কর্তা স্কটমান কাশিমবাজারের বিশিষ্ট ফরাসী এজেন্ট মঁসিয়ে ল'র সহায়তায় মুর্শিদাবাদের নবাব-দরবার থেকে শ্রীরামপুরে বাণিজ্যকুঠি নির্মাণের অনুমতি পান। ডেনরা ষাট বিঘা জমির স্বত্ব লাভ করে। তারা শ্রীরামপুরে গঙ্গার তীরে তিন বিঘা জমি নেয় জাহাজঘাটা করার জন্য, বাকি সাতান্ন বিঘা জমি তারা নেয় আক্‌নায় বাণিজ্যকুঠি তৈরি করার জন্য। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ অক্টোবর তারিখে শ্রীরামপুরে প্রথম ডেনীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। ডেনীয় কোম্পানী ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক শ্রেণীর কর্মচারীদের সহায়তায় খুব ভালোভাবেই চলতে থাকে। এই কর্মচারীদের কিছু নিজস্ব কারবারও ছিল, এবং লাভের টাকা তারা ডেনীয় কোম্পানীর মারফৎ দেশে পাঠাত এবং ডেনীয় কোম্পানীতেও লগ্নী করত। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যখন ইংরাজদের নৌবাণিজ্য দারুণভাবে বিঘ্নিত হয় কলকাতার বহু ইংরাজ ব্যবসায়ী ডেনীয় জাহাজেই পণ্য আমদানি-রপ্তানি করত। ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডেনীয় কোম্পানীর দারুণ রমরমা ছিল। কিন্তু ইউরোপে ডেনমার্কের সঙ্গে ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক সম্পর্কের অবনতি ঘটলে তার প্রভাব এখানেও পড়ে। একটি ইংরাজ বাহিনী ওই বছরেই শ্রীরামপুরের ডেনীয় কোম্পানীর গুদাম ও সম্পত্তি লুণ্ঠন করে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ডেনমার্কের সম্পর্ক স্বাভাবিক হলেও শ্রীরামপুরের ডেনীয় কোম্পানীর বিপর্যয় রোধ করা যায়নি। ১৮৪৫-এর ১১ অক্টোবর তারিখে ডেনমার্ক সরকার একলক্ষ কুড়ি হাজার পাউন্ডের বিনিময়ে শ্রীরামপুর শহরটি ইংরাজদের নিকট বিক্রয় করে দেয়। ব্যবসাবাণিজ্য ছাড়াও শিক্ষাদীক্ষা ও ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে ডেনীয়দের খুবই উৎসাহ ছিল। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে সেন্ট ওলাফের গীর্জা নির্মিত হয়। শ্রীরামপুরেই প্রথম প্রোটেস্টান্ট মিশনের আগমন ঘটে। বৃটেন থেকে কেরী, মার্শমান ও ওয়ার্ড শ্রীরামপুরে ডেনদেরই আশ্রয় ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

হুগলী জেলার অন্যান্য অঞ্চলের ইতিহাসের যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তা সেই অঞ্চলের পুরাকীর্তিসমূহের পরিচিতির প্রসঙ্গে উল্লিখিত হবে।

৪ ॥ পুরাকীর্তিসমূহের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় পটভূমি

হুগলী জেলার অধিকাংশ পুরাকীর্তিই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের। পূর্ববর্তী যুগের নিদর্শন খুব কমই পাওয়া যায়। এর প্রধান কারণ, এই অঞ্চলের যাবতীয়

ঘরবাড়ি, দেবস্থান প্রভৃতি মাটি, বাঁশ, ইট ও কাঠ দিয়ে তৈরি হত, ফলে সেগুলির আয়ু স্বাভাবিকভাবেই খুব দীর্ঘ হতে পারেনি। এছাড়া হুগলী জেলার নদীসমূহের বারবার গতি পরিবর্তন, নিত্যনৈমিত্তিক বন্যা প্রভৃতির ফলেও প্রাচীন ও মধ্যযুগের বহু পুরাকীর্তি অবলুপ্ত হয়ে গেছে। আমদানি করা পাথর দিয়ে কয়েকটি মন্দির অবশ্য হুগলী জেলায় নির্মিত হয়েছিল যে সকল মন্দিরের পাথর ত্রিবেণী ও পাণ্ডুয়ার কয়েকটি মসজিদের দেওয়াল ও ভিত্তি নির্মাণে পুনরায় ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত, ভঙ্গুর উপাদানে গঠিত বলেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের পুরাকীর্তিসমূহ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। প্রাচীন যুগের স্মারক হিসাবে মহানাদে উৎখনিত গুপ্ত আমলের একটি দেওয়াল, ওই অঞ্চল থেকেই আবিষ্কৃত কুষাণ ও গুপ্ত আমলের কয়েকটি মুদ্রা এবং হুগলী জেলার নানাস্থান থেকে প্রাপ্ত পাল-সেন যুগের কয়েকটি মূর্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইবন বতুতা থেকে শুরু করে যে সকল পর্যটক, বণিক ও ভাগ্যান্বেষী হুগলীতে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই একবাক্যে বলেছেন যে কৃষি ছাড়াও হুগলী জেলার সমৃদ্ধি ছিল শিল্পে, এবং এই জেলার অভ্যন্তরস্থ বহু গ্রামই বিশিষ্ট ধরনের নানাপ্রকার পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা অর্জন করেছিল। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও গ্রামশিল্পের এই ঐতিহ্য আজও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। তবে কৃষিই ছিল এখানকার অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি, এবং সেই হিসাবে ভূমির উপস্বত্বভোগী জমিদারদের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে একটা বড় ভূমিকা ছিল। এখানকার পুরাকীর্তিসমূহের অধিকাংশই মন্দির বা মসজিদ, যেগুলি হিন্দু বা মুসলমান জমিদারদের অর্থানুকূল্যে নির্মিত। এই জমিদারদেরও আবার প্রাচীন ও অর্বাচীন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রাচীন পর্যায়ের জমিদার বলতে তাঁদেরই বোঝায় যাঁরা মুঘল আমল থেকেই ভূম্যধিকার পেয়েছিলেন এবং রাজা খেতাবের অধিকারী ছিলেন। এই রকম রাজবংশ হুগলী জেলার নানাস্থানেই বর্তমান ছিল, যেমন বাঁশবেড়িয়া-রাজ, শেওড়াফুলি-রাজ প্রভৃতি। বাংলার নবাবদের আনুকূল্যেও রাজা খেতাবধারী বহু জমিদারবংশ গড়ে উঠেছিল। এই সকল রাজাদের ভূম্যধিকার ছাড়াও বেশ কিছু শাসন ও বিচার ক্ষমতা ছিল। অর্বাচীন পর্যায়ের জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব মূলত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে।

মসজিদের ক্ষেত্রে জমিদার ছাড়াও স্থানীয় মুসলমান শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল যার পরিচয় বিভিন্ন মসজিদগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি থেকে পাওয়া যায়। মুসলমান শাসকেরা মসজিদের সঙ্গেই মাদ্রাসা ও মক্তব স্থাপন করতেন। ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান রুকনুদ্দীন কৈকায়ুসের আমলে ত্রিবেণীতে কোয়াদি অল্‌-নাসির মুহম্মদ একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। আরও দুটি মাদ্রাসা ওই একই অঞ্চলে স্থাপিত হয় যথাক্রমে ১৩১৩ এবং ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠাতারা

ছিলেন আঞ্চলিক শাসক। ত্রিবেণীর জাফর খান গাজীর মসজিদ ও দরগা সবচেয়ে পুরাতন, নির্মাণকাল ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দ, যদিও পরবর্তীকালে তা পুনর্নির্মিত হয়। পাণ্ডুয়ায় অনেকগুলি মসজিদ আছে যেগুলির মধ্যে বিখ্যাত বাইশ দরওয়াজা শাহ সুফী কর্তৃক নির্মিত। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত মিনারটি ১৩০৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত ফুরফুরা শরীফ একটি বিখ্যাত মুসলিম তীর্থস্থান। এখানে মুকলিস খান ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণ করেন। ফুরফুরা ও সীতাপুরে এবং পোলবা থানার অন্তর্গত কাসোয়ারায় পঞ্চদশ শতকে মসজিদ সংলগ্ন মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়। ইসলামী সংস্কৃতির প্রসারে এই মসজিদ ও মাদ্রাসাগুলির দান বড় কম ছিল না। গোঘাট থানার অন্তর্গত বাজুয়ার মসজিদ ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে মজলিস খানওয়ার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে হুগলীতে পারস্য থেকে আগত শিয়া সম্প্রদায়ের একটি বড় বসতি ছিল। এই শিয়ারা ছিলেন পেশায় মুখ্যত বণিক, শিক্ষক, চিকিৎসক ও সৌগন্ধিক, তাঁদের অনুপ্রেরণায় হুগলী-চুঁচুড়া শহরাঞ্চলে কয়েকটি ইমামবাড়া গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে হাজী মুহম্মদ মহসীনের অর্থে নির্মিত হুগলীর বিখ্যাত বৃহদায়তন ইমামবাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম দর্শনীয় সৌধ। এছাড়া গাজী ও পীরদের অসংখ্য দরগা ও সমাধি হুগলী জেলায় ছড়িয়ে আছে। একমাত্র পাণ্ডুয়া থানাতেই কুড়িটির বেশি এই রকম আস্তানা আছে। এগুলি গড়ে ওঠার পিছনে শাসক ও জমিদারদের ততটা ভূমিকা নেই। এগুলির উৎস লোকায়তিক।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে ইউরোপীয় বণিকদের বসতি গড়ে ওঠার ফলে সপ্তগ্রামের বণিকেরা এবং অন্তর্বর্তী অঞ্চল থেকে ভাগ্যান্বেষী ও বণিকেরা ভাগীরথীর তীরবর্তী অঞ্চলে চলে আসে এবং এই অঞ্চলটি ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। কালক্রমে কলকাতা শহরের বিকাশ হওয়ার পর হুগলীর গ্রামাঞ্চলের অনেকেই ভাগ্যান্বেষণে কলকাতা চলে যায়। সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের এই ধরনের বহির্গমন হুগলী জেলার অভ্যন্তর অঞ্চলের অর্থনীতির পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হয়। অভ্যন্তর অঞ্চলের উৎপাদন কেন্দ্রগুলি স্থানীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। যারা পূর্বে স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন পণ্য নিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবসা করত তারা আরও সহজে অধিকতর অর্থোপার্জনের বহু পদ্ধতি পেয়ে যায়। প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে তারা বৈদেশিক বাণিজ্যসংস্থাগুলির দালালি, উপদালালি এবং নির্ভরশীল আরও অনেক পেশায় নিজেদের লিপ্ত করে প্রভূত ধনসঞ্চয় করে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস কর্তৃক চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পর তারা অর্থলগ্নীর একটি খুবই নিরাপদ ক্ষেত্র খুঁজে পায়, এবং জেলার অভ্যন্তরে জমিদারী ক্রয় করতে অধিকতর আগ্রহী হয়। এই নূতন জমিদারশ্রেণীর প্রথম প্রজন্ম তাদের গ্রামের

সঙ্গে সম্পর্ক একেবারে ছিন্ন করেনি। হুগলী জেলার অধিকাংশ মন্দিরাশ্রয়ী পুরাকীর্তি এই প্রজন্মের সৃষ্টি। অধিকাংশ মন্দিরেরই প্রতিষ্ঠাতাদের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায় যাঁদের সর্বাধিক অংশই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সুবাদে ধনী হয়েছিলেন। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে এই জমিদারদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম। প্রধানত উচ্চ পর্যায়ের শূদ্র জমিদারেরাই শাস্ত্রানুমোদিত পূর্তধর্মে অধিকতর আগ্রহী ছিলেন।

অধিকাংশ মন্দিরই বিষ্ণু, শিব ও শক্তির উদ্দেশে নির্মিত, কিন্তু এই মন্দির নির্মাণ থেকে প্রতিষ্ঠাতাদের সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের প্রমাণ হয় না। একই ব্যক্তি বা একই বংশ একই সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ, শিব ও কালীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। আসলে সকল মন্দিরই স্মার্ত পঞ্চোপাসনার অভিব্যক্তি। পঞ্চোপাসনা বলতে বোঝায় বিষ্ণু, শিব, শক্তি, গণপতি ও সূর্যের উপাসনা, যা প্রচলিত হিন্দুধর্মের প্রধান ভিত্তি। মহারাষ্ট্র বা গুজরাতের মতো বঙ্গদেশে কোন গাণপত্য সম্প্রদায় না থাকলেও যে কোন পূজার আগে গণেশকে আবাহন করা বর্তমান হিন্দুধর্মের একটি প্রচলিত রীতি। পাণ্ডুয়ার বাইশ দরওয়াজা মসজিদের কিছু দূরে প্রাপ্ত একটি পাঁচ ফুট উচ্চ প্রস্তর স্তম্ভে গণেশের মূর্তি খোদিত আছে। স্তম্ভটি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়; বর্তমানে এটি আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এই রকম বহু মূর্তিই হয়ত প্রাচীন যুগের মন্দিরসমূহে ছিল, যেগুলির এখন আর সন্ধান পাওয়া যায় না। গণেশের মতো হুগলী জেলায় কোন সূর্য মন্দির বা সৌর সম্প্রদায় নেই। তবে এখান থেকে পাল-সেন যুগের বেশ কয়েকটি সূর্য মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলির মধ্যে একটি অরুণচালিত সপ্তাশ্বরথবাহিত কালো পাথরের মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি পাওয়া গেছে ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে মাটি কাটার সময়। খানাকুলের ঘন্টেশ্বর শিবমন্দিরে কালো পাথরে নির্মিত একটি সূর্যমূর্তি আজও গৌণ দেবতারূপে পূজিত হয়।

হুগলী জেলার বৈষ্ণবেরা প্রধানত শ্রীচৈতন্যের অনুগামী। এখানে চৈতন্যমতের প্রবক্তা ছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্য রঘুনাথ দাস গোস্বামী। তাঁর অনুপ্রেরণায় এখানে প্রথম চারটি শ্রীপাট গড়ে ওঠে—খানাকুলে অভিরাম স্বামীর, মাহেশে কমলাকর পিপলাই-এর, কৃষ্ণপুর বা আদিসপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের এবং আঁটপুরে পরমেশ্বর ঠাকুরের। পরে আরও চারটি শ্রীপাট গড়ে ওঠে। গুপ্তিপাড়ায় একটি চৈতন্যমন্দির এবং চাতরায় একটি গৌরাঙ্গমন্দির আছে। অবশ্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও হুগলীতে বৈষ্ণবধর্ম এবং বিষ্ণুপূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। তাছাড়া পঞ্চোপাসনার নিয়ম অনুযায়ী বিষ্ণু অবৈষ্ণবেরও দেবতা এবং শালগ্রাম শিলায় নারায়ণের আবাহন সকল হিন্দু ধর্মচর্যারই অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ। প্রাক-চৈতন্য বৈষ্ণবধর্মের পরিচয় হুগলী জেলার

মগরা, দ্বারবাসিনী, পাণ্ডুয়া, কানুর, ভাণ্ডারহাটি, সাটিথান, ত্রিবেণী, কৈকালা প্রভৃতি গ্রাম থেকে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিসমূহ থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর হুগলীর বৈষ্ণব মন্দিরসমূহের প্রধান দেবতা বিষ্ণু ও লক্ষ্মী নন, তাঁদের অবতার কৃষ্ণ ও রাধা। এই সকল মন্দিরের নামকরণ রাধাকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রচলিত নাম অনুসারে হয়েছে যেমন নন্দলাল, নন্দদুলাল, নন্দনন্দন, কৃষ্ণরায়, কৃষ্ণচন্দ্র, মদনমোহন, গোপীনাথ, রাধারমণ, রাধাগোবিন্দ, রাধাবল্লভ, রাধাকান্ত, রাধাগোপীনাথ, অনন্তবাসুদেব, যাদবরায়, গোবিন্দ, দামোদর, লক্ষ্মীজনার্দন, লালজী, মদনগোপাল, রাজরাজেশ্বর, শ্রীধর প্রভৃতি। রামচন্দ্রের উদ্দেশে নির্মিত কিছু মন্দিরও আছে যেমন কাঁকড়াকুলির সীতারাম মন্দির, গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্র মন্দির, ভদ্রেশ্বর ও উত্তরপাড়ার রামসীতা মন্দির। লক্ষ্মণ ও হনুমানের মূর্তিও এই সকল মন্দিরে বর্তমান। বিষ্ণুর প্রতিভূস্বরূপ জগন্নাথও হুগলী জেলার কোন কোন অঞ্চলে পূজিত হন। এই প্রসঙ্গে রিষড়ার ও মাহেশের বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। হুগলীর বাবুগঞ্জে একটি জগন্নাথ মন্দির এবং জগন্নাথের নামে একটি ঘাট আছে।

হুগলীর সর্বত্রই শিবমন্দিরের উপস্থিতি লক্ষণীয়। তারকেশ্বরের শৈব মঠ দশনামী সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত সর্বভারতীয় তীর্থ হলেও, বৈষ্ণবধর্মের ন্যায় শৈবধর্ম এখানে কোন বিশেষ রূপে গড়ে ওঠেনি। স্মার্ত পঞ্চোপাসনার অঙ্গ হিসাবে শিব সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারাই এখানে পূজিত হন, এবং প্রসিদ্ধা দেবীদের মন্দির চত্বরের মধ্যেই দুইটি থেকে চোদ্দটি পর্যন্ত সারিবদ্ধ শিবমন্দির দেখা যায়, অধিকাংশই আটচালা ধরনের। একক বিখ্যাত শিবমন্দিরও কিছু আছে যেমন চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর, গুড়াপের গৌড়েশ্বর, ভাস্তারার স্বয়ম্ভুদেব, মহানাদের জটেশ্বরনাথ, গোঘাটের শৈলেশ্বর, পাউনানের টাটেশ্বর, বৈদ্যবাটির রাঘবেশ্বর, সেনপুরের ভূতনাথ, ইত্যাদি। শিবের একটি লৌকিক রূপ বুড়োশিবের পূজা হুগলী জেলায় জনপ্রিয়। ধনিয়াখালি, দশঘরা, হরিপাল ও উত্তরপাড়ার বুড়োশিবের মন্দির এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

হুগলীতে শাক্তধর্ম বিশেষ জনপ্রিয় এবং সেই হিসাবে কালীমন্দিরের অবস্থান জেলার সর্বত্র। কালী ছাড়া দুর্গার উদ্দেশে নিবেদিত মন্দির বালি-দেওয়ানগঞ্জ, চোপা, ভাস্তারা, দ্বারহাট্টা, ভুরসুট প্রভৃতি স্থানে বর্তমান। এই সকল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহসমূহের বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়, যেমন ভাস্তারার দেবীমূর্তি দুর্গা ও চামুণ্ডার সংমিশ্রণ, দ্বারহাট্টার দ্বারিকাচণ্ডী দুর্গার দ্বিভূজা রূপ। বিশুদ্ধ তন্ত্রমতে যে সকল দেবী পূজিতা হন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী। অপরাপর তান্ত্রিক দেবীদের মধ্যে জামনার ভুবনেশ্বরী, সুখাড়িয়ার আনন্দভৈরবী, চন্দননগরের (বাড়াইচণ্ডী, রাজবলহাটের রাজবল্লভী, কোতলপুরের

রাজরাজেশ্বরী, শিয়াখালার উত্তরবাহিনী প্রভৃতির মন্দির ও মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তান্ত্রিক দেবী বিশালাক্ষীর পরিচয় পাওয়া যায় হরিপাল, চন্দননগর, ইনাথনগর, গোপীনগর, সেনহাট, সিঙ্গুর, উত্তরপাড়া, ডিহিবায়ড়া প্রভৃতি স্থানে।

শীতলা, মনসা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবীদের স্থান, বেদী ও মন্দিরের সংখ্যা হুগলী জেলায় অনুল্লেখ্য নয়। সুগন্ধ্যায় শীতলার একটি বিশিষ্ট মন্দির আছে। কামদেবপুর, পুইনান, দ্বারবাসিনী, পোলবা, ভদ্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানে মনসামন্দির বর্তমান। পাউনানে ধর্মঠাকুরের একটি মন্দির আছে। দশঘরা ও রিষড়ায় ধর্মঠাকুর কালু রায় নামে পূজিত হন। মহানাদ নাথপন্থীদের একটি বড় ক্ষেত্র। সেখানকার জটেশ্বরনাথের মন্দির আজও নাথপন্থীদের দ্বারা পরিচালিত। সোমসপুরের লৌকিক দেবতা বুড়ো দামান নাথপন্থীদের সঙ্গে সম্পর্কিত। হুগলী জেলায় যে একদা বৌদ্ধ ও জৈন মতের প্রতিষ্ঠা ছিল তার পর্যাপ্ত প্রমাণ আছে। ভাণ্ডারহাটি থেকে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের একটি মূর্তি বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। মূর্তিটি দশম শতকে নির্মিত। দশম শতকের একটি জিনমূর্তি ভদ্রকালী থেকে পাওয়া গেছে। পাণ্ডুয়া থেকে পার্শ্বনাথের একটি মূর্তি পাওয়া গেছে যা কায়োৎসর্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান।

হুগলী জেলা বঙ্গদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের সর্বপ্রধান কেন্দ্র ছিল। ইউরোপীয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীরা এই জেলাতেই বসতি স্থাপন করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই খ্রীষ্টীয় পুরাকীর্তি সম্পদে হুগলী জেলা বিশেষভাবে ধনী। হুগলী জেলার গীর্জাসমূহ এখানকার বসতিকারী বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতির নিজস্ব স্থাপত্যরীতির পরিচায়ক এবং সেই হিসাবে প্রতিটি গীর্জারই একটি নিজস্ব শিল্পগত আবেদন আছে। বঙ্গদেশের প্রাচীনতম গীর্জা ব্যাণ্ডেলে অবস্থিত; প্রতিষ্ঠাকাল ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দ। সেন্ট জনের উদ্দেশে নিবেদিত আর্মেনীয় গীর্জা ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে খোজা যোহানেস কর্তৃক নির্মিত। চুঁচুড়ার ওলন্দাজ শাসক সিটেরমান ও ফের্নেটের দ্বারা নির্মিত প্রোটেস্টান্ট গীর্জাটি ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল এবং কিছুকাল আগে পর্যন্ত তা বর্তমান ছিল, কিন্তু এটিকে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী নির্দেশে ভেঙে দেওয়া হয়েছে। সেন্ট জোসেফ কনভেন্টের চত্বরের মধ্যে একটি ছোট রোমান ক্যাথলিক গীর্জা আছে যার নির্মাণকাল ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দ। অনতিদূরেই ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত সর্বসাধারণের উপযোগী একটি বৃহৎ রোমান ক্যাথলিক গীর্জা বর্তমান। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে রোমান ক্যাথলিক গীর্জা স্থাপিত হয় এবং তাতে স্থান অকুলান হওয়ায় ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আরও একটি গীর্জা নির্মিত হয়। শ্রীরামপুরে

লুথারীয়দের সেন্ট ওলাফ গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হয়১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে।

ধর্মনিরপেক্ষ পুরাকীর্তিসমূহের মধ্যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের ঐতিহ্যবাহী দু'একটি দেওয়াল ও দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ও কিছু মুদ্রা ছাড়া আর বিশেষ কিছু দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে আঠারো-উনিশ শতকের বেশ কিছু প্রাসাদোপম অট্টালিকা, সমাধিক্ষেত্র, স্থাপত্যমূলক সমাধি, বাঁধ ও সেতু পুরাকীর্তির এলাকায় আসে। উনিশ শতকে নির্মিত প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহ অনেক ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় স্থাপত্যশৈলীর অনুসারী। এই স্থাপত্যশৈলীর প্রথম প্রকাশ দেখা যায় গঙ্গাতীরের শহরগুলিতে যেখানে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি নিজেদের সদর দপ্তর, প্রশাসক ও কর্মচারীদের আবাস প্রভৃতি নির্মাণ করে। পরে স্থানীয় ধনী বাসিন্দারা, এমনকী দূরবর্তী অঞ্চলের জমিদারেরাও এই রীতিতে অট্টালিকা নির্মাণে আগ্রহী হয়। বহুক্ষেত্রে আবার ইউরোপীয় ও এদেশীয় স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়।

৫ ॥ স্থাপত্যরীতি

হুগলী জেলায় রেখ ধরনের মন্দিরের সংখ্যা খুবই কম। রেখ বা শিখর দেউলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এইযে এখানে গর্ভগৃহের চাল ঈষৎ বক্ররেখায় শিখরাকৃতি হয়ে সোজা উপরের দিকে উঠে যায়। শিখরের উপরিভাগে আমলক প্রভৃতি বসানো হয়। খানাকুল থানার অন্তর্গত সেনহাটে এইরকম একটি সাদামাটা দেউলের নিদর্শন পাওয়া যায়। অধিকাংশ রেখ দেউলের শিখর অঞ্চলকে দৃষ্টিনন্দন করার জন্য আড়াআড়িভাবে খাঁজকাটা হয়। এইরকম খাঁজকাটা শিখরযুক্ত রেখ ধরনের মন্দিরের কয়েকটি নিদর্শন পাওয়া যায় বৈঁচিগ্রামে।

হুগলীর মন্দিরসমূহের একটা বড় অংশই বঙ্গদেশের চিরপরিচিত দোচালা, চৌচালা বা আটচালা ঘরের গঠনপ্রণালী অনুসরণ করে নির্মিত। এই আকৃতি-প্রকৃতিই ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাসে গৌড়ীয় বা বাংলা রীতি নামে খ্যাত। এই শ্রেণীর মন্দির ইষ্টকনির্মিত হলেও চালাগুলির ঊর্ধ্ব মিলনরেখা এবং কার্নিসগুলি মাটি-বাঁশ-খড় দিয়ে তৈরি ঘরের মতই বাঁকানো। এই ধরনের মন্দিরগুলিকে নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

এক—বাংলা বা দোচালা। এই ধরনের মন্দির দোচালা কুটিরের অবিকল অনুকৃতি। পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের মন্দির কম, হুগলীতে আরও কম। চন্দননগরের বোসপাড়ার নন্দনন্দন মন্দির এবং আঁটপুর ও শ্রীপুরের দুটি কাষ্ঠনির্মিত চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়া হুগলীতে দোচালা ধরনের গড়ন বড় একটা চোখে পড়ে না।

জোড়-বাংলা যা পাশাপাশি দুটি দোচালা মিলিয়ে তৈরি। দশঘরা এবং মহানাদে সাদামাটা আদিম ধরনের জোড়-বাংলা মন্দির দেখা যায়। দাদপুর থানার অন্তর্গত সিনেটের বিশালাক্ষী মন্দির এবং গুপ্তিপাড়ার চৈতন্য মন্দির

জোড়-বাংলা ধরনের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কখনও কখনও জোড়-বাংলা মন্দিরের উপর চারচালা বা আটচালা ধরনের শিখর বসানো হয়। গোঘাট থানার অন্তর্গত বালি-দেওয়ানগঞ্জের দুর্গামন্দিরের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেখানে জোড়-বাংলা মন্দিরের উপর নবরত্ন শিখর বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চারচালা বা চৌচালা যা চারচালা ঘরের মত চারটি দেওয়ালের উপর ত্রিভুজের ন্যায় আকারবিশিষ্ট চারটি সংলগ্ন চালার সহযোগে গঠিত। চালা চারটি একটি সরল বা বক্র সংযোগরেখা বা বিন্দুতে মিলিত। বহুক্ষেত্রে চালা চারটির ঢাল অনেকটা কমিয়ে কেন্দ্রে একটি শিখর স্থাপন করা হয়। এই জাতীয় শৈলীর নিদর্শন পাওয়া যায় গোঘাট থানার অন্তর্গত সেলানপুর ও শ্যামবাজারে। পুরশুড়া থানার অন্তর্গত বাখরপুরে তিনটি খিলানদ্বার বিশিষ্ট একটি চারচালা মন্দির আছে। অনেক ক্ষেত্রে আটচালা মন্দিরের নাটমণ্ডপ হিসাবে চারচালার ব্যবহার করা হয়। আরামবাগ মহকুমার পারুল ও রাজহাটিতে এই ধরনের নিদর্শন পাওয়া যায়।

আটচালা যা একটি চারচালার উপর আর একটি চারচালা বসিয়ে তৈরি করা হয়। নিম্নের চারচালার উপর অল্প পরিসর বেদী দিয়ে একটু ব্যবধান করে অনুরূপ আর একটি ক্ষুদ্রতর আকৃতির চারচালা স্থাপন করাই এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমবঙ্গ তথা হুগলী জেলায় আটচালা মন্দিরের সংখ্যা অজস্র। প্রথাগত আটচালা মন্দিরের ছাদের কার্নিস বাঁকানো, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে সমান কার্নিসও থাকে। তার কিছুটা নীচে এক বা একাধিক খিলানের বক্রবেষ্টনী, তার নীচে বক্ররেখ অথবা ক্ষেত্রবিশেষে সমরেখ দ্বারকাঠামো। মন্দির বড় হলে গর্ভগৃহের সম্মুখবর্তী স্থানটিকে অলিন্দস্বরূপ গণ্য করা হয় এবং তা সচরাচর স্তম্ভের উপর গঠিত তিনটি সাধারণ বা পলকাটা খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট হয়। অনেক ক্ষেত্রে গর্ভগৃহের দুদিকে পার্শ্বশালা থাকে। মন্দির ছোট হলে সচরাচর প্রবেশদ্বার একটিই থাকে। চারদিকের কৌণিক স্তম্ভ খাঁজকাটা ও বেষ্টনীযুক্ত হয়। সম্মুখভাগেই যাবতীয় অলঙ্করণ থাকে। বাকি তিন দেওয়ালের বহির্ভাগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাদামাটা ও সোজা গাঁথুনির হয়। অতি বৃহৎ আটচালা মন্দিরসমূহের মধ্যে মাহেশের রাধাবল্লভ, শ্রীরামপুরের হেনরী মার্টিনের প্যাগোডা ও গুপ্তিপাড়ার কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির উল্লেখযোগ্য।

ডেভিড ম্যাকাচ্চন আটচালা মন্দিরসমূহকে ছাদের গড়ন ও বক্রতার ভিত্তিতে দু'ভাগে ভাগ করেছেন—অষ্টাদশ শতকের হুগলী-বর্ধমান ধরন এবং উনবিংশ শতকের মেদিনীপুর ধরন। প্রথম ধরনের মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায় হরিপাল, দ্বারহাট্টা, বোড়াগড়ি, গোবিন্দপুর, কাঁকড়াকুলি, গুড়াপ, হমীরবাটি, বাহিরগড়, রাজবলহাট, ভালিয়া, খেদাইল, পারুল, কৃষ্ণপুর, কালিকাপুর, আঁটপুর, এলোমা, জয়নগর, রামনগর, পুরশুড়া, জঙ্গলপাড়া, মণ্ডলাই, মালঞ্চ প্রভৃতি স্থানে। দ্বিতীয় ধরনটি পাওয়া যায় বালি, ডিহিবায়ড়া, পারুল, কৃষ্ণগঞ্জ, রাজহাটি, সেলানপুর

প্রভৃতি স্থানে। সেলানপুরের দামোদর মন্দিরটি সোজা কার্নিসযুক্ত। ছোট মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রথম ধরনটির সন্ধান পাওয়া যায় সাহাগঞ্জ, বৈঁচিগ্রাম, হরিরামপুর, মহেশপুর, কোন্নগর, উত্তরপাড়া, ভাঙ্গামোড়া, নিত্যানন্দপুর, গৌরহাটি, প্রভৃতি স্থানে।

বারোচালা মন্দির আটচালা মন্দিরেই বর্ধিত রূপ। আটচালার উপর ক্ষুদ্র আকৃতির আর একটি চারচালা স্থাপন করলেই বারোচালা হয়। পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত ইলছোবায় একটি বারোচালা শিবমন্দির আছে। আরও একটি বারোচালা মন্দির আছে আরামবাগ থানার অন্তর্গত সেনহাটে।

শিখরবিশিষ্ট মন্দিরকে রত্নমন্দির বলা হয়। মন্দিরটির যদি একটিই চূড়া থাকে তাহলে তাকে বলা হয় একরত্ন। চারচালা মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে একটি বৃহৎ শিখর এবং কার্নিসের প্রতি কোণে একটি করে ক্ষুদ্রতর শিখর সংযুক্ত করলে পঞ্চরত্ন মন্দির হয়। মন্দিরটি দোতলা বা আটচালা হলে কেন্দ্রস্থ শিখর, একতলার চার কোণে চারটি এবং দোতলার চারকোণে চারটি শিখর নিয়ে নবরত্ন মন্দির গঠিত হয়। মন্দিরটি ত্রিতল হলে প্রতিটি তলের চারটি করে শিখর নিয়ে ত্রয়োদশরত্ন মন্দির তৈরি হয়। মন্দিরের তলের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এবং প্রতি তলের কোণের শিখরের সংখ্যা বৃদ্ধি করে মোট শিখরের সংখ্যা এমনকি পঁচিশ বা ততোধিক করা যেতে পারে।

হুগলী জেলায় একরত্ন মন্দিরসমূহের সংখ্যা খুব বেশি নয়। গোঘাট থানার অন্তর্গত উদয়রাজপুরে একটি একরত্ন মন্দির আছে যার শিখরদেশ রেখ দেউল ধরনের খাঁজকাটা। খানাকুল থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের রাধাবল্লভ মন্দিরটিও একরত্ন, এখানে শিখরটি চারচালা। বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেব মন্দির এবং গুপ্তিপাড়ার রামচন্দ্র মন্দিরও একরত্ন ধরনের, উভয় মন্দিরের শিখরই আটকোণা। আরামবাগ থানার অন্তর্গত কানপুরের কণকেশ্বর মন্দিরও একরত্ন। মন্দিরটির চারদিকেই খোলা খিলান, উপরে শিখর।

একরত্নের তুলনায় পঞ্চরত্ন মন্দিরের সংখ্যা হুগলী জেলায় অনেক বেশি। চারচালা মন্দিরের চারকোণে চারটি শিখর এবং তার সঙ্গে একটি কেন্দ্রীয় শিখর যোগ করলে পঞ্চরত্ন মন্দির হয়। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার এবং খাঁজকাটা রেখ ধরনের শিখরবিশিষ্ট পঞ্চরত্ন মন্দিরের পরিচয় পাওয়া যায় গোঘাট থানার অন্তর্গত মেমানপুর, বালি, কয়াপাট ও মাসুদপুরে, পুরশুড়া থানার অন্তর্গত শোঙালুকে, ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত দশঘরায়, চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত বৈজহাটিতে, দাদপুর থানার অন্তর্গত কৃষ্ণপুরে এবং আরও কয়েকটি স্থানে। একটিমাত্র খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার ও খাঁজকাটা রেখ ধরনের শিখরবিশিষ্ট পঞ্চরত্ন মন্দিরের পরিচয় পাওয়া যায় ডিহিবাতপুর, উত্তরপাড়া, হরিপাল, দ্বারহাট্টা,

ভাঙামোড়া, গুড়াপ, বড়াগড়ি, শ্রীপুর প্রভৃতি স্থানে। খানাকুল থানার অন্তর্গত সেনহাট এবং আরামবাগ থানার অন্তর্গত লক্ষ্মীপুরে দুটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে, যেগুলির শিখর রেখধরনের হলেও খাঁজকাটা নয় মসৃণ এবং শিখরের কার্নিস যথেষ্ট বাঁকানো।

দ্বিতল বা আটচালা মন্দিরের প্রতি তলের ছাদের চার কোণে একটি করে শিখর ও কেন্দ্রস্থ শিখরের সহযোগে নবরত্ন মন্দির গঠিত হয়। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারবিশিষ্ট সমান খাঁজকাটা রেখ ধরনের শিখরসহ নবরত্ন মন্দিরের পরিচয় পাওয়া যায় খানাকুল, মগরা থানার অন্তর্গত দিগসুই, পুরশুড়া থানার অন্তর্গত সুন্দুরুস, গোঘাট থানার অন্তর্গত বদনগঞ্জ ও কয়াপাট প্রভৃতি স্থানে। বাঁকানো খাঁজকাটা রেখ ধরনের শিখরের পরিচয় পাওয়া যায় খানাকুল থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগরের গোপীনাথ মন্দিরের ক্ষেত্রে। লম্বা ও সরু ধরণের খাঁজকাটা রেখ ধরনের শিখরের পরিচয় পাওয়া যায় চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত বাকসার রঘুনাথ মন্দির এবং পুরশুড়া থানার অন্তর্গত বৈকুণ্ঠপুরের শ্রীধর মন্দিরের ক্ষেত্রে। গোঘাট থানার অন্তর্গত হাজিপুরের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরটি নবরত্ন কিন্তু তা দ্বিতল নয়। সোমড়ার নিস্তারিণী ও হরসুন্দরী কালীমন্দিরদ্বয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিখরগুলি সমান কার্নিসের উপর বসানো।

ত্রয়োদশরত্ন মন্দির হুগলী জেলাতে নেই বললেই হয়। গোঘাট থানার অন্তর্গত বালির মঙ্গলচণ্ডী মন্দিরটি ত্রয়োদশরত্ন ছিল বলে কথিত। বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দিরের তেরটি শিখর, কিন্তু এটি একটি নিয়মবহির্ভূত মন্দির। হুগলী জেলায় কোন সপ্তদশরত্ন বা একবিংশতিরত্ন মন্দির নেই। একটি মাত্র পঞ্চবিংশতিরত্ন মন্দিরের নিদর্শন পাওয়া যায় সুখাড়িয়ার আনন্দভৈরবী মন্দিরের ক্ষেত্রে। এই মন্দিরের একতলার ছাদের চার কোণে তিনটি করে বারোটি, দ্বিতলের চার কোণে দুইটি করে আটটি, ত্রিতলের চার কোণে একটি করে চারটি, এবং তৎসহ কেন্দ্রীয় শিখর নিয়ে মোট পঁচিশটি শিখর বর্তমান।

এইগুলি হুগলী জেলার মন্দিরসমূহের মূল ধরন। এছাড়া এই জেলায় কয়েকটি অষ্টকোণযুক্ত শিখরবিশিষ্ট মন্দির এবং সমতল ছাদবিশিষ্ট দালান ধরনের মন্দির আছে। শেষোক্ত ধরনের মন্দিরের মধ্যে সালেপুর ও হরিণখালির ধর্মমন্দির, সেলানপুরের দামোদর মন্দির, কামারপুকুরের বিষ্ণুমন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনেকক্ষেত্রে মূল মন্দিরের সামনে দালান, বা দোচালা বা চারচালা ধরনের মণ্ডপ বা নাটমন্দির থাকে। মন্দির ছাড়াও হুগলী জেলায় প্রচুর সংখ্যক রাসমঞ্চ এবং দোলমঞ্চ আছে। এগুলি মূলত খিলান, স্তম্ভ ও শিখর দিয়ে রচিত। সাধারণত রাসমঞ্চ আটকোণা ভিত্তির উপর এবং দোলমঞ্চ চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর নির্মিত হয়।

ইটের মন্দিরের অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'টেরাকোটা'র (terracotta) অলঙ্করণ বিদ্যমান। বিষয়বস্তু প্রধানতঃ দেবদেবী, রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণলীলা, পশুপক্ষী, রেখাচিত্র ও উদ্ভিদজ্জধর্মী। এই বিষয়গুলি কিছুক্ষেত্রে ফলকের উপর উৎকীর্ণ এবং অন্যান্যক্ষেত্রে গোটা চিত্রিত ফলকটি ছাঁচে গড়া।

মসজিদ ও সমাধিভবনসমূহকে মোটামুটি নিম্নলিখিত চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। (১) সমচতুষ্কোণ একটি গম্বুজওয়ালা কক্ষ; অভ্যন্তর স্তম্ভবিরহিত; কার্নিসের উপর চারকোণে চারটি অষ্টকোণযুক্ত শিখর; এবং সম্মুখে অলিন্দ। হুগলী জেলার অধিকাংশ ছোট ও মাঝারি আকারের মসজিদ এই পর্যায়ভুক্ত। (২) প্রথমটির অনুরূপ; কিন্তু একটি সম্মুখস্থ অলিন্দের পরিবর্তে তিনদিকে তিনটি অলিন্দ। বহুস্থানেই এই জাতীয় মসজিদের ক্ষেত্রে একটির পরিবর্তে তিনটি গম্বুজের ব্যবহার হয়। (৩) বেশি লম্বা এবং কম চওড়া একটি বৃহৎ ও উচ্চ কেন্দ্রশালা, যার উপর খিলানের ছাদ এবং দুই পাশে তুলনামূলকভাবে অল্প উচ্চতাবিশিষ্ট দুইটি পার্শ্বশালা; পার্শ্বশালার উপর গম্বুজ; অভ্যন্তরভাগ স্তম্ভশ্রেণী ও খিলানের দ্বারা লম্বালম্বি ও পাশাপাশি অনেকগুলি কক্ষায় বিভক্ত। (৪) বেশি লম্বা, কম চওড়া একটি বৃহৎ কক্ষ; বহুসংখ্যক গম্বুজ; অভ্যন্তরভাগ স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা অনেকগুলি কক্ষায় বিভক্ত; প্রতিটি লম্বালম্বি কক্ষার পশ্চিমপ্রান্তে একটি মিহ্‌রাব এবং পূর্বপ্রান্তে অর্থাৎ সম্মুখদিকে ঠিক সেই বরাবর একটি খিলান; ছাদের বহুসংখ্যক গম্বুজের খিলানগুলি স্তম্ভশ্রেণীর শীর্ষদেশে প্রতিষ্ঠিত

বড় মসজিদের ক্ষেত্রে প্রাঙ্গণের তিনদিক বেষ্টন করে থাকে প্রাচীর এবং কুঠুরির সারি। প্রাচীরসংলগ্ন এই কুঠুরির সারিকে বলা হয় রিওয়াক। প্রাঙ্গনের মধ্যস্থলে অথবা কোন উপযুক্ত জায়গায় থাকে চৌবাচ্চা কেননা নমাজের আগে মুখমণ্ডল ও হস্তপদ প্রক্ষালনের রীতি আছে। পশ্চিমদিকে থাকে লিওয়ান বা স্তম্ভ সমন্বিত দরদালান। দরদালানের পশ্চিমদিকের দেওয়ালে থাকে তোরণযুক্ত অথবা বাঁকানো খিলানের দ্বারা গঠিত মিহরাব। এই মিহরাব মক্কার দিক নির্দেশ করে। মিহ্‌রাবের অদূরে থাকে মিম্বার বা বেদী। অনেক ক্ষেত্রে মিহ্‌রাবের সামনে একটি জালিময় দেওয়াল বা মকসুরা তৈরি করা হয়। মসজিদ স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যে তিনটি বিষয় প্রত্যক্ষভাবে চোখে পড়ে সেগুলি হল বাঁকানো খিলানের সাহায্যে সৌধের বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করা, বর্তুলাকৃতি বিশাল আয়তনের গম্বুজ নির্মাণ ও সৌধশীর্ষে ওই গম্বুজের সংস্থাপন এবং বৃত্তাকার স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রের উপর সুউচ্চ মিনার নির্মাণ।

মুসলিম স্থাপত্যের ক্ষেত্রে খিলানের কৃৎকৌশল লক্ষণীয়। বহুধরনের খিলানের ব্যবহার মসজিদসমূহের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। পূর্ববর্তী আমলের

খিলানসমূহ ছিল সাদামাটা, একটি ইটের উপর আর একটি ইট কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে সমানভাবে বসানো হত। দুদিক থেকে বসানো ইটের বাড়ানো অংশ একটা নির্দিষ্ট উচ্চতায় এসে মিলে গেলেই খিলান তৈরি হয়ে যেত। মধ্যযুগে খিলান তৈরির ক্ষেত্রে ইটের উপর ইট সমানভাবে না বসিয়ে নির্দিষ্ট মাপজোকের ভিত্তিতে কোণাকুণিভাবে স্তম্ভ থেকে বৃত্তাকারে, অর্ধবৃত্তাকারে বা উপবৃত্তাকারে সাজিয়ে গাঁথা হত এবং খিলানের ঠিক মধ্যদেশে একটি কীলক বসানো হত যাতে দুই দিকের মাপ ও ভরের কোন বিচ্যুতি না ঘটে। এই প্রণালীরই ব্যাপ্তি ঘটিয়ে বড় বড় গম্বুজ তৈরি করা হত। দেওয়ালের ভিতরের দিকে বা বাইরের দিকে নানা ধরনের অলঙ্করণ করা হত। ইসলামধর্মে মনুষ্যমূর্তি নিষিদ্ধ হওয়ায় তার বদলে লতাপাতা ও জ্যামিতিক নক্‌শা খোদাই করা হত। এছাড়া নানা রঙের ও নানা আকৃতির মিনা করা কাচের ন্যায় মসৃণ টাইল ও ইটের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সুলতানী ও মুঘল আমলে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত মসজিদগুলি ছিল বৃহদায়তন ও বহুগম্বুজ বিশিষ্ট। পাণ্ডুয়ার বাইশ দরওয়াজা মসজিদে গম্বুজের সংখ্যা ছিল ৬৩টি। পরবর্তীকালের মসজিদসমূহ প্রধানত তিনগম্বুজ ও একগম্বুজ বিশিষ্ট।

হুগলী জেলার খ্রীষ্টীয় গীর্জাসমূহ ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত। প্রাথমিকভাবে গীর্জার পক্ষে প্রয়োজন একটি হলঘরের যেখানে বেশ কিছু লোক সমবেত হয়ে প্রার্থনা করতে পারেন। শ্রীরামপুরের পরিত্যক্ত রাধাবল্লভ মন্দিরটিকেও একদা গীর্জা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সরল ধরনের গীর্জা বলতে একটি আয়তাকার ঘর বোঝায়। ঘরের ছাদের সম্মুখভাগে একটি ত্রিকোণ পেডিমেন্ট বসানো হয় এবং তার উপর ক্রস স্থাপন করা হয়। কিন্তু এই ধরনের সরল গীর্জা হুগলী জেলায় নেই বললেই হয়। চুঁচুড়া শহরে উত্তর ভারতীয় মণ্ডলী পরিচালিত এই ধরনের একটি প্রোটেস্টান্ট গীর্জা আছে। হুগলী জেলার অধিকাংশ গীর্জাই বেশ জমকালো।

হিন্দু মন্দিরের ক্ষেত্রে যেমন কয়েকটি বাঁধা ধরন আছে এবং মসজিদের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য থাকলেও স্থাপত্যশৈলীর ক্ষেত্রে গম্বুজ, মিনার প্রভৃতির ব্যবহারের দ্বারা যেমন একটা ঐক্য পরিলক্ষিত হয়, গীর্জার ক্ষেত্রে স্থাপত্যগত বৈচিত্র্যের বিষয়টি অনেক বেশি ব্যাপক। তবে সকল গীর্জার ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় যা হচ্ছে আয়তাকার প্রার্থনা হল, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই হলের দুদিকে বা তিনদিকে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা থাকে। একটি পূর্ণাঙ্গ বৃহৎ গীর্জার গঠনকারী অংশগুলি হচ্ছে নেভ, ট্রান্সেপ্ট, কয়্যার, আইল, কয়্যার-স্ক্রীন, ক্রসিং, স্যাংচুয়ারি, রেট্রোকয়্যার, লেডী চ্যাপেল, স্লাইপ, চ্যাপটার হাউস, ক্লেরেস্টরি, ট্রিফোরিয়াম, নেভ-আর্কেড, চেভেট, অ্যাম্বুলেটারি,

চ্যানসেল, ভেস্ট্রি, পর্চ, স্টিপ্‌ল, ফিনিয়াল এবং পিনাক্‌ল। সব অংশগুলির বর্ণনা এখানে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, এবং সকল গীর্জায় এতগুলি অংশ থাকে না।

একটি পূর্ণাঙ্গ গীর্জার প্রাথমিক বিষয় একটি আয়তাকার দীর্ঘ হলঘর এবং তৎসংলগ্ন সুউচ্চ শিখর। হলঘরের দুটি অংশ—নেভ বা কেন্দ্রশালা এবং আইল বা পার্শ্বশালা। কেন্দ্রশালাটি দ্বিতলের মত উচ্চ হলেও দ্বিতল নয় কিন্তু দুদিকের পার্শ্বশালা দ্বিতল হতে পারে। শিখর অংশটিকে বলা হয় স্টিপ্‌ল। এই স্টিপ্‌লের এক বা একাধিক তলবিশিষ্ট নিম্নভাগকে বলা হয় টাওয়ার এবং তার উপরে উত্থিত লম্বা পিরামিডাকৃতি বা মোচাকৃতি চূড়াটিকে বলা হয় স্পায়ার। হলঘরের পাশ বরাবর ঢালু ছাদ ও পেডিমেন্টযুক্ত তিনটি কক্ষ থাকে যেগুলি যথাক্রমে পর্চ, ট্রান্সেপ্ট ও ভেস্ট্রি নামে পরিচিত। শিখর অঞ্চল থেকে শুরু করে হলঘরটি যেখানে শেষ হয় সেখানে পেডিমেন্টের দুপাশে দুটি সরু শিখর থাকে যেগুলি পিনাক্‌ল নামে পরিচিত। স্পায়ারের উপর এবং পেডিমেন্টসমূহের শীর্ষে ক্রশ স্থাপন করাই স্বাভাবিক রীতি। কোন কোন গীর্জার ক্ষেত্রে যাতে গীর্জার সব অংশ এবং বিরাটত্ব সহজে দৃষ্টিগোচর হয় সেজন্য হলঘরের পেডিমেন্টের নীচে ঢালু ছাদ ও ছোট পেডিমেন্টযুক্ত আরও একটি মণ্ডপ জুড়ে দেওয়া হয়।

হুগলী জেলার গীর্জাসমূহ পূর্ণাঙ্গ গীর্জার অধিকাংশ শর্তই পূরণ করে। এখানকার প্রসিদ্ধ গীর্জাগুলি ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্থাপত্যশৈলীর পরিচায়ক, এবং সেই হিসাবে এগুলির আলাদা মূল্য আছে। ব্যাণ্ডেলের গীর্জা পর্তুগীজদের সৃষ্টি, চুঁচুড়ার সেন্ট জনের গীর্জা আর্মেনীয়দের সৃষ্টি, চন্দননগরের গীর্জা ফরাসীদের সৃষ্টি, শ্রীরামপুরের সেন্ট ওলাফের গীর্জা ডেনীয়দের সৃষ্টি। বিভিন্ন স্থাপত্যরীতির এই রকম সমাবেশ অন্যত্র বড় একটা চোখে পড়ে না।

পুরাকীর্তি পরিচিতি

আকনাপুর

তারকেশ্বর থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বালিগড়ি-১ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৩৭। হাওড়া-তারকেশ্বর বা শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর লাইনে বালিগড়ি রেলস্টেশন থেকে ৩ কিমি দূরে কানা দামোদরের বাম তীরে অবস্থিত। এখানে অষ্টাদশ শতকের দুটি আটচালা মন্দির আছে। প্রথমটি দক্ষিণমুখী, স্থানীয় কুণ্ডু পরিবার কর্তৃক ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত, বর্তমানে পরিত্যক্ত। দ্বিতীয়টি রঘুনাথ মন্দির নামে পরিচিত, পূর্বমুখী, স্থানীয় মল্লিক পরিবার কর্তৃক ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত, বর্তমানে অবহেলিত। উভয় মন্দিরের সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর কারুকার্য বর্তমান। রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতা, রাজদরবারের দৃশ্য, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ এই কারুকার্যের বিষয়বস্তু।

আঁটপুর

শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত জাঙ্গীপাড়া থানা ও ব্লকের এলাকাধীন গ্রাম। জে এল নম্বর ৭২। প্রাচীনকালে এই স্থান ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁতের কাপড়ের জন্য একদা এই এলাকার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। আঁটপুরের দক্ষিণে আনারবাটি নামে একটি গ্রাম আছে। যে এল নম্বর ১৪। কথিত আছে আটর খান এবং আনার খান এই দুই জমিদারের নামে গ্রামদ্বয়ের নামকরণ হয়েছে। আনারবাটি একটি বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান এবং দ্বাদশ পাটের অন্যতম। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ পরমেশ্বরদাস ঠাকুর এখানে একটি শ্যামসুন্দরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্তিটি এখানকার ঠাকুরবাড়িতে এখনও বর্তমান। কথিত আছে মহাপ্রভু একদা স্বয়ং আনারবাটিতে পদার্পণ করেছিলেন।

হাওড়া স্টেশন থেকে আঁটপুরের দূরত্ব মাত্র ৪৫ কিমি। পূর্বে হাওড়া ময়দান থেকে মার্টিন কোম্পানীর রেলে আঁটপুর স্টেশনে নামা যেত। এখন হাওড়া-তারকেশ্বর শাখার হরিপাল রেলস্টেশন থেকে বাসে বা রিকশায় আঁটপুর যেতে হয়। আঁটপুরের যাবতীয় পুরাকীর্তি এখানকার প্রসিদ্ধ মিত্র বংশের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। এই জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালিদাস মিত্র। তাঁর বংশধর কন্দর্পনারায়ণ মিত্র ভূরিশ্রেষ্ঠ বা ভুরসুটের ব্রাহ্মণ রাজার আনুকূল্যে

আঁটপুরেই বসতি স্থাপন করেন। কন্দর্পনারায়ণের পৌত্র কৃষ্ণরাম মিত্র বর্ধমান রাজ কীর্তিচাঁদের দেওয়ান হিসাবে প্রচুর ভূসম্পত্তি অর্জন করেন।

এখানকার বিখ্যাত রাধাগোবিন্দের মন্দির ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম কর্তৃক নির্মিত এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত। মন্দিরটি প্রথাগত আটচালা, উচ্চ ভিত্তির উপর নির্মিত, তিনটি তরঙ্গিত পলকাটা খিলানের প্রবেশপথ ও বারান্দাযুক্ত। মন্দিরের প্রবেশপথের থামে ও দেওয়ালে মৃৎফলকের উপর কৃষ্ণলীলা, ভীষ্মের শরশয্যা, রাধাকৃষ্ণের ভোজনদৃশ্য, রাসলীলা, রামরাবণের যুদ্ধ, পুতনাবধ, রক্তবীজ সংহার, ননীচোরা কৃষ্ণ, কালী প্রভৃতির ভাস্কর্য, ভিতরের দেওয়ালে মৃৎফলকের উপর পুষ্প ও উদ্ভিজ্জের অলঙ্করণ, বারান্দার ভিতরের ছাদে জ্যামিতিক ও বহুবিধ নকশা পরিদৃষ্ট হয়। প্রতিটি ফলকের বিষয়বস্তুর প্রকাশভঙ্গীতে সজীবতা, সাবলীলতা ও বিস্ময়কর মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে এই মন্দিরের সঙ্গে গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের সাদৃশ্য আছে।

রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রাধাগোবিন্দের রাসমঞ্চ ও দোলমঞ্চ এবং পাঁচটি শিবমন্দির বর্তমান। এইগুলি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নির্মিত। একটির তারিখ ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ, আরও দুটি মন্দিরের তারিখ ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। এগুলিও প্রথাগত আটচালা। অষ্টকোণযুক্ত রাসমঞ্চটি উচ্চ ভিত্তির উপর স্থাপিত। আট দিকেই খিলান, দুই খিলানের মধ্যবর্তী অংশ অলঙ্করণযুক্ত। উপরের প্রতি কোণে বেলনাকার কাণ্ডের উপর মোচাকৃতি চূড়া সন্নিবিষ্ট। দোলমঞ্চটি পঞ্চরত্ন, কেন্দ্রীয় শিখরটি সুউচ্চ, প্রতিটি শিখরের উপরিভাগ রেখদেউল ধরনে আড়াআড়িভাবে খাঁজকাটা। চারদিকে চারটি স্তম্ভের উপর দোলমঞ্চটি দণ্ডায়মান এবং স্তম্ভগুলি পরস্পর ধনুকাকৃতি খিলানের দ্বারা সংযুক্ত। এছাড়া আরও কয়েকটি শিবমন্দির আঁটপুরে বিদ্যমান। জলেশ্বর ও ফুলেশ্বর শিব মন্দিরদ্বয় ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

আঁটপুরের আরও একটি দর্শনীয় কীর্তি কৃষ্ণরাম মিত্র নির্মিত চণ্ডীমণ্ডপ। এটি কাঠের তৈরি। দোচালা খড়ের ছাদ। পরিকল্পনা ও কৃৎকৌশল খুবই উঁচুদরের। কাঠামো, থাম, চালের আড়া, আনুভূমিক দণ্ড সবকিছুই সুসমঞ্জস। ব্রাকেট বা নাগদণ্ডসমূহ মনুষ্যমূর্তির আকারে খোদিত, প্রলম্বিত অংশগুলিতে দেবদেবীর মূর্তি। উপরের কড়িগুলিতে চৌখুপির মধ্যে ফুলের নকশা, থামগুলির উপরিভাগও কারুকার্যমণ্ডিত। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নির্মিত কাষ্ঠস্থাপত্যের এই বিশিষ্ট ও দুর্লভ নিদর্শনটি ধ্বংসের মুখে। এর অনুরূপ আরও একটি কাষ্ঠনির্মিত চণ্ডীমণ্ডপ হুগলী জেলায় আছে। সেটির অবস্থান বলাগড় ব্লকের অন্তর্গত শ্রীপুরে।

আদি সপ্তগ্রাম

ব্যাণ্ডেলের পরবর্তী রেলস্টেশন। এখানে উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট ভক্ত বৈষ্ণবদের নিকট অতীব আকর্ষণীয়। শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন। বর্তমান ভবনটি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

আমনান

পোলবা-দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত আমনান নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত গ্রাম, জে এল নম্বর ১৬৫। আমনান পাউনান থেকে দেড় কিমি পূর্বে অবস্থিত, চুঁচুড়া থেকে সহজেই বাসে যাওয়া যায়। এখানে বসন্তচণ্ডী, ধর্মরাজ, পঞ্চানন্দ, সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রভৃতি গ্রামদেবতার স্থান আছে। এখানকার রাধানাথ মন্দিরটি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত। সমতল ছাদবিশিষ্ট দালান ধরনের মন্দির, সংযুক্ত বারান্দা, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ। নকশাকাটা পরট (parapet) যুক্ত ছাদ।

আরামবাগ

আরামবাগ হুগলী জেলার পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত মহকুমা ২২°০২′ এবং ২২°৩৬′ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৭°২২′ এবং ৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আরামবাগের পূর্বসীমায় অবস্থিত দামোদর নদ হুগলী জেলার অপর দুই মহকুমা থেকে আরামবাগকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আরামবাগের উত্তরে বর্ধমান জেলার সদর ও কালনা মহকুমা, উত্তর পশ্চিমে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমা, দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার সদর ও ঘাটাল মহকুমা এবং দক্ষিণে হাওড়া জেলার সদর ও উলুবেড়িয়া মহকুমা। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মহকুমা গঠিত হয়, তখন নাম ছিল জাহানাবাদ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জাহানাবাদের নাম বদলে আরামবাগ রাখা হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আরামবাগ পুরসভা গঠিত হয়। আরামবাগের ইতিহাস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

দামোদর ছাড়া মুণ্ডেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বর-রূপনারায়ণ আরামবাগের প্রধান নদী। পূর্বে কলকাতা থেকে বর্ধমান হয়ে ঘুরপথে আরামবাগ যেতে হত। অথবা দক্ষিণপূর্ব রেলের কোলাঘাট স্টেশনে নেমে বা হাওড়া ময়দান থেকে মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেলে চাঁপাডাঙায় নেমে খেয়া নৌকায় দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরী পার হয়ে আরামবাগ যেতে হত। এখন নদীগুলিতে সেতু নির্মিত হওয়ার ফলে আরামবাগে যেতে কোন অসুবিধা নেই। হাওড়া থেকে রেলপথে তারকেশ্বরে এসে সেখান থেকে অনায়াসেই বাস যোগে আরামবাগে আসা যায়। এছাড়া চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর সব জায়গা থেকেই

আঁটপুরেই বসতি স্থাপন করেন। কন্দর্পনারায়ণের পৌত্র কৃষ্ণরাম মিত্র বর্ধমান রাজ কীর্তিচাঁদের দেওয়ান হিসাবে প্রচুর ভূসম্পত্তি অর্জন করেন।

এখানকার বিখ্যাত রাধাগোবিন্দের মন্দির ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম কর্তৃক নির্মিত এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত। মন্দিরটি প্রথাগত আটচালা, উচ্চ ভিত্তির উপর নির্মিত, তিনটি তরঙ্গিত পলকাটা খিলানের প্রবেশপথ ও বারান্দাযুক্ত। মন্দিরের প্রবেশপথের থামে ও দেওয়ালে মৃৎফলকের উপর কৃষ্ণলীলা, ভীষ্মের শরশয্যা, রাধাকৃষ্ণের ভোজনদৃশ্য, রাসলীলা, রামরাবণের যুদ্ধ, পুতনাবধ, রক্তবীজ সংহার, ননীচোরা কৃষ্ণ, কালী প্রভৃতির ভাস্কর্য, ভিতরের দেওয়ালে মৃৎফলকের উপর পুষ্প ও উদ্ভিজ্জের অলঙ্করণ, বারান্দার ভিতরের ছাদে জ্যামিতিক ও বহুবিধ নকশা পরিদৃষ্ট হয়। প্রতিটি ফলকের বিষয়বস্তুর প্রকাশভঙ্গীতে সজীবতা, সাবলীলতা ও বিস্ময়কর মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আকৃতি ও গঠনের দিক থেকে এই মন্দিরের সঙ্গে গুপ্তিপাড়ার বিখ্যাত বৃন্দাবনচন্দ্র মন্দিরের সাদৃশ্য আছে।

রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রাধাগোবিন্দের রাসমঞ্চ ও দোলমঞ্চ এবং পাঁচটি শিবমন্দির বর্তমান। এইগুলি অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নির্মিত। একটির তারিখ ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ, আরও দুটি মন্দিরের তারিখ ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। এগুলিও প্রথাগত আটচালা। অষ্টকোণযুক্ত রাসমঞ্চটি উচ্চ ভিত্তির উপর স্থাপিত। আট দিকেই খিলান, দুই খিলানের মধ্যবর্তী অংশ অলঙ্করণযুক্ত। উপরের প্রতি কোণে বেলনাকার কাণ্ডের উপর মোচাকৃতি চূড়া সন্নিবিষ্ট। দোলমঞ্চটি পঞ্চরত্ন, কেন্দ্রীয় শিখরটি সুউচ্চ, প্রতিটি শিখরের উপরিভাগ রেখদেউল ধরনে আড়াআড়িভাবে খাঁজকাটা। চারদিকে চারটি স্তম্ভের উপর দোলমঞ্চটি দণ্ডায়মান এবং স্তম্ভগুলি পরস্পর ধনুকাকৃতি খিলানের দ্বারা সংযুক্ত। এছাড়া আরও কয়েকটি শিবমন্দির আঁটপুরে বিদ্যমান। জলেশ্বর ও ফুলেশ্বর শিব মন্দিরদ্বয় ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

আঁটপুরের আরও একটি দর্শনীয় কীর্তি কৃষ্ণরাম মিত্র নির্মিত চণ্ডীমণ্ডপ। এটি কাঠের তৈরি। দোচালা খড়ের ছাদ। পরিকল্পনা ও কৃৎকৌশল খুবই উঁচুদরের। কাঠামো, থাম, চালের আড়া, আনুভূমিক দণ্ড সবকিছুই সুসমঞ্জস। ব্রাকেট বা নাগদণ্ডসমূহ মনুষ্যমূর্তির আকারে খোদিত, প্রলম্বিত অংশগুলিতে দেবদেবীর মূর্তি। উপরের কড়িগুলিতে চৌখুপির মধ্যে ফুলের নকশা, থামগুলির উপরিভাগও কারুকার্যমণ্ডিত। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে নির্মিত কাষ্ঠস্থাপত্যের এই বিশিষ্ট ও দুর্লভ নিদর্শনটি ধ্বংসের মুখে। এর অনুরূপ আরও একটি কাষ্ঠনির্মিত চণ্ডীমণ্ডপ হুগলী জেলায় আছে। সেটির অবস্থান বলাগড় ব্লকের অন্তর্গত শ্রীপুরে।

আদি সপ্তগ্রাম

ব্যাণ্ডেলের পরবর্তী রেলস্টেশন। এখানে উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট ভক্ত বৈষ্ণবদের নিকট অতীব আকর্ষণীয়। শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত মহাপ্রভুর পার্ষদ ছিলেন। বর্তমান ভবনটি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

আমনান

পোলবা-দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত আমনান নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত গ্রাম, জে এল নম্বর ১৬৫। আমনান পাউনান থেকে দেড় কিমি পূর্বে অবস্থিত, চুঁচুড়া থেকে সহজেই বাসে যাওয়া যায়। এখানে বসন্তচণ্ডী, ধর্মরাজ, পঞ্চানন্দ, সিদ্ধেশ্বরী কালী প্রভৃতি গ্রামদেবতার স্থান আছে। এখানকার রাধানাথ মন্দিরটি উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত। সমতল ছাদবিশিষ্ট দালান ধরনের মন্দির, সংযুক্ত বারান্দা, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ। নকশাকাটা পরট (parapet) যুক্ত ছাদ।

আরামবাগ

আরামবাগ হুগলী জেলার পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত মহকুমা ২২°০২′ এবং ২২°৩৬′ উত্তর অক্ষাংশে ও ৮৭°২২′ এবং ৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। আরামবাগের পূর্বসীমায় অবস্থিত দামোদর নদ হুগলী জেলার অপর দুই মহকুমা থেকে আরামবাগকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আরামবাগের উত্তরে বর্ধমান জেলার সদর ও কালনা মহকুমা, উত্তর পশ্চিমে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমা, দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর জেলার সদর ও ঘাটাল মহকুমা এবং দক্ষিণে হাওড়া জেলার সদর ও উলুবেড়িয়া মহকুমা। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে এই মহকুমা গঠিত হয়, তখন নাম ছিল জাহানাবাদ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে জাহানাবাদের নাম বদলে আরামবাগ রাখা হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আরামবাগ পুরসভা গঠিত হয়। আরামবাগের ইতিহাস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

দামোদর ছাড়া মুণ্ডেশ্বরী ও দ্বারকেশ্বর-রূপনারায়ণ আরামবাগের প্রধান নদী। পূর্বে কলকাতা থেকে বর্ধমান হয়ে ঘুরপথে আরামবাগ যেতে হত। অথবা দক্ষিণপূর্ব রেলের কোলাঘাট স্টেশনে নেমে বা হাওড়া ময়দান থেকে মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেলে চাঁপাডাঙায় নেমে খেয়া নৌকায় দামোদর ও মুণ্ডেশ্বরী পার হয়ে আরামবাগ যেতে হত। এখন নদীগুলিতে সেতু নির্মিত হওয়ার ফলে আরামবাগে যেতে কোন অসুবিধা নেই। হাওড়া থেকে রেলপথে তারকেশ্বরে এসে সেখান থেকে অনায়াসেই বাস যোগে আরামবাগে আসা যায়। এছাড়া চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর, শেওড়াফুলি, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর সব জায়গা থেকেই

সোজাসুজি আরামবাগ বাসে বা মোটরে যাওয়া যায়। আরামবাগ মহকুমার অভ্যন্তরেও রীতিমত বাস চলাচল করে, ফলে যে চারটি থানা নিয়ে আরামবাগ মহকুমা গঠিত—আরামবাগ, পুরশুড়া, খানাকুল ও গোঘাট—সেগুলিতেও সহজে যাতায়াত করা যায়।

আরামবাগ শহর ছাড়াও আরামবাগ থানার অন্তর্গত যে সকল গ্রামে পুরাকীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায় সেগুলির মধ্যে গৌরহাটি, বাসুদেবপুর, মায়াপুর, ডিহিবায়ড়া, হমীরবাটি, ভালিয়া, খেদাইল, পারুল, এলোমা, রামনগর, শ্রীরামপুর, মলয়পুর, কানপুর, সালেপুর, হাটবসন্তপুর, মাধবপুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনুরূপভাবে গোঘাট থানার অন্তর্গত বালি-দেওয়ানগঞ্জ, বদনগঞ্জ, করমানা, বাজুয়া, গড় মান্দারণ, সেলানপুর, শ্যামবাজার, মালঞ্চ, কৃষ্ণগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, উদয়রাজপুর, মেমানপুর, কয়াপাট, মামুদপুর, হাজিপুর, পাণ্ডুগ্রাম, কামারপুকুর, বেতড়া, ইদলবাটি, কোলাগাছিয়া প্রভৃতি স্থান পুরাকীর্তি সম্পদে সমৃদ্ধ। পুরশুড়া থানার অন্তর্গত পুরশুড়া, ভাঙ্গামোড়া, ডিহিবাতপুর, বাখরপুর, দেউলপাড়া, জঙ্গলপাড়া, শোঙালুক, সুন্দুরুষ, বৈকুণ্ঠপুর, রসুলপুর, হরিণাখালি ও ইছাপুর এবং খানাকুল থানার অন্তর্গত কৃষ্ণনগর, সেনহাট, বীরলোক, কুমারচক, কলিস্ব, রাজহাটি প্রভৃতি গ্রাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই সকল গ্রামের পুরাকীর্তির পরিচয় পৃথক পৃথকভাবে বর্ণানুক্রমিক তালিকায় প্রদত্ত হয়েছে। আরামবাগ শহরে একটি মসজিদ ছাড়া আর কোন প্রাচীন নিদর্শন বড় একটা পাওয়া যায় না। মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট, কক্ষও তিনটি। মধ্যের কক্ষটিতে খিলাননির্মিত প্রবেশপথ, পাশের দুই কক্ষের প্রবেশদ্বার ইটের জাফরির দ্বারা অবরুদ্ধ। উপরে প্রতিষ্ঠালিপি আছে কিন্তু অস্পষ্টতার জন্য তা পড়া যায় না।

আলা

সদর মহকুমার ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত সোমসপুর-১ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১০১। এখানকার লাহা বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জগদীশ্বর শিবমন্দির ও রাধাগোবিন্দের দোলমঞ্চ এখনও প্রাচীন কীর্তি হিসাবে বিরাজিত। আলা গ্রামে জগদীশ্বরের গাজন এবং রাধাগোবিন্দের দোল ও রাস অদ্যাপি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বোক্ত লাহাবংশ কর্তৃক দানপুকুর, সুখসাগর, মল্লিকপুকুর ও আলার দীঘি এই চারটি বিরাট পুষ্করিণী খনিত হয়। জগদীশ্বর শিবমন্দিরটি আটকোণা, একচূড়, রেখ ধরনের, নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক। দোলমঞ্চটি পঞ্চরত্ন, ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। পার্শ্ববর্তী যদুপুর গ্রামের (জে এল নম্বর ১০২) ওলাইচণ্ডীতলা স্থানীয় মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত।

আলিপুর

হরিপাল থানার অন্তর্গত গ্রাম, হরিপাল রেল স্টেশন থেকে ছয় কিমি দূরে হরিপাল-ধনিয়াখালি বাস রাস্তার উপর অবস্থিত। এখানে সিংহরায়দের প্রতিষ্ঠিত একটি আটচালা শিবমন্দির আছে। নির্মাণকাল ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটির বহির্দেশে মৃৎফলকের উপর উৎকীর্ণ দেবতা, মানুষ, পক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ বিদ্যমান। মন্দিরটির বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থা।

ইছাপুর

আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত। গোপীনগর থেকে ১ কিমি দূরবর্তী। এখানে সিংহরায় বংশ প্রতিষ্ঠিত উনবিংশ শতকে নির্মিত একটি আটচালা ও একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। আটচালা মন্দিরটি শিবমন্দির, পশ্চিমমুখী, মৃৎফলকের উপর বর্ণাঢ্য উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ সমন্বিত। এখানকার আটাবাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত মন্দিরটির আটচালার উপর একটি নবরত্ন শিখর উপস্থাপিত। মন্দিরটি ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত হয়। পাঁচবাড়ি অঞ্চলে একটি আটচালা শিবমন্দির ও একটি রক্ষাকালী মন্দির অবস্থিত। শেষোক্ত মন্দিরটি দালান ধরনের। আটাবাড়িতে একটি ঢালু ছাদ বিশিষ্ট দুর্গাদালান আছে, নির্মাণকাল উনিশ শতক, এটি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত হয়। পঞ্চরত্ন মন্দিরটি পরিত্যক্ত। এটিরও সম্মুখে মৃৎফলকের উপর অনুরূপ সজ্জা বর্তমান।

ইনসুরা

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত জামনা পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৪। এই গ্রামে প্রসন্নকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত কালীবাড়ি এবং গোমতীগিরি প্রতিষ্ঠিত আনন্দাশ্রম আছে। বৈঁচি-বৈদ্যপুর রাস্তা থেকে এক মাইল পশ্চিমে ধুসী নদীর উত্তর তীরে সুপ্রসিদ্ধ পীর আলীমন সাহেবের সমাধি আছে। ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহের প্রথম বৃহস্পতিবার তাঁর উরস্ উৎসব সম্পন্ন হয়। এছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার এখানে প্রচুর যাত্রীসমাগম হয়।

ইনাথনগর

ধনিয়াখালি থেকে তারকেশ্বর-চুঁচুড়া রাস্তায় অবস্থিত গ্রাম। এখানে একটি চারচালা বুড়োশিবের মন্দির আছে। নির্মাণকাল ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দ। বর্তমানে সংস্কৃত। এখানকার বিশালাক্ষী মন্দির ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাধাচরণ শীল কর্তৃক স্থাপিত। এই মন্দিরটি বাঁকানো কার্নিসযুক্ত, চারচালা। সামনের বারান্দাটি পরবর্তীকালে নির্মিত।

ইদলবাটি

গোঘাট থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বেঙ্গাই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৩৬। কামারপুকুর হয়ে ইদলবাটি যেতে হয়। এখানে ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি পরিত্যক্ত আটচালা মন্দির আছে। মন্দিরটি কোঙার বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটির সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ বর্তমান। দেবতা, রামায়ণের কাহিনী, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ এই সজ্জার বিষয়বস্তু।

ইলছোবা

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত ইলছোবা-দাসপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৪০। ইলছোবার দূরত্ব হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের খন্যান স্টেশন থেকে সাড়ে তিন কিমি। ইলছোবা বিখ্যাত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের জন্মস্থান। তিনি 'ইলছোবা' নামে একটি পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন। এখানে চারটি শিবমন্দির, একটি জোড়াশিব মন্দির এবং একটি বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। এগুলির মধ্যে একটি শিবমন্দির বারোচালা, এটি অষ্টাদশ শতকে বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার কর্তৃক নির্মিত। হুগলী জেলার অপর বারোচালা মন্দিরটি আছে সেনহাটে। ইলছোবার মন্দিরের চালাগুলি কাছাকাছি অবস্থিত। এই মন্দিরগাত্রে পশু ও উদ্ভিজ্জধর্মী কিছু 'টেরাকোটা' (terracotta) অলঙ্করণ আছে। ঘোষবংশ প্রতিষ্ঠিত একটি আটচালা শিবমন্দির ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এটিরও সম্মুখভাগে মৃৎফলকে দেবতা ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণের নিদর্শন আছে। বাকি মন্দিরগুলি দাস ও বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ কর্তৃক ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত। এগুলির মধ্যে একটি শিব ও বিষ্ণুমন্দির পঞ্চরত্ন, রেখ ধরনের খাঁজকাটা শিখরবিশিষ্ট। বাকিগুলি আটচালা, সকল মন্দিরেই 'টেরাকোটা' শিল্পের কিছু নিদর্শন আছে।

উত্তরপাড়া

হুগলী জেলার সর্বদক্ষিণে গঙ্গাতীরে অবস্থিত উত্তরপাড়া একটি সুন্দর ছোট শহর। পূর্ব রেলপথের হাওড়া-ব্যাণ্ডেল মেন লাইনের চতুর্থ রেল স্টেশন, হাওড়া থেকে দূরত্ব মাত্র ১১ কিমি। উত্তরপাড়া পৌরসভার সূচনা হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে, ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তা একটি সুনির্দিষ্ট আকার গ্রহণ করে। প্রায় শতবর্ষ পরে ১৯৬৪-তে কোতরং পৌরসভা উত্তরপাড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে উত্তরপাড়া খুবই উন্নত। উত্তরপাড়ার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেখানকার জমিদার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নাম জড়িয়ে আছে। জয়কৃষ্ণ

(১৮০৮-৮৮) ও তাঁর পিতা জগন্মোহন বৃটিশ কমিসারিয়েটে কাজ করতেন। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুর যুদ্ধের সময় (তখন জয়কৃষ্ণের বয়স মাত্র ১৬ বৎসর) তাঁরা যে বীরত্ব প্রদর্শন করেন তার স্বীকৃতিস্বরূপ বহু অর্থ পুরস্কার হিসাবে প্রাপ্ত হন। অতঃপর জয়কৃষ্ণ বর্ধমানের মহারাজের কাছ থেকে উত্তরপাড়া সহ হুগলী জেলার এক বিস্তৃত এলাকার পত্তনিদার হন। জয়কৃষ্ণের পুত্র প্যারীমোহনও উত্তরপাড়ার উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেন। জয়কৃষ্ণ সে আমলে জরাসন্ধ নামে পরিচিত ছিলেন। কেবল উত্তরপাড়া বা হুগলী জেলা নয়, বঙ্গদেশে এমন কোন প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান ছিল না যার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না।

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর গঙ্গাতীরে অবস্থিত উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫-ই এপ্রিল (বাংলা ১২৫৬ সালের ১লা বৈশাখ) প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালে এটিই ছিল ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। তখনই লক্ষাধিক টাকার পুস্তক এই গ্রন্থাগারের জন্য ক্রয় করা হয়েছিল। এই গ্রন্থাগারের ব্যয় নির্বাহের জন্য জয়কৃষ্ণ বাৎসরিক দু'হাজার টাকা উপস্বত্বের সম্পত্তি ও দুইশত টাকা সুদের কোম্পানীর কাগজ অর্পণ করেন। কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই গ্রন্থাগার ভবনের দোতলায় কিছুকাল বাস করেন। ভবনটি কলকাতার টাউন হলের ভঙ্গীতে নির্মিত। ভবনটি পূর্বমুখী, দ্বিতল, সোপানাবলীর উপর করিন্থীয় ধরনের থামযুক্ত বারান্দা, দ্বিতলে ঝোলানো বারান্দা। গঠনশৈলী ইউরোপীয়। এই গ্রন্থাগারটি সম্পর্কে দীনবন্ধু মিত্র লিখেছেনঃ "বীণাপাণি-মনোরম পুস্তক আলয়/শত শত শাস্ত্রমালা যথায় সঞ্চয়।" ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখে অনুষ্ঠিত উত্তরপাড়া নাগরিকদের একটি সভায় গৃহীত প্রস্তাবানুযায়ী জয়কৃষ্ণের নামে এই লাইব্রেরীর নূতন নামকরণ হয়। দ্বিতলের হলটিও জয়কৃষ্ণ হল নামে পরিচিত হয়।

উত্তরপাড়ার পুরাকীর্তির কয়েকটি বিশিষ্ট নিদর্শন হিসাবে কয়েকটি বিখ্যাত জমিদারবাড়ি ও প্রতিষ্ঠান ভবনের উল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজন। এখানকার পুরাতন পৌরসভা ভবনটি গ্র্যান্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত। দ্বিতল এই ভবনটির বারান্দার উপরাংশে সুদৃশ্য খড়খড়ির আবরণ। অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সাধারণ। নির্মাণকাল ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ। রাজমোহন রোডের উপর উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় পরিবারের পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িটি মধ্য-উনিশ শতকে নির্মিত। বর্তমানে ভবনটি অনাথ বালিকাদের আশ্রম হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভবনটি দ্বিতল, দক্ষিণমুখী, সম্মুখে থামওয়ালা বারান্দা, বারান্দার উপরাংশে খড়খড়ির আবরণ, সম্মুখের আলিসা ত্রিকোণাকৃতি কারুকার্যখচিত। রাজমোহন রোডে ওই একই জমিদার পরিবারের প্রবালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আবাস ভবনটিও মধ্য-উনিশ শতকে নির্মিত। বর্তমানে ভবনটিতে সমবায় শিক্ষা

কেন্দ্রের দপ্তর অবস্থিত। ভবনটি পূর্বমুখী, দ্বিতল, সম্মুখভাগের বারান্দা ডোরীয় ধরনের স্তম্ভের উপর গঠিত। ছাদ পরটযুক্ত। উত্তরপাড়ার সরকারী স্কুল ভবনটি আচার্য ধ্রুব পাল রোডের উপর অবস্থিত। এটিও আদিতে মুখোপাধ্যায়দের প্রতিষ্ঠিত। নির্মাণকাল ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রাসাদ, তাঁরই নামাঙ্কিত রাস্তার উপর অবস্থিত, বর্তমানে জেনারেল হাসপাতাল হিসাবে ব্যবহৃত, নির্মাণকাল ১৮৩০ থেকে ১৮৪০-এর মধ্যে। ওই একই রাস্তায় মুখোপাধ্যায়দের আরও একটি ভবন আছে যা বর্তমানে হাসপাতালের চিকিৎসকদের আবাস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তুলনায় ভবনটি অর্বাচীন, ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। রাজমোহন রোডে পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতল ভবনটির নির্মাণকাল মধ্য-উনিশ শতক। বর্তমানে ভবনটি দুস্থা মহিলাদের আশ্রম হিসাবে ব্যবহৃত। রামনিধি চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িটি তাঁরই নামাঙ্কিত রাস্তার উপরে অবস্থিত। নির্মাণকাল ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ। প্রখ্যাত বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই গৃহের বাসিন্দা ছিলেন। এই গৃহে বহু জাতীয় নেতা এবং মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মত আন্তর্জাতিক নেতাও যাতায়াত করতেন।

গঙ্গাতীরে গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের উপর পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রামনারায়ণ মল্লিক কর্তৃক ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত তারামন্দির নামে কথিত পাশাপাশি তিনটি মন্দির অবস্থিত, মাঝেরটি পঞ্চরত্ন এবং দুপাশের দুটি আটচালা। পঞ্চরত্ন মন্দিরটি সম্মুখভাগে মৃৎফলকে অলংকৃত, কৃষ্ণলীলা ও রামায়ণে বর্ণিত যুদ্ধাবলীর চিত্র সেখানে বর্তমান। গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত আরও দুটি জোড়া আটচালা শিবমন্দির আছে। নির্মাণকাল মধ্য-উনিশ শতক। প্রথম জোড়াটি পূর্বমুখী অলঙ্করণশূন্য। দ্বিতীয় জোড়াটি পশ্চিমমুখী, কিছুটা কারুকার্যময়, দৈর্ঘ্যে ১৬ এবং প্রস্থে ১৪ ফুট। একই রাস্তায় জৈনদের একটি পার্শ্বনাথ মন্দির আছে, নির্মাণকাল ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিতল ভবন, স্তম্ভযুক্ত বারান্দা। ছাদের কেন্দ্রীয় অংশ গম্বুজাকার। রামঘাটে রামতনু চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর ও কামেশ্বর মন্দিরও উত্তরপাড়ার পুরাকীর্তি প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মুক্তকেশীতলায় মুক্তকেশীমন্দির আনুমানিক ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণমুখী দালান ধরনের, সমতল ছাদ ও তিনদিকে বারান্দা বিশিষ্ট। সম্মুখের নাটমন্দির পরবর্তীকালে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

উত্তরপাড়া ও কোন্নগরের মধ্যবর্তী দুই বর্গমাইল স্থান কোতরং নামে পরিচিত যা ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরপাড়া পৌরসভার অধীনে আসে। কোতরং-এর অন্তর্গত ভদ্রকালীর রামসীতাঘাট স্ট্রীটে মধ্য-উনিশ শতকে শেওড়াফুলি রাজের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত দালান ধরনের রামবাড়িতে রাম ও

রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ আছে। রামসীতাঘাটের উপর ভদ্রকালী মন্দির ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, যদিও কার্যত মন্দিরটির নবীকরণ ঘটেছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। দালান ধরনের, তীক্ষ্ণাগ্র, গম্বুজযুক্ত ছাদ ও তিনদিকে বারান্দা বিশিষ্ট। এই মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ বিগ্রহ শেওড়াফুলিরাজ মনোহর রায় কর্তৃক প্রদত্ত। মন্দিরগাত্রে একটি পাথরে 'শ্রীশ্রীভদ্রকালীমাতা শেওড়াফুলিরাজ' এই কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে। এছাড়া ভদ্রকালীতে ধর্মঠাকুরের মন্দির ও মাণিকপীরের তলা আছে। শখেরবাজারে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে বাবুজান মোল্লা কর্তৃক নির্মিত একটি মসজিদ আছে। মসজিদটি আকারে ছোট। আয়তাকার প্রার্থনাকক্ষ, একগম্বুজী ছাদ, ছয়টি ছোট মিনার এবং সম্মুখে বারান্দাবিশিষ্ট। ভদ্রকালী থেকে কয়েকটি প্রস্তরমূর্তি আবিষ্কৃত হয়; এগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

উদয়পুর

আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানা, ব্লক ও খানাকুল ১ নং পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর-৮৫। খানাকুল থেকে রিকশায় যাওয়া যায়। এখানকার পুরাকীর্তিসমূহের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত তিনটি প্রথাগত আটচালা শিবমন্দির একটি কালীমন্দির ও রঘুনাথ মন্দির উল্লেখযোগ্য। শিবমন্দির তিনটির মধ্যে দুইটি তারিখযুক্ত, যথাক্রমে ১৮১৫ ও ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। জুনিয়র বেসিক স্কুলের নিকটস্থ মন্দিরটির প্রবেশদ্বারের দুদিকে ছাঁচে গড়া মনুষ্যমূর্তির অলঙ্করণ আছে। রঘুনাথ মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ। পঞ্চরত্ন এই মন্দিরটি দামোদর শেঠ কর্তৃক নির্মিত। কালীমন্দিরটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে প্রতিষ্ঠিত। মাদলাকার ছাদযুক্ত গর্ভগৃহ। স্তম্ভের উপর পলকাটা খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার। প্রবেশদ্বারের দু দিকে বদ্ধ খিলান।

উদয়রাজপুর

গোঘাট থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বালি পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ২০৭। এখানে একটি একরত্ন বা এক চূড়াবিশিষ্ট মন্দির আছে যা স্থানীয় স্কুলের নিকটে অবস্থিত। মন্দিরটি বিষ্ণুপুরী ধরনের। মন্দিরের অবতলিত ছাদের কেন্দ্রে গঠিত শিখরটি রেখ ধরনের আড়াআড়ি খাঁজকাটা। দৈর্ঘ্যে ১৭ ফুটের কিছু বেশি এবং প্রস্থে সাড়ে পনের ফুট। বহির্ভাগ চুনবালি দিয়ে ঢাকা। মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। এছাড়া এখানে দাঁ পরিবার প্রতিষ্ঠিত সমতল ছাদ বিশিষ্ট দালান ধরনের দামোদর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে কুড়ি ফুটের কিছু বেশি এবং প্রস্থে আঠারো ফুটের কিছু বেশি। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের কারুকর্ম বর্তমান।

উভিদপুর

খানাকুল থানার অন্তর্গত গ্রাম, খানাকুল থেকে রিকশায় যাওয়া যায়। এখানকার ঘন্টেশ্বর শিবমন্দির অষ্টাদশ শতকে নির্মিত, রেখ ধরনের সামনে চারচালা প্রবেশগৃহ। অন্নপূর্ণা ও ধর্মঠাকুরের মন্দিরদ্বয়ের উপরিভাগ মাদলাকৃতি। এছাড়া এখানে কালী, বিশালাক্ষী ও শীতলার মন্দির আছে। এগুলি সমতল ছাদবিশিষ্ট, দালান ধরনের। সবকটি মন্দিরেরই নির্মাণকাল উনিশ শতক। উভিদপুরে একটি পীরের আস্তানা আছে যেখানে বহু ভক্তের সমাগম হয়।

এলোমা

আরামবাগ থানা ও আরামবাগ ব্লকের অন্তর্গত মাধবপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। জে এল নম্বর ১৪৫। এখানে দুটি প্রায়-ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দির আছে। দুটিই প্রথাগত আটচালা, খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশপথ বিশিষ্ট এবং মৃৎফলকের উপর অলংকরণ যুক্ত। প্রথম মন্দিরটি বিশালাক্ষী মন্দির নামে পরিচিত। এটি স্থানীয় রায়বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। নির্মাণকাল ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। দ্বিতীয় মন্দিরটি বিষ্ণুমন্দির, নির্মাণকাল ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। উভয় মন্দিরই বর্তমানে পরিত্যক্ত। এলোমা গ্রামটি মায়াপুর বাস স্টপ থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

কলাছড়া

চণ্ডীতলা থানা ও ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম পায়রাগাছা ও বেণীপুরের পাশে অবস্থিত। এখানকার শিবমন্দির খুবই প্রাচীন। প্রথাগত আটচালা এই মন্দিরটির খুবই জীর্ণ দশা। কলাছড়ার অন্যান্য পুরাতন দেবস্থানের মধ্যে বিশালাক্ষী দেবী ও পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মন্দিরের নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

কলিম্ব

আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানা ও ব্লকের অন্তর্গত রামমোহন ১নং পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৩৪। পুরশুড়া হয়ে কলিম্ব যাওয়া সহজ। এখানকার পুরাকীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানীয় লাহা বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দুটি আটচালা শিবমন্দির, নির্মাণকাল যথাক্রমে ১৭৭৩ ও ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। দুটি মন্দিরেই 'টেরাকোটা' অলঙ্করণ আছে। প্রথমটিতে দেবতা, রামায়ণের কাহিনী, রাজদরবার প্রভৃতি, দ্বিতীয়টির বিষয়বস্তু কেবলই উদ্ভীজ্জধর্মী। দ্বিতীয়টির বর্তমানে ভগ্নদশা।

কয়াপাট

গোঘাট থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বদনগঞ্জ ফুলুই ২নং পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৪৫। আরামবাগ থেকে পাণ্ডুগ্রাম হয়ে কয়াপাটে

যেতে হয়। এখানে মণ্ডলবংশ প্রতিষ্ঠিত শ্রীধর মন্দির ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি নবরত্ন, পরিমাপ সাড়ে পনের বর্গফুট। খাঁজকাটা শিখর ও তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিশিষ্ট। মন্দিরের সম্মুখভাগের মৃৎফলকে শিল্পকর্ম বর্তমান। দেবতা, রাজদরবারের দৃশ্য, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ এই শিল্পকর্মের বিষয়বস্তু। কয়াপাটে আরও একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। এই মন্দিরটিরও তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার ও খাঁজকাটা শিখর বর্তমান। মন্দিরের সম্মুখভাগে মৃৎফলকের কারুকলা আছে।

কাঁকড়াকুলি

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত সোমসপুর-২ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৯৬। ধনিয়াখালি থেকে কাঁকড়াকুলির দূরত্ব আড়াই কিমি। দামোদরের একটি শাখা এই গ্রামের উপর দিয়ে গেছে। কাঁকড়াকুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দুটি মন্দির হচ্ছে চন্দ্রশেখর কর প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দন ও সীতারাম মন্দির। দুটি মন্দিরই ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, আটচালা, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ ও 'টেরাকোটা' অলঙ্করণ বিশিষ্ট। সীতারাম মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত, সীতারামের বিগ্রহ বর্তমানে লক্ষ্মীজনার্দন মন্দিরে রক্ষিত আছে। এই মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর হনুমানের ক্রিয়াকাণ্ডের বহু চিত্র ছিল। এখানে দত্ত পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এটিও আটচালা এবং সামান্য 'টেরাকোটা' অলঙ্করণযুক্ত। এছাড়া স্থানীয় সেন পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি দোলমঞ্চ কাঁকড়াকুলির মাঝেরপাড়ায় বিদ্যমান। স্তম্ভশ্রেণীর উপর দণ্ডায়মান এই দোলমঞ্চটির শিখরগুলি রেখধর্মী, খাঁজকাটা। এখানেও মৃৎফলকের উপর উৎকীর্ণ উদ্ভিজ্জধর্মী কিছু অলঙ্করণ আছে। এখানে কুণ্ডুদের প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দিরও আছে। উক্ত দোলমঞ্চটি ছাড়াও একটি আটকোণা রাসমঞ্চ মাঝেরপাড়ায় অবস্থিত। মাঝেরপাড়ায় আরও তিনটি আটচালা শিবমন্দির বর্তমান। একটির তারিখ ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ। সীতারাম মন্দিরটি করপাড়ায় অবস্থিত, আটচালা। দত্ত পরিবারের মন্দিরটি উত্তরপাড়ায় অবস্থিত। দক্ষিণপাড়ায় একটি পরিত্যক্ত রেখ ধরনের এক শিখরবিশিষ্ট মন্দির আছে।

কানপুর

আরামবাগ থানা ও ব্লকের অন্তর্গত মাধবপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত একটি গ্রাম, জে এল নম্বর ১২৪। গ্রামটি গৌরহাটির নিকটে অবস্থিত। এখানকার কণকেশ্বর শিবমন্দির খুবই বিখ্যাত এবং এই মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে শিবের গাজন ও কালু রায়ের মেলা হয় তাতে প্রচুর লোকসমাগম ঘটে।

কণকেশ্বর শিবমন্দিরটি উনিশ শতকে নির্মিত হলেও মন্দিরটির স্থাপত্যগত কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। এটি একটি একরত্ন বা এক শিখরবিশিষ্ট মন্দির। শিখরটি রেখ ধরনের, উপরাংশ গম্বুজসদৃশ। মন্দিরের গর্ভগৃহটির চারদিকে চওড়া বারান্দা। বারান্দার চারদিকে খিলানের সারি। বারান্দার ছাদ আটচালা বা চারচালা মন্দিরের ছাদের ন্যায় কিছুটা অবতলিত ও বক্র কার্নিশযুক্ত।

কানুড়

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত জামগ্রাম মণ্ডলাই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৩৩। এখানে কণকশিব নামক পুষ্করিণীর তীরে খননকালে একটি মন্দিরের নিদর্শন এবং তিনটি অভগ্ন ও একটি ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিগুলি একাদশ-দ্বাদশ শতকের। অভগ্ন মূর্তিত্রয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। ভগ্ন মূর্তিটি জামগ্রাম উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে রাখা আছে। কানুড় গ্রামে প্রসিদ্ধ বুড়ো পীরের সমাধি আছে।

কামারপুকুর

গোঘাট থানা ও ব্লকের অন্তর্গত কামারপুকুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৮২। হাওড়া থেকে দূরত্ব ৫৮ কিমি। কামারপুকুর হুগলী-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর জেলাগুলির সন্ধিস্থলে অবস্থিত। তারকেশ্বর থেকে খুবই সহজে যাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের জন্মভূমি হিসাবে কামারপুকুরের বিশেষ আকর্ষণ আছে এবং এখানে প্রত্যহ বহু লোক আসেন। এখানে অনেকগুলি মন্দির আছে তবে পুরাকীর্তির দিক থেকে এখানকার লাহা পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দামোদর বা বিষ্ণু মন্দির এবং যুগীদের শিবমন্দিরের কিছু গুরুত্ব আছে। উভয় মন্দিরই উনিশ শতকের শেষের দিকে নির্মিত। লাহাদের মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, পরিমাপ কুড়ি ফুট এবং সাড়ে ষোল ফুট এবং সামান্য কিছু মৃৎফলক অলঙ্করণযুক্ত। শিবমন্দিরটি পূর্বমুখী, প্রথাগত আটচালা এবং মৃৎফলকের অলঙ্করণ সমৃদ্ধ। দেবতা, রামায়ণের কাহিনী, পশু ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ এই চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু।

কালিকাপুর

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত গোপীনাথপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। এখানকার রাজরাজেশ্বর মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকে নির্মিত। এটি তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট আটচালা মন্দির। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের অলঙ্করণ বিদ্যমান।

কালিয়াগড়

ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনের জীরাট রেলস্টেশনে নেমে কালিয়াগড় যেতে হয়। এখানে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত মহাকাল ভৈরবের একটি আটচালা মন্দির আছে।

কুমারচক

খানাকুল থানা ও ব্লকের অন্তর্গত। এখানে পাত্র পরিবার কর্তৃক অষ্টাদশ শতকে নির্মিত একটি দোলমঞ্চ আছে। চারটি স্তম্ভের উপর গঠিত দোলমঞ্চটি আটচালা এবং 'টেরাকোটা' অলঙ্করণে অতীব সমৃদ্ধ। অনুরূপ আর একটি দোলমঞ্চ খানাকুল-কৃষ্ণনগরের রামমোহন রায় মেমোরিয়ালের পাশে বর্তমান।

কৃষ্ণগঞ্জ

গোঘাট থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বদনগঞ্জ-ফুলুই ১নং পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৫০। আরামবাগ থেকে পাণ্ডুগ্রাম (দূরত্ব ৬ কিমি) এবং সেখান থেকে কয়াপাট (দূরত্ব ৪ কিমি) হয়ে কৃষ্ণগঞ্জে যেতে হয়। কয়াপাট থেকে কৃষ্ণগঞ্জের দূরত্ব মাত্র ২ কিমি। এখানকার দামোদর মন্দিরটি ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, বর্তমানে পরিত্যক্ত। মন্দিরটি প্রথাগত আটচালা, দক্ষিণমুখী তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিশিষ্ট। মন্দিরের সম্মুখভাগে, খিলানগুলির উপরাংশে মৃৎফলকের কারুকার্য বিদ্যমান, যদিও পরিমাণের দিক থেকে বেশি নয়। মন্দিরটির পরিমাপ সাড়ে ষোল বর্গফুট।

কৃষ্ণনগর

জাঙ্গীপাড়া থানার অন্তর্গত গ্রাম, জাঙ্গীপাড়া থেকে রিকশায় যাওয়া যায়। এখানকার বাজারপাড়ায় ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি আটচালা শিবমন্দির এবং ভাঙ্গাদালান পাড়ায় ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি শিবমন্দির আছে।

কৃষ্ণপুর

পোলবা থানা ও পোলবা-দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত দাদপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ২৫। বেলমুড়ি রেলস্টেশন থেকে দূরত্ব চার কিমি। এখানে দুটি পরিত্যক্ত মন্দির আছে। একটি ঘোষবংশ প্রতিষ্ঠিত আটচালা মন্দির নির্মাণকাল ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২১ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১৮ ফুট ৯ ইঞ্চি। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট। দ্বিতীয় মন্দিরটি পঞ্চরত্ন, মধ্য উনিশ শতকে নির্মিত, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথবিশিষ্ট, শিখরগুলি রেখ ধরনের, খাঁজকাটা। উভয় মন্দিরগাত্রেই 'টেরাকোটা' অলঙ্করণ আছে।

রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতা, রাজদরবারের দৃশ্য, পশুপক্ষী ও পত্রপুষ্প এই অলঙ্করণের বিষয়বস্তু।

কৃষ্ণপুর

সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম, চুঁচুড়া-মগরা ব্লকের দেবানন্দপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১। এখানে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাট বর্তমান। রঘুনাথ মহাপ্রভুর কৃপাধন্য ছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভুও তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলেন। রঘুনাথ সপ্তগ্রামের শাসক রাজা হিরণ্যদাসের ভ্রাতা গোবর্ধনদাসের পুত্র ছিলেন। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্মোপলক্ষে গোবর্ধনদাস কৃষ্ণপুরে রাধাকৃষ্ণের একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দির বহুপূর্বেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই মন্দিরে যে সকল বিগ্রহ ছিল বলে কথিত বর্তমানে সেগুলি রঘুনাথদাসের শ্রীপাটে রক্ষিত আছে। রঘুনাথের শ্রীপাট মতিলাল শীলের পিতামহীর অর্থানুকূল্যে নূতন করে নির্মাণ করা হয় এবং পরবর্তীকালে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ কর্তৃক কিছুটা সংস্কৃত হয়। এখানে রঘুনাথের অন্যতম শিষ্য কমললোচন গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ গৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহ আছে। এছাড়া যে প্রস্তরময় বেদীর উপর বসে রঘুনাথ সাধনা করতেন সেটি এবং তাঁর ব্যবহৃত খড়ম এখানে রক্ষিত আছে। শ্রীপাট ছাড়া কৃষ্ণপুরে ১৭২০ শকাব্দ বা ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এক জোড়া জীর্ণ শিবমন্দির আছে।

কৈকালা

হরিপাল থানা ও ব্লকের অন্তর্গত কৈকালা নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৬। এখানে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে একটি দত্তাত্রেয় বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিটি বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। এটি পাল আমলের মূর্তি, খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকে নির্মিত। উচ্চতায় দুই ফুট দশ ইঞ্চি এবং প্রস্থে দেড় ফুট। এই মূর্তির দুপাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী দণ্ডায়মান। পশ্চাদপটে ব্রহ্মা ও শিবের দুটি ক্ষুদ্রাকার উপবিষ্ট মূর্তি খোদিত।

কোঁচমালী

হাওড়া-বর্ধমান মেল লাইনের পাণ্ডুয়া রেল স্টেশন থেকে কোঁচমালী যেতে হয়। এখানে উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত তিনটি শিবমন্দির আছে। একটি মাঝেরপাড়ায় দুটি পূর্বপাড়ায়। স্থানীয় মজুমদার বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরগুলির মধ্যে দুটি আটচালা ধরনের এবং একটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট দালান ধরনের। শেষোক্ত মন্দিরটি ধ্বংসপ্রায়। মাঝেরপাড়ায় উক্ত মজুমদার বংশ

প্রতিষ্ঠিত একটি চারচালা দোলমঞ্চ আছে। গ্রামটি পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বেরেলা-কোঁচমালী পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত।

কোটালপুর

জাঙ্গীপাড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত কোটালপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৬০। জাঙ্গীপাড়া হয়ে কোটালপুর যেতে হয়। এখানে বাকুলি বংশ প্রতিষ্ঠিত ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত বর্তমানে পরিত্যক্ত একটি আটচালা মন্দির এবং ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত রাজরাজেশ্বর শিবের মন্দির উল্লেখযোগ্য। এটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত। এই মন্দিরটিও আটচালা। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিশিষ্ট। উভয় মন্দিরগাত্রেই 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণ আছে। কোতরং উত্তরপাড়া দ্রষ্টব্য।

কোন্নগর

হাওড়া থেকে পাঁচটি রেলস্টেশন পার হলেই কোন্নগর যা রিষড়ার দক্ষিণে অবস্থিত এবং রিষড়ার মতই যা বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে (১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত) উল্লিখিত। এখানেও ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এখানে একটি ডক ও ছোট ধরনের জাহাজ নির্মাণের কারখানা ছিল। রাজা দিগম্বর মিত্র, ডঃ ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র প্রভৃতি স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ কোন্নগরে জন্মগ্রহণ করেন। কোন্নগরের উন্নতির জন্য শিবচন্দ্র দেবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য যিনি মধ্য-উনিশ শতকে কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। কোন্নগরের পুরাকীর্তি বলতে গঙ্গাতীরে অবস্থিত দ্বাদশ শিবমন্দিরকে বোঝায়। এই দ্বাদশ শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন কলিকাতা হাটখোলার দত্ত পরিবারের মদনমোহন দত্ত মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র হরসুন্দর দত্ত। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বাঁধাঘাটের দুদিকে ছয়টি করে আটচালা মন্দিরের শ্রেণী। নির্মাণকাল ১৭৪২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ। ঘাটের উপরস্থ চাঁদনির পূর্বভাগে একটি কৃষ্ণপ্রস্তরে মন্দির প্রতিষ্ঠার তারিখ উৎকীর্ণ আছে। এতদ্ব্যতীত কোন্নগরে ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি ছোট আটচালা শিবমন্দির আছে যার গায়ে উদ্ভিজ্জধর্মী কারুকার্য মৃৎফলকের উপর বিদ্যমান। সুবোধ পালিত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরও দুটি আটচালা শিবমন্দির ও একটি ডাকাত-কালী মন্দির কোন্নগরে বর্তমান। এগুলির নির্মাণকাল ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ।

কোলাগাছিয়া

গোঘাট থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বালি পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ২০৯। কোলাগাছিয়া আরামবাগ থেকে ১৪ কিমি দক্ষিণে অবস্থিত।

এখানে কয়েকটি মন্দির আছে যেগুলির মধ্যে ভুবনেশ্বর শিবমন্দিরটি আটচালা, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত। রঘুনাথ মন্দিরটি প্রাচীনতম। এটি দাসবংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, নির্মাণকাল ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দ। এটি একটি পঞ্চরত্ন মন্দির। তৃতীয় মন্দিরটি দামোদর মন্দির নামে কথিত, নবরত্ন, স্থানীয় দালাল বংশ কর্তৃক উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত, বর্তমানে পরিত্যক্ত। চতুর্থ ও পঞ্চম মন্দিরদ্বয় আটচালা, শ্রীধর ও রঘুনাথ মন্দির নামে পরিচিত, স্থানীয় দে ও রাণা বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। নির্মাণকাল যথাক্রমে ১৮১৯ ও ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দ। পাঁচটি মন্দিররেরই সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর কারুকার্য বর্তমান, বিষয়বস্তু দেবমূর্তি ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ।

খন্যান

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত ইটাচুনা-খন্যান পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১২৯। হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে তালাণ্ডুর পরেই খন্যান রেলস্টেশন। এই গ্রামের হাটতলায় সুপ্রসিদ্ধ পাঁচ পীরের সমাধি এবং পূর্বপাড়ায় অহেদবক্স মোল্লার সমাধি আছে।

খানাকুল-কৃষ্ণনগর

খানাকুল থানা, ব্লক ও ১নং পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। খানাকুলের জে এল নম্বর ৪৫ এবং কৃষ্ণনগরের ৩৭। খানাকুলের ঘন্টেশ্বর শিবমন্দিরের খ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত। কাণা দারকেশ্বর বা কাণা নদীর ধারে এই মন্দিরটি অবস্থিত। মূল মন্দিরটি একশিখর বিশিষ্ট রেখ দেউল ধরনের। সামনে চারচালা নাটমন্দির। ঘন্টেশ্বরের বিশাল লিঙ্গমূর্তি ছাড়াও এই মন্দিরে কালভৈরবের মূর্তি আছে যাঁর সম্মানে মাঘ মাসের ভীম-একাদশীতে এবং শিবরাত্রি উপলক্ষে দুটি বৃহৎ মেলা বসে। মন্দিরের সম্মুখভাগে নাটমন্দির এবং নহবৎখানা ছাড়াও বাম দিকে আরও কয়েকটি দেবালয় আছে যেগুলিতে কালী, বিশালাক্ষী, অন্নপূর্ণা, ষষ্ঠী, গৌর-নিতাই, **ধর্মঠাকুর** প্রভৃতি পূজিত হন। সব মিলিয়ে ঘন্টেশ্বর এলাকাটি তীর্থস্থানের মত যে কারণে তা **গুপ্তকাশী** নামেও পরিচিত। ঘন্টেশ্বর লিঙ্গের কথা তন্ত্রে উল্লিখিত আছে। বর্তমান মন্দিরটির নির্মাণের সূচনা করেন উভিদপুরের মটুক কারক। কানাইলাল দে এটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। কৃষ্ণনগরে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত কয়েকটি মন্দির আছে। সর্বপ্রাচীন নিদর্শন হিসাবে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি প্রথাগত আটচালা শিবমন্দিরের কথা উল্লেখ করা যায়। অনুরূপ আরও চারটি শিবমন্দির এখানকার ঘোষপাড়ায় অবস্থিত যেগুলি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নির্মিত। অষ্টাদশ শতকে স্থানীয় চৌধুরী বংশ কর্তৃক নির্মিত রাধাবল্লভ মন্দিরটি একরত্ন বা একটি শিখর

বিশিষ্ট। শিখরটি চারচালা, সামান্য অবতলিত বর্গাকার কক্ষের উপর সংস্থাপিত। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার। পরিমাপ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৭ ফুট এবং প্রস্থে ৪৯ ফুট। পূর্বমুখী এই মন্দিরটির সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ বর্তমান। অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ মন্দির রীতিমত ঐতিহ্যপূর্ণ। অভিরাম মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন যিনি দ্বাদশ গোপালের প্রথম গোপাল হিসাবে পরিচিত। কষ্টিপাথরের উপর খোদিত গোপীনাথের মূর্তি তিনি একটি খড়ের ঘরে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নসীরাম সিংহ তার উপর একটি নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরটি বর্তমান গোপীনাথ মন্দিরের সংলগ্ন এবং এখন ঝুলনমঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত। বর্তমান গোপীনাথ মন্দিরটি ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। একরত্ন মন্দির, রেখধর্মী শিখর, বাঁকানো কার্নিস, পলকাটা খিলানের প্রবেশদ্বার। উত্তরে, পূর্বে ও দক্ষিণে চওড়া বারান্দা নাটমন্দিরের প্রয়োজন সাধন করে। এই বারান্দা ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুর ও হুগলী জেলার ধীবরমণ্ডলী কর্তৃক নির্মিত এবং ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁদের বংশধরগণ কর্তৃক সংস্কৃত। এছাড়া সমতল ছাদবিশিষ্ট একটি কালীমন্দির ও একটি নারায়ণ মন্দির কৃষ্ণনগরে অবস্থিত। রামমোহন রায় মেমোরিয়াল হলের পিছনে চারটি স্তম্ভের উপর নির্মিত একটি আটচালা দোলমঞ্চ আছে, নির্মাণকাল ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দ।

খেদাইল

আরামবাগ থানার অন্তর্গত গ্রাম, পুরশুড়া থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে নন্দীবংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দামোদর মন্দির পুরাকীর্তির দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই মন্দিরটি প্রথাগত আটচালা। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ। বিষয়বস্তুর মধ্যে কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতার মূর্তি, রামায়ণের কাহিনী, রাজদরবারের দৃশ্য, পশুপক্ষী ও পত্রপুষ্পের সমাহার উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী, পরিমাপ দৈর্ঘ্যে প্রায় আঠারো ফুট এবং প্রস্থে পনের ফুটের সামান্য বেশি।

ক্ষীরকুণ্ডী

পাণ্ডুয়া থানা ও পাণ্ডুয়া ব্লকের ক্ষীরকুণ্ডী নমাজগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি গ্রাম যেখানে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণ যুক্ত কয়েকটি মন্দির আছে। (জে এল নং ১০১)। এই সকল মন্দিরের মধ্যে স্থানীয় প্রাচীন পাল পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধর জিউর নবরত্ন মন্দির (নির্মাণকাল ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ, একটি খিলাননির্মিত পরটসহ সমতল ছাদ বিশিষ্ট ঠাকুরদালান

(নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ অথবা উনিশ শতকের প্রথম ভাগ) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মুখোপাধ্যায় পরিবারের দুটি আটচালা শিবমন্দির এবং বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের একটি আটচালা শিবমন্দির এখনে বর্তমান। এগুলির নির্মাণকাল উনিশ শতক। সকল মন্দিরেই অল্পবিস্তর 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণ আছে। এখানককার পীর হাফেজ সাদেমানী সাহেবের সমাধিও উল্লেখযোগ্য। মন্দিরগুলি বক্র কার্নিস এবং একক প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট। ক্ষীরকুণ্ডী পাণ্ডুয়া রেলস্টেশন থেকে অল্প দূরবর্তী।

গড় মান্দারণ

গোঘাট থানা ও ব্লকের অন্তর্গত মান্দারণ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল, নম্বর ৯২। আরামবাগ শহর থেকে ১১ কিমি পশ্চিম-দক্ষিণপশ্চিমে গড় মান্দারণ অবস্থিত। এখানে দুইটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে। দ্বিতীয় গড়টি দামোদর নদের পশ্চিম তীরে অবস্থিত এবং ভিতরগড় নামে পরিচিত। মান্দারণের প্রাচীন নাম অপর-মন্দার। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে এই অপর-মন্দারকে রাজা লক্ষ্মীশূরের রাজধানী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। উড়িষ্যার গঙ্গবংশীয় রাজা অনন্তবর্মা চোড়গঙ্গ মন্দার রাজ্যের রাজধানী আরম্যনগরী অধিকার করেছিলেন। সম্ভবত এই আরম্য থেকেই আরামবাগ নামটির সৃষ্টি হয়েছে। আইন-ই-আকবরীর সাক্ষ্য অনুযায়ী জানা যায় যে মুঘল আমলে মাদারুণ বা মান্দারণ একটি সরকার হিসাবে পরিচিত ছিল। গ্যাস্টালডি এবং ডে বারোসের মানচিত্রে মান্দারণের উল্লেখ আছে। বর্তমানে মান্দারণের গড়ের উত্তর দিকে পনের-কুড়ি ফুট উঁচু বড় বড় স্তূপ দেখা যায়। গড় এলাকার মধ্যে যে ধ্বংসস্তূপ এখনও বিদ্যমান আছে তার মধ্যাঞ্চলের উচ্চতা চল্লিশ ফুটের মত। এই স্তূপের চারদিকের নিম্নাংশ মাকড়া দিয়ে এবং উপরাংশ ইট দিয়ে নির্মিত ছিল। এর উপর ইসমাইল গাজীর দ্বিস্তরবিশিষ্ট সমাধি বর্তমান। এটি বড় আস্তানা নামে পরিচিত। নদীসন্নিকটে অন্য একটি ঢিবির উপর আর একটি সমাধি আছে যা ছোট আস্তানা নামে পরিচিত। এই গড় মান্দারণ দুর্গের অবশেষ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাশক্তিকে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। যে শৈলেশ্বরের মন্দিরে জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্তমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, সেই শৈলেশ্বরের অবস্থিতি পার্শ্ববর্তী কাঁঠালী গ্রামে। জনশ্রুতি অনুযায়ী এই দুর্গ সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজীর নির্মিত। কিন্তু কোন কারণে সুলতান তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করেন। কিন্তু যেহেতু ইসমাইল গাজী অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন, সেইহেতু তাঁর ছিন্নমুণ্ড গৌড়ে গিয়ে সমাধিস্থ হয় এবং অবশিষ্ট দেহ চলে আসে গড় মান্দারণে। অন্য এক কাহিনী

অনুযায়ী ওই ছিন্নমুণ্ড চলে যায় রংপুর জেলার কাঁটাদুয়ারে। কথিত আছে ইসমাইল গাজীর সমাধিটি তৈরি করেন শোভা সিংহ তাঁর বর্ধমান বিজয়ের স্মারক হিসাবে। মান্দারণের দক্ষিণ-পূর্বে করমানা (পূর্ব নাম দীননাথ) গ্রামে দুইটি তোরণ দৃষ্ট হয়। এগুলির গায়ে পারসিক ভাষায় রচিত দুইটি লেখ আছে। পূর্বে তোরণ দুইটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল। উত্তর দিকের তোরণটি সরাই নামে পরিচিত যা মুতাসীন-উল-মুল্ক (সুজাউদ্দীন) কর্তৃক ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দক্ষিণ দিকের তোরণটি মুবারক মঞ্জিল নামে পরিচিত এবং নির্মাণকাল ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দ। তোরণ দুইটি 'হাতীগলা দরজা' নামে পরিচিত, এবং যে স্থানে ওই দুইটি তোরণের অবস্থিতি তার নাম সানবাঁধি।

গরালগাছা

চণ্ডীতলা ব্লক ও থানার অন্তর্গত গরালগাছা নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত গ্রাম, জে এল নম্বর ৯০। এখানে দ্বারিকানাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত চারটি আটচালা শিবমন্দির আছে, দুটি সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত তাঁর বাগানবাড়িতে এবং দুটি তাঁর প্রাসাদসদৃশ বাড়ির সম্মুখে।

গুপ্তিপাড়া

সদর মহকুমার বলাগড় ব্লক ও বলাগড় থানার অধীন হুগলী জেলার উত্তরপূর্বের শেষ প্রান্তে অবস্থিত সুবিখ্যাত গ্রাম (গুপ্তিপাড়া ২নং অঞ্চল পঞ্চায়েতের অন্তর্ভুক্ত, জে এল নম্বর ৯)। ব্যাণ্ডেল থেকে ৩৫ কিমি উত্তরে বারহারওয়া লুপ লাইনে গুপ্তিপাড়া রেলস্টেশন। চুঁচুড়া থেকে বাসেও গুপ্তিপাড়া যাওয়া যায়। ষোড়শ শতক থেকেই গুপ্তিপাড়ায় ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের বসতি গড়ে ওঠে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে (রচনাকাল আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ) ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত গুপ্তিপাড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে গুপ্তিপাড়া সংস্কৃতচর্চার, বিশেষ করে ন্যায়শাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র চর্চার, খুবই বড় কেন্দ্র ছিল। গুপ্তিপাড়ার বহু পণ্ডিত একদা ভারতজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দক্ষিণ ভারত থেকে আগত জনৈক সত্যদেব সরস্বতী গুপ্তিপাড়ায় একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি শৈব দশনামী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁর শিষ্য বিশ্বেশ্বর রায় নিজের সকল সম্পত্তি এই মঠকে উৎসর্গ করেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে এই মঠ দশনামী শৈব সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত হলেও এখানকার অধিষ্ঠিত দেবতা হচ্ছেন বৃন্দাবনচন্দ্র, অর্থাৎ বিষ্ণু বা কৃষ্ণ। গুপ্তিপাড়ার মঠ তারকেশ্বরের শৈব মঠের অধীন এবং এখানকার মহন্ত

তারকেশ্বর মণ্ডলীর একজন সদস্য। কথিত আছে সত্যদেব সরস্বতী শান্তিপুরের এক ভক্ত গৃহস্থের বাড়ি থেকে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে এনে গুপ্তিপাড়ার নিকট কৃষ্ণবাটি নামক বিজন অরণ্যমধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই মূর্তিকে স্থানান্তরিত করা হয়। কৃষ্ণবাটি গ্রামটি আজও বর্তমান (জে এল নং ৮)। গুপ্তিপাড়া মঠের পরিচালনায় বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। এরূপ উচ্চ রথ বঙ্গদেশে অল্পই আছে এবং একমাত্র পুরী ব্যতীত আর কোন রথ এত দীর্ঘপথ অতিক্রম করে না। উল্টোরথের আগের দিনে ভাণ্ডারালুট নামক একটি অনুষ্ঠান হয়।

প্রাচীরবেষ্টিত বৃহদায়তন চতুষ্কোণ পরিসরের মধ্যে সাড়ে পাঁচফুট উচ্চ ভিত্তির উপর উত্তরদিকে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির, পশ্চিমে কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দির ও পূর্বদিকে রামচন্দ্রের মন্দির অবস্থিত। বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের অনতিদূরে ভগ্ন এবং পরিত্যক্ত চৈতন্যমন্দির বর্তমান। জোড়াবাংলা ধরনের এই মন্দিরটি সম্ভবত গুপ্তিপাড়ার প্রাচীনতম মন্দির। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের কাষ্ঠনির্মিত বিগ্রহ সমন্বিত এই মন্দির বিশ্বেশ্বর রায় কর্তৃক সম্রাট আকবরের আমলে নির্মিত হয় এবং সেই হিসাবে এই মন্দিরের নির্মাণকাল ষোড়শ শতকের শেষের দিক অথবা সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিক। এই মন্দিরগাত্রের কারুকার্য অত আগের বলেই খুব পরিচ্ছন্ন নয়। কিন্তু প্রথম যুগের পোড়ামাটির চিত্র কেমন হত তা এই মন্দির দেখে বুঝতে পারা যায়। পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ২৩ ফুট, প্রস্থে ২২ ফুট।

কৃষ্ণচন্দ্রের মন্দিরটি আটচালা, নবাব আলিবর্দী খাঁনের আমলে ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ বৃন্দাবনচন্দ্র মঠের নবম দণ্ডী মহন্ত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি ঢালু ছাদ ও বাঁকানো কার্নিসযুক্ত। গর্ভগৃহের প্রবেশদ্বারের খিলানে ইসলামীয় স্থাপত্যরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। বৃত্তাংশের অনুরূপ খিলানের বৃহত্তর পরিধির মধ্যে প্রবেশদ্বারের খিলান নিহিত। সামনে বারান্দা, তিনটি পত্রাকার খিলানের প্রবেশপথ। কারুকার্যময় খিলানগুলি স্তরবিশিষ্ট রেখাঙ্কিত স্তম্ভের উপর গঠিত। বারান্দার দক্ষিণে ও বামে দুটি প্রকোষ্ঠ। বারান্দার ছাদ গর্ভগৃহের ছাদের ন্যায় অর্ধগোলাকৃতি। ভিতরের ছাদ অবতলিত। সামান্য কিছু মৃৎফলকে কারুকার্য বর্তমান। পরিমাণ দৈর্ঘ্যে ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি, প্রস্থে ৩৯ ফুট ৯ ইঞ্চি।

রামচন্দ্রের শিখরবিশিষ্ট মন্দির উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দিরের সামনে ও দক্ষিণের দেওয়ালে এবং অষ্টকোণ শিখরের সর্বাঙ্গে উৎকৃষ্ট পোড়ামাটির অলঙ্করণের যে বিপুল সমাবেশ তা অন্যত্র দুর্লভ। এই মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে শেওড়াফুলির রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় কর্তৃক নির্মিত। একরত্ন এই মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। অষ্টকোণ রত্ন বা শিখরটি চারচালা ছাদের

উপর স্থাপিত। তিনটি খিলান দ্বারা গঠিত বহির্দেশ। বারান্দার প্রবেশদ্বারের তিনটি খিলান স্তরবিশিষ্ট রেখাঙ্কিত স্তম্ভের উপর গঠিত। বারান্দার ছাদ অর্ধমাদলাকৃতি, গর্ভগৃহের ছাদ অর্ধগোলাকৃতি। মন্দিরের ভিতরের বিগ্রহ রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের। সকল মূর্তিই কাষ্ঠনির্মিত। মন্দিরের গায়ে মৃৎফলকের উপর অঙ্কিত আছে রাধাশ্যামের যুগল মূর্তি, গরুড়বাহনবিষ্ণু, রাবণের যুদ্ধযাত্রা প্রভৃতি। মন্দিরের প্রবেশপথের উপরে তিনটি খিলানের উপর প্রার্থনার ভঙ্গীতে যুক্তকরে অধিষ্ঠিত অজস্র গোপিনী মূর্তি। দেওয়ালের উপরের দিকে পরিচ্ছন্ন ও বলিষ্ঠ ভাস্কর্যের দ্বারা রামায়ণের যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত। নিচের দিকে লতাপাতা ও নকশা করা ফ্রেমের মধ্যে সাধারণ নরনারীর নানা ভঙ্গির চিত্র দেখা যায়। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৪১ ফুট ২ ইঞ্চি প্রস্থে ৩৮ ফুট ৭ ইঞ্চি।

ষাট ফুট উচ্চ বৃহদায়তন বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে নয়নচাঁদ মল্লিক কর্তৃক নির্মিত (১৮১০ খ্রীঃ)। মন্দিরটি আটচালা, দক্ষিণমুখী, বাঁকানো কার্নিসযুক্ত। গর্ভগৃহ ও বারান্দার ছাদ অর্ধগোলাকৃতি। প্রবেশদ্বারের খিলানে ইসলামী স্থাপত্যরীতির প্রভাব দেখা যায়। বহু পার্শ্ববিশিষ্ট এবং প্রাচীরগাত্র থেকে আংশিক প্রলম্বিত চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর বড় খিলান। বারান্দায় প্রবেশের তিনটি খিলান চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর বেষ্টনীযুক্ত গোলাকার স্তম্ভের দ্বারা আলম্বিত। বাইরে সামান্য পোড়ামাটির কাজ। ভিতরের বারান্দা ও গর্ভগৃহের দেওয়ালে রঙিন চিত্রসম্ভার। কিছু চিত্র সারা দেওয়ালব্যাপী। অন্যান্য চিত্র বর্গাকার প্যানেলে বিভক্ত। চিত্রগুলি রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মীসরস্বতী ও গোপী সংক্রান্ত। বৃন্দাবনচন্দ্র ও শ্রীরাধার মূর্তি ছাড়াও সুভদ্রা ও বলরামের মূর্তি এই মন্দিরে বর্তমান। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৪৩ ফুট ৬ ইঞ্চি, প্রস্থে ৩৯ ফুট ৪ ইঞ্চি। অনেকটা অংশই চুনবালির আস্তরণে ঢাকা।

গরুটি

চাঁপদানী ও ভদ্রেশ্বরের মধ্যে অবস্থিত গরুটি বা গৌরহাটি গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অতি ক্ষুদ্র একটি পাড়া যেখানে চন্দননগরের ফরাসী শাসকদের একটি ‘পকেট’ ছিল। রেনেলের মানচিত্র ও জোসেফের সার্ভে মানচিত্রে স্থানটিকে ফ্রেঞ্চ গার্ডেন বলে উল্লেখ করা হয়। স্থানীয় অপর একটি নাম ফরাসগঞ্জ বহুদিন হারিয়ে গেছে। এখানে দুপ্লের একটি বাগানবাড়ি ছিল যেখানে ফরাসীদের শত্রু মিত্র সকল ইউরোপীয় আনন্দ করতে আসতেন, এমনকি লর্ড ক্লাইভও কয়েকবার এসেছিলেন। রেভারেণ্ড ড্যানিয়েল কুরি এই বাগানবাড়িটিকে ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ ইউরোপীয় ধরনের ভবন বলে উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক মার্শমান এই ভবনটির জীর্ণদশা দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন। পরে

ফরাসী গভর্নর শেভালিয়ে একবার এই ভবনটির সংস্কার করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দেও এই বাগানবাড়িটির অস্তিত্বের কথা যদুনাথ সর্বাধিকারীর ভ্রমণ কাহিনী থেকে পাওয়া যায়। গরুটিতে ফরাসীদের একটি নাট্যশালাও ছিল যেটি ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে ভেঙ্গে ফেলা হয়। কবিওয়ালা অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী গরুটিতে বাস করতেন। পরবর্তীকালে ইংরাজরা এখানে একটি দুর্গ তৈরি করে। সেটিও বিলুপ্ত হয়েছে।

গুড়বাড়ি

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত একই নামের পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৫। গুড়াপ স্টেশন থেকে বাসে মৌবেশে নেমে গুড়বাড়ি যেতে হয়। এখানকার রায়চৌধুরীরা জমিদার বংশ। এই বংশের নিধিরাম রায় সম্রাট আকবরের নিকট থেকে চৌধুরী খেতাব পান। এঁরা বীরভূমের কেন্দুবিল্ব গ্রামের নিকট সেনপাহাড়ী গ্রাম থেকে এখানে বসতি করেন। এই বংশের প্রীতিরাম রায়চৌধুরী ১৭১১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে রাধাগোবিন্দের ঠাকুরদালান নির্মাণ করেন। চতুষ্কোণ পাদপীঠের উপর ছয়টি জোড়া স্তম্ভের উপর গঠিত খিলান শোভিত এই ঠাকুরদালানটি এখানকার একটি দর্শনীয় বিষয়। দালানবাড়ির বাইরে আটচালা শিবমন্দির, একটি বড় অপরটি ছোট। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর কারুকার্য বর্তমান। পাশেই রাধাগোবিন্দের দোলমঞ্চ, অষ্টকোণ, আটটি খিলান ও আটটি শিখরযুক্ত। রায়চৌধুরীদের বড় বাড়িতে রামনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দের এবং ছোট বাড়িতে ইন্দ্রনারায়ণের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির আছে। শিবমন্দির দুটি আটচালা এবং লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির দালান ধরনের। তিনটি মন্দিরেরই নির্মাণকাল উনিশ শতক।

গুড়াপ

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত গুড়াপ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। জে এ- নম্বর ১২৪। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে গুড়াপ রেলস্টেশন অবস্থিত। এখানকার বিখ্যাত নন্দদুলাল মন্দির রামদেব নাগ কর্তৃক ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি প্রথাগত আটচালা, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার এবং বর্ণাঢ্য 'টেরাকোটা' অলঙ্করণ বিশিষ্ট এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত। এই মন্দির সংলগ্ন রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, নাটমন্দির এবং গোপেশ্বর শিবমন্দির অদ্যাপি বিরাজিত। নন্দদুলালের বিগ্রহ কালো কষ্টিপাথরে নির্মিত এবং রাধারানীর বিগ্রহ অষ্টধাতুতে গড়া। দোলমঞ্চটিও অষ্টাদশ শতকে নির্মিত, কৌণিক শিখরগুলি রেখ ধরনের এবং মৃৎফলকের উপর কারুকার্য বিশিষ্ট, নাটমন্দিরটি স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা রচিত এবং পরবর্তীকালে

সংযোজিত। নাগদের প্রতিষ্ঠিত দুটি আটচালা শিবমন্দির উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত। গোপেশ্বর শিবমন্দিরটি ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। মুখোপাধ্যায় বংশ প্রতিষ্ঠিত একটি ধ্বংসোন্মুখ নবরত্ন মন্দির ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এছাড়া আরও দুটি পঞ্চরত্ন মন্দির গুড়াপে আছে, যেগুলি প্রাগুক্ত নাগ পরিবার কর্তৃক ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত। সবকটি মন্দিরেই অল্পবিস্তর 'টেরাকোটা'র কাজ আছে। গুড়াপের পুরাকীর্তি সমূহ প্রধানতঃ জোড়ামন্দিরতলা, মাঝের পাড়া ও জয়চণ্ডীতলায় অবস্থিত। গোপীনাথ মন্দিরটি মাদলাকৃতি ছাদ ও দুইটি বারান্দাযুক্ত। গুড়াপের নিকটবর্তী শঙ্করপুরের গৌড়েশ্বর শিবমন্দিরটি আটচালা, নির্মাণকাল উনিশ শতক।

গোপালপুর

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত খাজুরদহ মেলকী পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৬৫। গুড়াপ থেকে ভাস্তারা হয়ে গোপালপুর যেতে হয়। এখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে স্থানীয় ঘোষবংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীধরমন্দির 'টেরাকোটা' অলঙ্করণের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। মন্দিরটি পঞ্চরত্ন।

গোপীনগর

সদর মহকুমার অন্তর্গত ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের গোপীনাথপুর ১ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৪৩। এই গ্রামের দুটি অংশ—ইছাপুর ও মল্লিকপাড়া। গ্রামের নাম এখানকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি গোপীনাথ সিংহচৌধুরীর নামে হয়েছে। এই সিংহচৌধুরীদের গড়বেষ্টিত ১০০ বিঘা জমির উপর বিরাট অট্টালিকা বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সিংহচৌধুরী বংশের পঞ্চরত্ন শিবমন্দিরটিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। গোপীনগরের রামনাথ শিবের মন্দিরটিও বিখ্যাত। এই মন্দিরের বিগ্রহ, বিরাট গৌরীপট্ট ও শিবলিঙ্গ, রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্তৃক অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। আঁটপুরের কৃষ্ণরাম মিত্র এর উপর নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করে দেন। মন্দিরগাত্রে একদা প্রচুর 'টেরাকোটা' অলঙ্করণ ছিল, এখন সামান্যই অবশিষ্ট আছে। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি সংস্কারের সময় অনেকগুলি চিত্রাবলীসহ মৃৎফলক চুনবালি দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। গোপীনগরের গ্রাম্য দেবী বিশালাক্ষী বারোয়ারীতলায় পূজিতা হন। তাঁর পুরাতন মন্দিরটি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কার করা হয়েছে। গোপীনগরের দ্বাদশ শিবমন্দির ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে রূপনারায়ণ রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। দুদিকে দুটি করে আড়াআড়িভাবে চারটি এবং মধ্যে আটটি আটচালা ধরনের মন্দির। দরজার চৌকাঠগুলি কালো পাথরের দ্বারা নির্মিত। একটি উৎকীর্ণ লেখে এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাতা রূপনারায়ণ রায়ের বংশপরিচয়,

নির্মাণের তারিখ এবং স্থপতি নিমাইচাঁদ মিস্ত্রির নাম উল্লিখিত আছে। এছাড়া অষ্টাদশ শতকে নির্মিত দুটি শিবমন্দির গোপীনগরে অবস্থিত, একটি আটচালা, অপরটি রেখ ধরনের এক শিখর বিশিষ্ট। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি আটচালা দোলমঞ্চ দ্বাদশমন্দিরতলায় বর্তমান। মল্লিকপাড়ায় একটি দুর্গাদালান আছে, নির্মাণকাল উনিশ শতক।

গোবিন্দপুর (পূর্ব)

জাঙ্গীপাড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত কোতলপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে. এল. নম্বর ৬২। জাঙ্গীপাড়া থেকে প্রসাদপুর হয়ে গোবিন্দপুরে যেতে হয়।এখানে স্থানীয় পালবংশ কর্তৃক ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি আটচালা চণ্ডীমন্দির আছে। পুরাতন হলেও মন্দিরটির অবস্থা বেশ ভাল। সম্মুখভাগে বর্ণাঢ্য 'টেরাকোটা'র কাজ আছে। রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতা ও রাজদরবারের দৃশ্য, পশু ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ কারুকার্যময় মৃৎফলকের বিষয়বস্তু। মন্দিরটি শ্রীধর মন্দির নামেও পরিচিত, খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট।

গোস্বামী-মালিপাড়া

দাদপুর থানা ও পোলবা-দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত গোস্বামী-মালিপাড়া একই নামের পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে. এল. নম্বর ১১৬। চুঁচুড়ার ১৫ কিমি পশ্চিমে গোস্বামী-মালিপাড়া। পূর্বে এখানে মালীদের পল্লী ছিল, পরে চৈতন্য অনুগামী গোস্বামীগণ এই গ্রামকে তাঁদের প্রচারের কেন্দ্র করায় গোস্বামী-মালিপাড়া নামটির উদ্ভব হয়। এখানকার মদনগোপাল ও রাধাকান্ত মন্দির বাংলার প্রাচীন বৈষ্ণব মন্দিরগুলির অন্যতম। শ্রীপাদ বল্লভ গোস্বামী মদনগোপালের আটচালা মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরে রাধামদনগোপাল যুগ্মমূর্তি ছাড়াও গোস্বামী-মালিপাড়ার প্রতিষ্ঠাতা শ্রীচৈতন্য পরিকর খঞ্জ ভগবান আচার্য (যিনি ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন) কর্তৃক পূজিত রাধাবল্লভ ও প্রিয়াজীর যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরের মধ্যে তিনশত বৎসরের পুরাতন একটি পাল্কী আছে। এই পাল্কী করে দুই যুগলমূর্তি রাসের সময় রাসমঞ্চে এবং রথযাত্রার সময় রথে আরোহণ করার জন্য বাহিত হয়। মন্দির ও নাটমন্দির নিয়মিত সংস্কৃত হয়। মন্দিরের পাশে বহিরাগত বৈষ্ণবদের থাকার ঘর আছে। রাধাকান্ত মন্দিরটি নির্মাণ করেন শ্রীপাদ ভাগবতানন্দ গোস্বামী যিনি খঞ্জ ভগবান আচার্যের পৌত্র এবং যাঁর অপর নাম কৃষ্ণদাস। মূল মন্দিরটি অতি সাধারণ ধরনের আটচালা, সংলগ্ন নাটমন্দিরটি আকারে সুবৃহৎ। এই মন্দির ও সংলগ্ন নাটবাংলা আন্দুল-মৌড়ী নিবাসিনী শ্রীমতী লক্ষ্মীপ্রিয়া

চৌধুরাণী সংস্কার করেন ১৩৬১ সালের ২৪শে কার্তিক (ইংরাজী ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)। এটি প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে। মন্দির-সংলগ্ন সেবাকুঞ্জেরও সংস্কার হয় ১৩৩৬ সালে। সংস্কারকদের নাম প্রস্তর ফলকে লিপিবদ্ধ আছে। এই মন্দিরদ্বয়ের নিত্য সেবার জন্য বর্ধমানের মহারাজা ও আন্দুলের রাজা কর্তৃক প্রদত্ত জমি আছে। শিবমন্দিরটি ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত হয়। পূর্বপাড়ার মদনমোহন মন্দিরটির জীর্ণদশা। 'আচার্য পাড়ায়' একটি গোপীনাথ মন্দির আছে। স্থানীয় চক্রবর্তীরা এটির দেখাশোনা করেন। মন্দিরগুলি সবই আটচালা ধরনের। এছাড়া পশ্চিমপাড়ায় বিশালাক্ষী দেবীরও মন্দির আছে। বাংলার বৈষ্ণব সংস্কৃতিতে গোস্বামী-মালিপাড়ার গোস্বামীগণ একটি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

গোবোরারা

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বেলমুড়ি পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে .এল. নম্বর ১৭৮। বেলমুড়ি রেলস্টেশন থেকে দূরত্ব তিন কিমি। এখানে স্থানীয় ভট্টাচার্য পরিবার কর্তৃক অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত একটি পরিত্যক্ত আটচালা মন্দির আছে। পশ্চিমমুখী এই মন্দিরটির বর্তমানে ভগ্নাবস্থা। মন্দিরগাত্রে 'টেরাকোটা'র কাজ লক্ষ্য করা যায়। মৃৎফলকগুলি অলঙ্কৃত হয়েছে রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতা, পশু ও উদ্ভিজধর্মী নক্সায়।

গৌরহাটি

আরামবাগ থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গৌরহাটি ১ এবং ২ নং পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম বর্তমান। আরামবাগ শহর থেকে গৌরহাটির দূরত্ব ১৩ কিমি। এখানে গঙ্গাধর শিব, রামগোপাল, দামোদর, ধর্ম, বিষ্ণু প্রভৃতির মন্দির ও একটি দোলমঞ্চ আছে। গঙ্গাধর শিবের মন্দিরটি স্থানীয় দালাল পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, নির্মাণকাল ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দ। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী, ছোট আটচালা, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৯ ফুট করে এবং একটিমাত্র দ্বারবিশিষ্ট। সম্মুখভাগে মৃৎফলকের অলঙ্করণ। দোলমঞ্চটিও দালাল বংশের প্রতিষ্ঠিত, পঞ্চরত্ন, উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। শিখরগুলি খাঁজকাটা। মৃৎফলকের উপর কারুকার্য। রামগোপাল মন্দিরটি স্থানীয় মণ্ডল বংশ কর্তৃক উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রতিষ্ঠিত। এটি পঞ্চরত্ন মন্দির, সম্মুখভাগে সামান্য মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ পরিদৃষ্ট হয়। দামোদর মন্দিরটিও পঞ্চরত্ন, স্থানীয় গুহ পরিবার কর্তৃক ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। ধর্মমন্দিরটি আটচালা, স্থানীয় দাসবংশ কর্তৃক উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ আছে যদিও সেগুলির ভঙ্গুর অবস্থা। বিষ্ণুমন্দিরটি পূর্বোক্ত দালাল

পরিবার কর্তৃক উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি পঞ্চরত্ন, মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণবর্জিত এবং বর্তমানে ভগ্নদশায় উপনীত।

চন্দননগর

চন্দননগর হুগলী জেলার চারটি মহকুমার একটি, মহকুমাটির নামকরণ চন্দননগর শহরের নামেই হয়েছে। চন্দননগর চুঁচুড়ার দক্ষিণে, হাওড়া-ব্যাণ্ডেল রেলপথে চুঁচুড়ার পূর্ববর্তী স্টেশন। শহরের পরিমাপ ১০ বর্গ কিমি। চন্দননগর নামটি সম্ভবত 'চাঁদের নগর' নাম থেকে এসেছে। কেউ কেউ বলেন যে গঙ্গানদী এখানে চন্দ্রাকার বলে স্থানটির আদি নাম ছিল 'চন্দ্রনগর' যা লৌকিক উচ্চারণে কালক্রমে চন্দননগরে দাঁড়িয়েছে। অনেকের মতে এখানে একদা চন্দনকাঠের বড় বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল যা থেকে চন্দননগর নামটির উদ্ভব। এই শহরটিতে ফরাসী অধিকারের জন্য কিছুকাল আগে পর্যন্ত শহরটির জনপ্রিয় নাম ছিল ফরাসডাঙা যা বর্তমানে দু'একজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধার মুখে কদাচিৎ শোনা যায়। বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসামঙ্গল কাব্যে চন্দননগরের উল্লেখ নেই, তবে চন্দননগরের অন্তর্গত বোড়োর উল্লেখ আছে। অনুরূপভাবে দিগ্বিজয় প্রকাশে খলিসানি এবং চণ্ডীমঙ্গলে গোন্দলপাড়ার উল্লেখ আছে। উভয় পল্লীই চন্দননগরে অবস্থিত।

১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগরে ফরাসী অধিকারের সূচনা। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রাঁসোয়া দুপ্লের আগমনের পর থেকে এই শহরের শ্রীবৃদ্ধির সূত্রপাত হয়। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পণ্ডিচেরীর গভর্নর নিযুক্ত প্রশাসকের অধীনে চন্দননগরের শাসনভার ন্যস্ত থাকে। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মে চন্দননগর স্বাধীনভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ইতিহাস পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগর পৌরসভার পত্তন হয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে চন্দননগর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন গঠিত হয়। প্রাক্-স্বাধীনতা আমলে চুঁচুড়ার মত চন্দননগরও ছিল বঙ্গদেশের সুন্দরতম শহরগুলির অন্যতম। দুপ্লে স্বয়ং চন্দননগর শহরটিকে পরিকল্পনামাফিক সুন্দর করে গড়ে তোলেন। ফরাসী আমলের চন্দননগরের কিয়দংশ আজও গঙ্গাতীরবর্তী অঞ্চলে বজায় আছে।

চন্দননগরে প্রবেশের জন্য দুটি ফটক, একটি উত্তরে চুঁচুড়া ও চন্দননগরের সংযোগস্থলে, অপরটি দক্ষিণে ভদ্রেশ্বর-চন্দননগরের সংযোগস্থলে। উত্তরের ফটকটি বিলুপ্ত হয়েছে, তবে দক্ষিণেরটি এখনও আছে। ফটকটি খুব প্রাচীন নয়, ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এবং ১৪ই জুলাই তারিখে বাস্তিল দুর্গের পতনের স্মৃতিতে উদ্বোধিত। রাস্তার দু'দিকে দুটি শীর্ষবেষ্টনীসহ চতুষ্কোণ স্তম্ভ দিয়ে এই প্রবেশদ্বার নির্মিত। স্তম্ভবেষ্টনীর উপর গ্রীকধরনের পানপাত্রের অনুকৃতি। একটি

স্তম্ভের গাত্রে প্রস্তরফলকের উপর LIBERTE, EGALITE, FRATARNITE ফরাসী বিপ্লবের এই তিনটি আদর্শ উৎকীর্ণ। অপরটিতে তৎকালীন ফরাসী শাসক ও স্থপতির নাম বর্তমান।

চন্দননগর বিদেশী বাণিজ্যের কেন্দ্র হওয়ায় এখানকার কিছু কিছু উদ্যোগী ব্যক্তি বাণিজ্যের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁর খাতক ছিলেন। তিনি তৎকালীন বিখ্যাত কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর বৎসর চন্দননগর অবরোধকালে ইংরাজ সৈন্যবাহিনী তাঁর আবাস লুণ্ঠন করে ৪৫ লক্ষ টাকার সম্পদ দখল করে। ইন্দ্রনারায়ণের সকল কীর্তিই লুপ্ত হয়েছে, কেবল তাঁর প্রতিষ্ঠিত চৌধুরীঘাট এবং নন্দদুলাল মন্দিরটি অবশিষ্ট আছে। অষ্টাদশ শতকে নির্মিত নন্দদুলালের মন্দিরটি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড থেকে লালবাগান যাওয়ার পথের উপর অবস্থিত, বর্তমান শ্রীদুর্গা ছবিঘরের নিকটে। মন্দিরটি সমতল ছাদবিশিষ্ট, দালান ধরনের, দৈর্ঘ্যে ৫১ ফুট ৯ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১১ ফুট। মন্দিরের সামনে এক বাংলা ধরনের বারান্দা, দৈর্ঘ্যে মন্দিরের দৈর্ঘ্যের সমান, প্রস্থে ১৪ ফুট ২ ইঞ্চি।

চৌধুরীদের অভ্যুত্থানের পূর্বে খলিসানির বসু ও গোন্দলপাড়ার হালদাররাই চন্দননগরের ধনী জমিদার ছিলেন। বসুদের পূর্বপুরুষ করুণাময় বসু ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে চন্দননগরে আসেন। তাঁদের বসতবাড়ি ও ঠাকুরদালানের অবশেষ আজও দৃষ্ট হয়। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠিত নন্দনন্দন মন্দির সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত এবং খলিসানি-বোসপাড়ায় অবস্থিত। দোচালা এই মন্দিরটি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল কিন্তু সম্প্রতি ভারতীয় সাংস্কৃতিক নিধির চন্দননগর শাখার অধ্যক্ষ শ্রীকালীচরণ কর্মকারের প্রচেষ্টায় এটিকে পুরাতন আদল বজায় রেখেই নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে।

চন্দননগরের বোড়াইচণ্ডীতলায় অবস্থিত বোড়াইচণ্ডীর মন্দিরটি উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত। জনশ্রুতি অনুযায়ী প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে সিংহলে আটক পিতাকে মুক্ত করার জন্য শ্রীমন্ত সওদাগর বোড়াইচণ্ডীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি জোড়বাংলা ধরনের, সামনে নাটমন্দির। চন্দননগরের নানা স্থানে অনেকগুলি শিবমন্দির আছে। পালপাড়ায় তিনটি এবং নাড়ুয়ায় দুইটি স্বতন্ত্র মন্দির ছাড়াও ওই এলাকারই বারোমন্দিরতলায় বারোটি শিবমন্দির আছে। কয়েকটি মন্দির অবশ্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই মন্দিরগুলি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকে নির্মিত, সবগুলিই আটচালা ধরনের। ধাড়াপাড়ায় একটি আটচালা শিবমন্দির ও একটি নবরত্ন দোলমঞ্চ আছে। বারাসাতে চারটি অষ্টকোণযুক্ত শিবমন্দিরের সারি আছে, গম্বুজাকার শিখরবিশিষ্ট, নির্মাণকাল

১৭৬২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ। বারাসাতের দশভুজাতলার দশভুজার মন্দিরটি মধ্য-অষ্টাদশ শতকে নির্মিত। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী আটচালা, সামনে ঢাকা বারান্দা, বাঁকানো কার্নিসের নীচে ব্রাকেট হিসাবে সিংহমূর্তির সারি, সম্মুখভাগে 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণ। দেবী দুর্গার মূর্তিটি অষ্টধাতু নির্মিত।

হুগলী এবং চুঁচুড়ার তুলনায় চন্দননগরে মসজিদের সংখ্যা কম, অধিকাংশই বিংশ শতকে নির্মিত। উর্দিবাজারের বড় মসজিদটি অবশ্য বেশ পুরাতন, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মসজিদটি এককক্ষ ও একগম্বুজ বিশিষ্ট, পলকাটা খিলানযুক্ত তিনটি দ্বার ও অলিন্দসহ। প্রার্থনাকক্ষ ও বারান্দার প্রতি কোণে ছোট মিনার। দ্বিতীয় মসজিদটি জুম্মা মসজিদ নামে পরিচিত, কুঠির মাঠে অবস্থিত, নির্মাণকাল বিংশ শতকের গোড়ার দিক। আয়তাকার, সমতল ছাদযুক্ত বারান্দা এবং তিনটি পলকাটা খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিশিষ্ট। মসজিদটির তিনটি গম্বুজ এবং ছাদের বহির্ভাগের প্রতিটি কোণে, সুউচ্চ বেষ্টনী ও গম্বুজকার চূড়াবিশিষ্ট মিনারের শ্রেণী। এছাড়া গোঁদলপাড়া, কাঁটাপুকুর, দিনেমারডাঙ্গা, পাদ্রীপাড়া, মোল্লাহাজিবাগান, বেনিয়াপুকুর, হাটখোলা, সারেঙ্গপাড়া, পাঁজারিপাড়া, ও দুপ্লেপটিতে মসজিদ আছে।

চন্দননগরের ফরাসী আমলের স্মারক বহু এবং গোটা শহরেই তা ছড়িয়ে আছে। যেহেতু ফরাসীরা এখানে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল সেইহেতু চন্দননগরের প্রায় সবটাই ফরাসী আমলের। উনিশ শতকে নির্মিত অনেক প্রাসাদোপম ভবন ফরাসী তথা ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত, যেগুলির বিশদ তালিকা পেশ করা সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষভাবে ফরাসীরা যে সব ভবনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল, এবং যেগুলির কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে সেগুলির পরিচয় দেওয়াই সঙ্গত। চন্দননগরের গঙ্গার তীরে বাঁধানো অংশটি ফরাসীদের নির্মিত এবং এই চত্বরেই তাদের প্রশাসনিক দপ্তর ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল যেগুলি এখনও বর্তমান আছে, যদিও ভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। এই এলাকার বাইরে লালদীঘি এবং তার সামনে বিস্তৃত সমাধিক্ষেত্র ফরাসীদেরই সৃষ্টি। নিকটবর্তী এলাকায় কুঠির মাঠ প্রাচীন ফরাসী বাণিজ্য কুঠির স্মারক।

১৬৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে শোভা সিংহের বিদ্রোহকে উপলক্ষ করে ফরাসীরা চন্দননগরে আর্লিয়াঁ দুর্গ গড়ে তোলে। এই দুর্গটির কোন চিহ্নই বর্তমানে নেই, তবে উর্দিবাজার থেকে বাগবাজার অভিমুখী পথটি আর্লিয়াঁ দুর্গের রাস্তা নামে পরিচিত। ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ' নামক বঙ্গদেশের বিখ্যাত পরিচিতিমূলক গ্রন্থে পূর্বোক্ত এলাকার নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে অবস্থিত বর্তমানের জেলখানা ভবনটিকে আর্লিয়াঁ দুর্গেরই রূপান্তর বলে উল্লেখ

করা হয়েছে। বহুপূর্বে প্রকাশিত এই গ্রন্থের বক্তব্যটি এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চন্দননগরের ফরাসী প্রশাসকের আবাস ও দপ্তর ভবন, বর্তমানে যা অ্যাস্তত দ্য চন্দরনগর নামে পরিচিত এবং ফরাসী শিক্ষা ও সংস্কৃতিচর্চার অবহেলিত কেন্দ্র। ভবনটির প্রকৃত নির্মাণকাল নির্দ্ধারণ করা যা না, তবে উনিশ শতকে রচিত বহু ফরাসী গ্রন্থেই এই ভবনটির ছবি আছে। ভবনটির আকার দেখেই মনে হয় যে সমগ্র ভবনটি এক সময়ে নির্মিত হয়নি। গণিতশাস্ত্রের তৃতীয় বন্ধনীর আকারযুক্ত গঙ্গাতীরবর্তী সম্মুখভাগটি আগে নির্মিত হয়েছিল, পিছনের কক্ষগুলি পরে সংযোজিত হয়েছে এবং এই কক্ষগুলির উপর দ্বিতল উঠেছে আরও পরে। সম্মুখভাগ থেকে ভবনটিকে দ্বিতল বলেই মনে হয় না। ভবনটিতে বর্তমানে একটি মিউজিয়ামও আছে যেখানে দুপ্লের ব্যবহৃত আসবাবপত্র রক্ষিত আছে। ভনটি খুবই জীর্ণ হয়ে পড়ায় বর্তমানে শ্রীকালীচরণ কর্মকারের উদ্যোগে ভারতীয় সাংস্কৃতিক নিধি এটির আমূল সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছে, এবং ফরাসী সরকার এর ব্যয়ভার গ্রহণ করেছে। পুরাকীর্তি সংরক্ষণের আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নিয়মাবলী অনুসরণ করে এই ঐতিহাসিক ভবনটির সংস্কার সদ্য সমাপ্ত হয়েছে।

ফরাসী প্রশাসকের আবাসের পশ্চাতে মেরী মাঠের উত্তরদিকে গঙ্গামুখী বিশাল গীর্জা অবস্থিত যা সেক্রেড হার্ট বা পবিত্র হৃদয় গীর্জা নামে পরিচিত। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রেভারেণ্ড এম. বার্থেট এই গীর্জার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং এর নির্মাণকার্য তদারক করেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন ব্রাদার ইয়াওচিন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এই গীর্জার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় এবং ওই বছরেরই ২৭শে জানুয়ারি তারিখে গীর্জাটির উদ্বোধন করেন রেভারেণ্ড ডঃ পল গোথালস। গীর্জাটি পূর্বমুখী, দ্বিতল। খিলানবিশিষ্ট হলঘরের প্রবেশপথ। ছাদের সম্মুখভাগে অর্ধচন্দ্রাকৃতি পেডিমেন্ট যার উপর পবিত্র ক্রুশ রক্ষিত। ছাদের সম্মুখভাগে অর্ধচন্দ্রাকৃতি দুই কোণে দুটি নাতিউচ্চ চিলেকোঠাধর্মী সমতল ছাদ বিশিষ্ট চতুষ্কোণ শিখর। দুদিকে খিলান ও স্তম্ভযুক্ত পার্শ্বশালা ও বারান্দা, উত্তর দিক থেকে দেখলে পর্চ ও ভেস্ট্রি অংশকে সনাক্ত করা যায়। কেন্দ্রশালার পশ্চিমে উদ্গত অর্ধগোলাকৃতি কক্ষাংশ যেখানে লেডী চ্যাপেল বর্তমান। কেন্দ্রশালার পশ্চাদ্ভাগে বিশাল গম্বুজধর্মী সুউচ্চ শিখর। গঠনশৈলী আগাগোড়াই ইউরোপীয়, এবং সব মিলিয়ে গীর্জাটি অতীব দৃষ্টিনন্দন।

ফরাসী প্রশাসকের আবাসের দক্ষিণে গঙ্গামুখী সেন্ট জোসেফ কনভেন্ট, নির্মাণকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ। এই কনভেন্টের অভ্যন্তরে একটি ছোট চ্যাপেল বা উপাসনাগার আছে যা ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এটি অগাস্টিনিয়ান এবং

ফ্রান্সিস্কান যাজকদের কর্মকেন্দ্র ছিল। মেয়েদের জন্য সেন্ট জোসেফ কনভেন্ট প্রতিষ্ঠা করেন সেন্ট জোসেফ ক্লুনির ভগিনীবৃন্দ। পর বৎসর, অর্থাৎ ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে, ফ্রেরে দ্য সাঁ এসপিরির রেভারেণ্ড এম. বার্থেট একোল দ্য সেন্ট মেরী নামে ছেলেদের জন্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এটিও গঙ্গাতীরে অবস্থিত ফরাসী প্রশাসকের আবাস ও গীর্জার বামদিকে। পরে ফরাসী সরকার এই বিদ্যালয়টি অধিগ্রহণ করেন এবং নাম বদলিয়ে রাখা হয় একোল দ্য গারসঁ। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানে এফ. এ. বা ফার্স্ট আর্টস কোর্স খোলা হলে বিদ্যালয়টির নতুন নামকরণ করা হয় কলেজ দুপ্লে। ১৯০৮ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত কলেজ শাখাটি বন্ধ থাকে। পরবর্তীকালে এটির নাম হয় কানাইলাল বিদ্যামন্দির।

চন্দননগরে শিবমন্দিরের সংখ্যা বহু। গোঁদলপাড়া, উর্দিবাজার, বাগবাজার, লক্ষ্মীগঞ্জ, সরিষাপাড়া, বোড়াইচণ্ডীতলা, গোস্বামীঘাট, কুণ্ডঘাট গলি, বাদামতলা, বক্সির বেড়, পদ্মপুকর, হেলাপুকুরধার, কানাই সরকারের ঘাট, চাঁপাতলা, হাজিনগর, বাউরিপাড়া, বিন্দুবাসিনীপাড়া, ভাকুণ্ডা, সুকসনাতনতলা, হাটখোলা, তেমাথা শিবতলা ও কাঁটাপুকুরে শিবমন্দির আছে। কালীমন্দিরের পরিচয় পাওয়া যায় কালীতলা, বিবির হাট, কাঁটাপুকুর, খলিসানি ও গোঁদলপাড়ায়। খলিসানি ও গোঁদলপাড়ায় সিদ্ধেশ্বরী, শীতলা, পঞ্চানন্দ, বিনোদ ঠাকুর, হাটখোলার বিষহরি, গোস্বামী ঘাটের রাধাবল্লভ, সুকসনাতনতলার আনন্দময়ী ও সুকসনাতন, বাউড়িপাড়ার পঞ্চানন, বিন্দুবাসিনীপাড়ার জগন্নাথ, সম্বলা শিবতলার মহাপ্রভু প্রভৃতি দেবমন্দির চন্দননগরে বর্তমান। এগুলির অধিকাংশই কালসীমা ও স্থাপত্যের বিচারে পুরাতত্ত্বের এলাকায় আসে না। জগদ্ধাত্রী পূজার কথা না বললে চন্দননগর প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ হয় না। চন্দননগরে এই পূজার প্রচলন সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী আছে। সেগুলি এখানে আলোচ্য নয়। জগদ্ধাত্রীর মূর্তিগত বৈশিষ্ট্যই পুরাকীর্তির দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। দেড়শো বছরের অধিককাল ধরে দেবীমূর্তির গঠনশৈলির ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। বারোয়ারি হলেও এক ও অভিন্ন পূজারীতি সকলে মেনে চলতে বাধ্য। এছাড়া চন্দননগরের রথযাত্রাও বহু বছরের পরম্পরা বহন করে। চন্দননগরের বিখ্যাত রথ যাদবেন্দু ঘোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

চন্দ্রহাটি

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বেলুন ধামাসীন পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত জে. এল. নম্বর ১১৩। পাণ্ডুয়া রেল স্টেশন থেকে দেড় কিমি দূরে চন্দ্রহাটির অবস্থান। এখানে উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত দুটি পরিত্যক্ত আটচালা মন্দির আছে। উভয় মন্দিরের সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর দেবতা, মূর্তি, পক্ষী ও

উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণের চিত্রাবলী বিদ্যমান। তবে একটি মন্দিরের 'টেরাকোটা' অলঙ্করণের অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ পীর আফতাবুদ্দীন সাহেবের সমাধি আছে।

চাঁপদানী

চন্দননগর মহকুমা ও ভদ্রেশ্বর থানার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্তী শিল্পাঞ্চল, গরুটি ও বৈদ্যবাটির মধ্যে অবস্থিত। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে চাঁপদানীর উল্লেখ আছে। ইংরাজ সেনাপতি কর্নেল কুট (যিনি পরবর্তীকালে বন্দীবাসের যুদ্ধ বিজেতা স্যার আয়ার কুট) ওয়ারেন হেস্টিংসের সুপারিশে বাংলার নবাব নাজিম মীরজাফরের কাছ থেকে চাঁপদানীঅঞ্চলটি উপহারস্বরূপ পান, এবং এখানে একটি সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করে বহুকাল বাস করেন। বর্তমানে প্রাসাদটির কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

চুঁচুড়া

হুগলী জেলার প্রধান শহর যেখানে জেলার শাসনদপ্তরের প্রধান কেন্দ্র, সর্বোচ্চ জেলা আদালত এবং বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের কার্যালয় অবস্থিত। কলকাতা থেকে ৩৭ কিমি উত্তরে ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে অবস্থিত চুঁচুড়া একদা যে একটি ডাচ বা ওলন্দাজ উপনিবেশ ছিল সেকথা আগে বলা হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে উইলিয়ম হিকি চুঁচুড়াকে তাঁর দেখা শহরসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আখ্যা দিয়েছিলেন। অবশ্য বর্তমান চুঁচুড়াকেদেখে তা মোটেই মনে হয় না। অক্ষয়কুমার সরকার চুঁচুড়া শব্দটিকে ক্ষুদ্রতাবাচক কোন গ্রাম্য শব্দের প্রকারভেদ বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ বলেন যে চিঁচিড়া নামক একপ্রকার বেতের নাম থেকে চুঁচুড়া নামটি এসেছে।বর্তমান লেখকের মতে কোন উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট মন্দির বা গীর্জার কারণে এই অঞ্চলের নাম ছিল উঁচু চূড়া যা কালক্রমে লৌকিক উচ্চারণে চুঁচুড়া হয়েছে। ইউল বলেন যে এক ধরনের দেশী বস্ত্রের নাম ছিল চিনেচুরা যা থেকে চিনসুরা এবং দেশী চুঁচুড়া নামের উদ্ভব হয়েছে। উইলিয়াম হেজেস (১৬৮৪) এই শহরটিকে চিঞ্চোরা, জন ভ্যালেন্টাইন (১৭২৬) সিন্টের্নু বা সিঞ্চের্নু এবং হ্যামিলটন (১৭২৭) চিঞ্চুরা বলে অভিহিত করেছেন।

যিনি যে পথেই চুঁচুড়ায় আসুন না কেন তাঁকে ক্লক টাওয়ারের সামনে অবতরণ করতে হবে। এই ঘড়িটি চারটি রাস্তার কেন্দ্রে অবস্থিত যার চারটি মুখ চারদিকের নিদর্শক। ছয় ফুট বর্গাকার, কিন্তু উপরাংশ সৌকর্যের খাতিরে কিছুটা সঙ্কুচিত, ঢালাই ইস্পাতে নির্মিত স্তম্ভমূলের অভ্যন্তরভাগ ফাঁপা যেখানে ঘড়িটির যন্ত্রপাতি আছে। এর উপরে চতুষ্কোণ স্তম্ভ মোটা থেকে ক্রমশ সরু হয়ে উঠে

গেছে। স্তম্ভের মানানসই শীর্ষবেষ্টনীর উপর ঘড়িটি বসানো। শীর্ষবেষ্টনী ও নীচের স্তম্ভমূল চারটি সরু বেলনাকার থামের দ্বারা সংযুক্ত। শীর্ষবেষ্টনীর চারটি কোণ ও সরু চারটি থাম সুদৃশ্য ব্রাকেটের দ্বারা পরস্পরনিবদ্ধ। শীর্ষবেষ্টনীর নিম্নভাগে উপবৃত্তাকারে রচিত জাফরি। ঘড়ির উপরের চার কোণ থেকে ঝুলন্ত দীপাধার। উপরের দিকে চারটি লৌহময় বৃত্তাংশের সহযোগে একটি খোলা গম্বুজের কাঠামো, যার নীচে ঘন্টা। গম্বুজের কেন্দ্রবিন্দুর শীর্ষে পতাকাদণ্ড। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের স্মৃতিতে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ইস্পাতশিল্পের এই অনবদ্য নিদর্শনটিকে বাদ দিয়ে চুঁচুড়ার পুরাকীর্তি আলোচনা করা যায় না।

ক্লক টাওয়ারের দক্ষিণে ময়দানের উত্তরদিকে পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তৃত, সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘতম, যে বৃটিশ ব্যারাক ভবনটি বর্তমানে জেলা আদালত, কালেকটারি, বিভাগীয় কমিশনারের অফিস ও জেলা জজের আবাস হিসাবে ব্যবহৃত হয় তা পুরাতন ডাচ গুস্তাফ দুর্গের মালমশলা দিয়ে১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে লেফটন্যান্ট জেনারেল ক্রমেলিন ও ক্যাপ্টেন ভন বেল কর্তৃক নির্মিত হয়, যাঁদের সহকারী ছিলেন রামহরি সরকার ও শেখ তনু দফাদার। ১৮৭১ পর্যন্ত এই ভবনটি সৈন্যাবাস হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ২৭৫ মিটার দীর্ঘ এই ভবনটি দ্বিতল, দক্ষিণে জোড়া বারান্দা উত্তরে একক। একতলার বারান্দা পরপর ৬৫টি খিলান দিয়ে গঠিত, দোতলার ভিতরের ও বাহিরের বারান্দা স্তম্ভনির্ভর।

আদালত ভবনের পূর্বোত্তর সীমাসংলগ্ন ভূখণ্ডে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বিস্তৃত ডাচ ব্যারাকে বর্তমানে হুগলী মাদ্রাসার অধিষ্ঠান। ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের একটি চুঁচুড়ার মানচিত্রে নির্দিষ্ট ডাচ সৈন্যাবাস সম্ভবত এই ভবনটিই ছিল একটি ফলকলিপিও এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়। দ্বিতল এই ভবনটিতে সারবন্দী অনেক হলঘর আছে। বারান্দায় ইউরোপীয় ধরনের বারোটি করে বৃত্তাকার খিলান। প্রবেশপথে দুইটি পুরাতন আমলের কামান গ্রথিত। পিছনদিকে বিস্তৃত সোপানশ্রেণী।

আদালত ভবনের পূর্ব-দক্ষিণ সীমান্তসংলগ্ন ভূখণ্ডে গঙ্গাতীরে অবস্থিত ডাচ গভর্নরের আবাস বৃটিশ আমলে এবং বর্তমানে বর্ধমানের বিভাগীয় কমিশনারের আবাস হিসাবে ব্যবহৃত। আদি ভবনটির ভিত্তির উপর বর্তমান ভবনটি নির্মাণ করেন ডাচ গভর্নর সিটেরমান ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, নাম দেন **WELGELEEGEN**। এই ভবনে পুরাতন গুস্তাফ দুর্গের স্মারক হিসাবে 16-OVC-87 তারিখটি উৎকীর্ণ। OVC বলতে বোঝায় OSTINDISCHE VEREENIGDE COMPANIE পূর্বভারতীয় সংযুক্ত কোম্পানী। স্ট্রাভোরিনাস এই ভবনটির একটি সুন্দর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। ভবনটি দ্বিতল, মধ্যে বড় হলঘর, দুদিকে সারিবদ্ধ কক্ষ। গঙ্গামুখী

বারান্দা। একতলার প্রবেশদ্বারের খিলানটি প্রাচ্য রীতিতে গঠিত। সুদৃশ্য সোপানাবলী।

ডাচ গভর্নরের ভবনের দক্ষিণে বর্তমান সার্কিট হাউসটিও একটি বৃটিশ ব্যারাক ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত এই দক্ষিণমুখী, দ্বিতল, সমতল ছাদ এবং খিলান ও স্তম্ভযুক্ত বারান্দাবিশিষ্ট ভবনটির নির্মাণশৈলীতে ইউরোপীয় প্রভাব সুস্পষ্ট। সার্কিট হাউস ও হুগলী কলেজের মধ্যবর্তী স্থলে ডাচ গীর্জা ও ঘণ্টাঘাট অবস্থিত। গীর্জার ঘণ্টা থেকেই ঘণ্টাঘাট নামটির উদ্ভব। ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে সিটেরসান এই গীর্জা নির্মাণের সূচনা করেন এবং ফের্নেট তা সমাপ্ত করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ঝড়ে গীর্জার চূড়াটি ভেঙে যায়। গীর্জাটিকে সম্প্রতি ভেঙে ফেলা হয়েছে, তার একটি দুর্লভ আলোকচিত্র এই গ্রন্থে দেওয়া হল। ঘণ্টাঘাটের নির্মাতা নরসিংহ দাস, নির্মাণকাল ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দ।

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে নির্মিত পেরন সাহেবের বাড়ি (বর্তমানে হুগলী মহসীন কলেজ) ঘণ্টাঘাটের দক্ষিণদিক সংলগ্ন। পেরন সাহেব নামে পরিচিত পিয়েরে কুলিয়ের দৌলতরাও সিন্ধিয়ার অধীনস্থ সাধারণ সামরিক কর্মচারী থেকে কালক্রমে উত্তরপ্রদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে বসেছিলেন। মার্তিনো রচিত তাঁর জীবনচরিত থেকে তাঁর উত্থান ও পতনের বিচিত্র কাহিনী অবগত হওয়া যায়। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর সমাধি চন্দননগরে আছে। মার্তিনো লিখেছেন যে পেরন এই ভবনটি ক্রয় করে সংস্কার ও সুসজ্জিত করেন। ভবনটির সর্বদিকেই একটি স্থাপত্যগত ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। ভবনটি দ্বিতল, পূর্বদিকে গঙ্গাতীরে অর্ধবৃত্তাকার বারান্দা, পশ্চিমে গাড়িবারান্দা, প্রবেশদ্বারের দুদিকে উপরে উঠবার সোপানশ্রেণী, দ্বিতলের বড় হলঘরে আইওনীয় স্তম্ভরাজি দুধারে বৃহৎ কক্ষের সারি। উত্তরে ও পশ্চিমে ক্ষুদ্র সূক্ষ্মাগ্র স্তম্ভশ্রেণীর দ্বারা নির্মিত প্রাকার, উত্তরে তিনটি বৃত্তাংশে বিভাজিত প্রবেশদ্বার, দুই প্রান্তে বর্গাকার পেডিমেন্টযুক্ত দ্বারকক্ষ। পেরন ভবনটি ক্রয় করেন ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে। পর বৎসর তিনি চুঁচুড়া পরিত্যাগ করলে ভবনটি ক্রয় করেন বিখ্যাত বিলাসী বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদার। অমিতব্যয়িতার জন্য তিনি সর্বস্বান্ত হলে ম্যাকেঞ্জিলায়াল কোম্পানীর মধ্যস্থতায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে এই বাড়ি ক্রয় করেন প্রাণকৃষ্ণ শীল ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র বিশ্বম্ভর শীল। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে এই বাড়িতে হুগলী কলেজ চালু হয়।

পেরণ হাউস বা কলেজ ভবনের দক্ষিণে প্রাণকৃষ্ণ হালদারের ঠাকুরবাড়িটি দ্বিতল, ইউরোপীয় ধরনের স্তম্ভের উপর নির্মিত কয়েকটি দালানের সঙ্গে সংযুক্ত। গঙ্গাতীরে দুটি সুদীর্ঘ প্রাকার বাঁধস্বরূপ বর্তমান। এই বাড়িতে এখন হুগলী কলেজিয়েট স্কুল প্রতিষ্ঠিত। এই ভবনের দক্ষিণে দত্তঘাট এবং তারপরেই ষণ্ডেশ্বরতলার ঘাট। ষণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গ ষোড়শ শতকে দিগম্বর হালদার কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত। পরবর্তীকালে পাকা মন্দির নির্মাণ করে দেন সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী। সম্প্রতি নতুন করে সুউচ্চ মন্দির গড়া হয়েছে। ডাচ গভর্নর ওভারবেক কর্তৃক ষণ্ডেশ্বরকে উৎসর্গীকৃত পিতলের ঢাক আজও ব্যবহার করা হয়। মন্দির চত্বরে জোড়াবাংলা ধরনের একটি দক্ষিণমুখী দুর্গামন্দির আছে যা ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

ষণ্ডেশ্বরতলার লাগোয়া শ্যামরাম সোমের বাগানবাড়ি (বর্তমানে সোম ট্রেনিং স্কুল) মধ্য-অষ্টাদশ শতকে নির্মিত। শ্যামবাবুর ঘাটের নিকট করুণাময়ী কালীমন্দির (১৮০৮), জোড়া শিবমন্দির (উনিশ শতক), জগন্নাথের বিগ্রহস্থল ও ঠাকুরদালানসহ মল্লিক বাড়ি (মধ্য-উনিশ শতক), চৌমাথায় সাগর দত্তের ঠাকুরবাড়ি (মধ্য উনিশ শতক), শীলগলিতে নীলাম্বর শীলের ভবন, এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত শ্রীধর জীউর বিগ্রহস্থল, ঠাকুরদালান ও গোপাল মন্দির (সবগুলিই অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে নির্মিত), কনকশালী-কদমতলায় সরকার বংশ প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনের পঞ্চরত্ন মন্দির (১৭৮৩) এবং নিয়োগীদের ঠাকুরবাড়ি (মধ্য-উনিশ শতক) পুরাকীর্তির দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। চুঁচুড়ার সর্বদক্ষিণে অবস্থিত বুড়োশিবতলার শিবমন্দির চুঁচুড়া শহরের একমাত্র পরিপূর্ণ 'টেরাকোটা'র কারুকার্যমণ্ডিত মন্দির, যদিও কামারপাড়ায় দুটি পরিত্যক্ত আটচালা শিবমন্দিরে সামান্য 'টেরাকোটা'র কাজ দৃষ্টিগোচর হয়। বুড়োশিবতলার মন্দিরটি নবরত্ন, খাঁজকাটা শিখরবিশিষ্ট, পূর্ব ও দক্ষিণের দেওয়ালে চিত্রাবলী, পরিমাপ ১৬ বর্গফুট, নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতক। খরুয়াবাজারে অবস্থিত উনিশ শতকে নির্মিত দয়াময়ী কালীমন্দির স্থাপত্যের দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সরু স্তম্ভের উপর গঠিত কারুকার্যময় দক্ষিণমুখী তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারের চারদিকে সমরেখ আয়তাকারে চৌখুপির কাজ। ছাদ ক্রম হ্রস্বায়মান উপর্যুপরি বিন্যস্ত বহুসংখ্যক সমান্তরাল কার্নিশের সহযোগে পিরামিডকৃতি হয়ে ধাপে ধাপে উপরে উত্থিত। মন্দিরের পূর্বমুখে চারটি শিবমন্দির। আকারে কিছু ছোট হলেও এগুলি গঠন ও কারুকার্যের দিক থেকে সর্বাংশে কালীমন্দিরের অনুরূপ, কেবল তিনটির পরিবর্তে একটি প্রবেশদ্বার।

আর্মেনীয় গীর্জা নামে পরিচিত সেন্ট জনের গীর্জা চুঁচুড়ার কেন্দ্রস্থ ক্লক টাওয়ারের কিছুটা উত্তরে অবস্থিত। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এই গীর্জার নির্মাণকার্য শুরু করেন খোজা যোহানেস মার্গার, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ডাচ গভর্নর ওভারবেক। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন যোহানেসের ভাই যোসেফ। শিখর অংশটি পরবর্তীকালে সংযোজন করেন শ্রীমতী সোফিয়া বাগরাম। আয়তাকার প্রার্থনাহলটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রসারিত, তিন দিকে থামযুক্ত বারান্দা। শিখরভবনের প্রথম ও দ্বিতীয়তলের উচ্চতা হলঘরের

উচ্চতার সমান। তার উপর ক্রমহ্রস্বায়মান পরিসরে আরও দুইটি খিলান নির্মিত তল, খিলানগুলি জোড়া স্তম্ভের উপর গঠিত। তার উপর মোচাকৃতি শিখর। এটি পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় প্রাচীনতম গীর্জা, সর্বভারতীয় হিসাবে তৃতীয়। এই গীর্জার প্রাঙ্গনে আর্মেনিয়ার তিফলিস-ককেশাসের অন্তর্গত কারাবাঘের শেষ স্বাধীন নৃপতি ও তাঁর বংশধরদের সমাধি আছে। একটি সমাধি এই বংশেরই জোসেফ ডেভিড বেগলারের যিনি কানিংহামের সহকর্মী ছিলেন।

আর্মেনীয় গীর্জার পূর্বে ও দক্ষিণে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নির্মিত হাজী কারবালাই ও হালিম শাহ ইমামবাড়ি অবস্থিত। শেষোক্তটি টিপু সুলতানের বংশধরদের সম্পত্তি। কিছুটা উত্তরে জোড়াঘাট মসজিদ ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নির্মিত। মসজিদটি তিনটি গম্বুজ এবং সম্মুখে সমতল ছাদের বারান্দা বিশিষ্ট। তিনটি পলকাটা খিলানদ্বার। চারকোণে চারটি এবং পশ্চিম দেওয়ালে দুটি বেষ্টনীযুক্ত স্তম্ভ বিদ্যমান। স্তম্ভগুলির শীর্ষবেষ্টনী উত্থিত ফুলের পাপড়ির আকারযুক্ত, তার উপর শঙ্কু ধরনের গম্বুজ। দালানের প্রবেশপথের খিলানত্রয় তরঙ্গিত পলকাটা। বাসস্ট্যাণ্ডের উত্তর দিকে উনিশ শতকে নির্মিত মতিঝিল মসজিদ চুঁচুড়ার একমাত্র শিয়া মসজিদ, বর্তমানে পরিত্যক্ত। বর্গাকার, চারদিকে অলিন্দ, প্রতি অলিন্দে পাঁচটি করে খিলানপথ এবং শীর্ষদেশে একটি করে চারটি গম্বুজ, কেন্দ্রশালার উপরে বৃহদায়তন গম্বুজ, পরটযুক্ত ছাদের তিন কোণে দশটি ছোট মিনার, পূর্বদিকে প্রবেশদ্বারের দিকে দুটি অপেক্ষাকৃত বড় মিনার। মতিঝিল মসজিদের সামান্য পশ্চিমে মিয়ারবের মসজিদের নির্মাণকাল ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ। এটি আয়তাকার, ত্রিকক্ষবিশিষ্ট, কেন্দ্রশালার উপর বড় গম্বুজ এবং বাকি দুটির উপর ধনুরাকৃতি ছাদযুক্ত, বর্তমানে নবীকৃত। খরুয়াবাজারের জাম-ই-মসজিদ কেন্দ্রশালার উপর একটি গম্বুজ ও পার্শ্বশালার উপর সমতল ছাদ বিশিষ্ট। নির্মাণকাল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ, বর্তমানে নবীকৃত। এগুলি ছাড়াও চুঁচুড়ায় এক গম্বুজযুক্ত মসজিদ আছে ফুলপুকুরে, কাজীপাড়ায় এবং তুলোপটিতে।

ধরমপুরের ডাচ সমাধিক্ষেত্রটি পরবর্তীকালে ইংরাজ ও স্থানীয় খ্রীষ্টানগণ কর্তৃক ব্যবহৃত। সমাধিগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম কেননা কতিপয় ডাচ গভর্নর তাঁদের পরিজন এবং পদস্থ কর্মচারী ছাড়াও বহু বিশিষ্ট ইংরাজ রাজপুরুষ ও সেনাধ্যক্ষ এই সমাধিক্ষেত্রে শায়িত আছেন। সমাধিগুলির স্থাপত্যগত মূল্যও বড় কম নয়। যে সকল কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান এই সকল সমাধি নির্মাণ করেছে বা সমাধিফলক তৈরি করেছে, তাঁদের নামও পাওয়া যায়। সমাধিক্ষেত্রটি ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ডাচ গভর্নর লুই তিল্লেফার্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মূল সমাধিক্ষেত্রের বাহিরে অজ্ঞাতপরিচয় কোন বিশিষ্ট ডাচ ব্যক্তির একটি সুউচ্চ পিরামিডাকার সমাধি

আছে। চুঁচুড়ার এই পিরামিডটি খুবই দর্শনীয় যদিও আজ তা ভেঙে পড়ার মুখে।

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর খাদিনা ও তালডাঙ্গার মধ্যে অবস্থিত ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত সুসানা আন্না মারিয়ার সমাধি মন্দিরটি ইন্দো-ডাচ স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে অবশ্য দর্শনীয়। সুসানা ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত ডাচ মহিলা যিনি ইয়েটস পদবীধারী জনৈক ইংরাজকে বিবাহ করেন। ইষ্টক নির্মিত অষ্টকোণ এই সমাধি মন্দিরটি সোপানযুক্ত উচ্চ মঞ্চের উপর গঠিত। প্রথম তলের চারদিকে বর্গাকার বহির্ভাগে উদ্গত সরদলের মধ্যে উন্মুক্ত খিলান। দ্বিতলটি একতলারই ঈষৎ সংক্ষিপ্ত প্রতিরূপ। তার উপর গম্বুজাকৃতি শিখর। শিখরমূলে অনুভূমিক বেষ্টনী, শিখরগাত্রে উল্লম্ব রেখার কারুকার্য।

চুঁচুড়ার কয়েকটি ভবনও ইতিহাস ও স্থাপত্যের দৃষ্টিকোণে উল্লেখযোগ্য যেগুলির মধ্যে প্রধান হল তুলোপাটি অভিমুখে মাঝের রাস্তায় সাত ভাই-এর বাড়ি, শীলগলিতে নীলাম্বর শীলের ভবন, কামারপাড়া অঞ্চলে মণ্ডলবাড়ি, বড়বাজারে লঞ্চঘাটের নিকট ফ্রী চার্চ স্কুল ভবন, (বর্তমানে ডাফ স্কুল) মিশন হাউস (নির্মাণকাল ১৮৪৯-এর পূর্বে, ভিতরে একটি চ্যাপেল আছে), জীবন পালের বৈঠকখানা বাড়ি, রিট্রিট ভবন (একদা ইউরোপীয় হোটেল যেখানে একটি ভোজসভায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যোগদান করেছিলেন। পরে প্রধান ডাকঘর হিসাবে কিছুকাল ব্যবহৃত হয়) মাধব দত্তের বাগানবাড়ি (বর্তমান দত্ত লজ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যেখানে কিছুকাল বাস করেছিলেন), জোড়াঘাটের আদ্যবাড়ি (জনৈক মুসলিম শাসকের আবাস, উত্তরভারতীয় স্থাপত্যরীতিতে গঠিত। এই গৃহে মহাত্মা গান্ধী অবস্থান করেছিলেন) প্রভৃতি। লঞ্চঘাটের পাশেই ডান সাহেবের স্মৃতিস্তম্ভ, ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

চৈতন্যবাটি (বাগনান)

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত গোপীনাথপুর-২ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৪৯। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের বেলমুড়ি স্টেশন থেকে যেতে হয়। এখানে স্থানীয় বিশ্বাসবংশ কর্তৃক ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি পূর্বমুখী শিবমন্দির 'টেরাকোটা' অলঙ্করণে সমৃদ্ধ। এটি আটচালা। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে স্থানীয় বসু পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দুটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির এখানে বর্তমান। উভয় মন্দিরেরই সম্মুখভাগে সামান্য কিছু 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণ আছে। বিষয়বস্তু দেবতা, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী। এছাড়া এখানে ঘোষ বংশ প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ শিবের মন্দির আছে। এগুলি বিলুপ্তির মুখে।

চোপা

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত গুড়বাড়ি পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৮। গুড়াপ রেল স্টেশন থেকে দূরত্ব সাড়ে ছয় কিমি। বাসে যাওয়া যায়। এই গ্রামের মজুমদার বংশের সুবৃহৎ ভবন ও অসংখ্য দেবালয় এখানকার প্রাচীন গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মজুমদার বংশের রামদেব প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথের মন্দির, দুর্গাদালান ও চারটি শিবমন্দির এখনও ভগ্নাবস্থায় বর্তমান। এছাড়া স্থানীয় মুখোপাধ্যায় বংশের প্রতিষ্ঠিত দুইটি শিবমন্দির ও ঢাকেশ্বরী মন্দির উল্লেখযোগ্য। মজুমদারদের প্রতিষ্ঠিত একটি পঞ্চরত্ন ও একটি আটচালা মন্দিরের সম্মুখভাগে 'টেরাকোটা' অলঙ্করণ বর্তমান। দুটি মন্দিরেরই নির্মাণকাল উনবিংশ শতক। দেবতা ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ মৃৎফলকের বিষয়বস্তু। তিনটি শিবমন্দির ব্রাহ্মণপাড়ায় অবস্থিত। দুর্গাদালান এবং অপর একটি শিবমন্দির মজুমদারপাড়ায় অবস্থিত। চারটি মন্দিরই আটচালা ধরনের, নির্মাণকাল উনিশ শতক।

চৌবেড়া

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বাটিকা-বৈঁচি পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ২১। এখানে ধনঞ্জয় মণ্ডল কর্তৃক ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির আছে। এখানে একটি মহাকালের স্থানও আছে এবং উক্ত দেবতার নামানুসারে একটি মহাকাল দীঘি আছে। পার্শ্ববর্তী আলিপুর গ্রামে পীর আজগবী সাহেবের সমাধি আছে।

ছোট সরসা

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বেলুন-ধামাসীন পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১২১। ক্ষীরকুণ্ডী থেকে ছোটসরসার দূরত্ব তিন কিমি। এখানে সেন বংশ প্রতিষ্ঠিত এক জোড়া আটচালা শিবমন্দির আছে, উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নির্মিত। মন্দিরদ্বয় দক্ষিণমুখী, ভগ্নদশায় এবং 'টেরাকোটা' অলঙ্করণ বর্জিত।

জগন্নাথবাটি

মগরা থানার অন্তর্গত এবং মগরা গঞ্জের অদূরবর্তী এই গ্রামটিতে খানপুর রোডের উপর উনিশ শতকে নির্মিত দুটি আটচালা ধরনের শিবমন্দির বর্তমান।

জঙ্গলপাড়া

আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত পুরশুড়া ১নং পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। জে এল নম্বর ১২। পুরশুড়া থেকে জঙ্গলপাড়ার

দূরত্ব তিন কিমির মত। এখানে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোলে ও পালবংশ প্রতিষ্ঠিত দুটি প্রথাগত আটচালা মন্দির আছে। একটি মঙ্গলচণ্ডী মন্দির নামে পরিচিত। দুটি মন্দিরই অবহেলিত। উভয়েরই সম্মুখভাগে মৃৎফলকের চিত্রাবলী বর্তমান। দেবতা, মূর্তি, রামায়ণের কাহিনী, রাজদরবারের দৃশ্য, পশুপক্ষী ও পত্রপুষ্প এই চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু।

জনাই

চণ্ডীতলা থানা ও ব্লকের অন্তর্গত জনাই নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৫৭। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে জনাই রেলস্টেশন অবস্থিত, পূর্বে মার্টিন কোম্পানীর রেলপথেও জনাই স্টেশন ছিল। জনাই-এর উত্তরপূর্বে সরস্বতী নদী ও বাকসা। জনাই-বাকসা পূর্বে একটি গ্রাম ছিল। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে জনাই-এর উত্তরাংশ বাকসা নামে অভিহিত হতে থাকে। জনাই-এর জমিদার পরিবার মুখোপাধ্যায় বংশের কীর্তিকলাপ এতদঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁদের প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহ পুরাকীর্তির নিদর্শন হিসাবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এক একটি প্রাসাদের শুধুমাত্র শয়নকক্ষের সংখ্যাই ৮০ থেকে ১২০টির মত। জগমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রাসাদটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। তার একাংশ সংস্কার করে জগমোহনের দৌহিত্রবংশ বাস করেন। কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিরাট সৌধ যেখানে অশ্বশালা, অতিথিশালা, কাছারিবাড়ি, খাজাঞ্চিখানা প্রভৃতি বর্তমান ছিল এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত ; শুধু প্রাসাদের কিছু অংশ, পাম গাছের সারি ও দুটি শিবমন্দির বর্তমান। জনাই-এর প্রান্তে অবস্থিত বাকসা বাড়ি সৌন্দর্য ও বিরাটত্বে তুলনাহীন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ভবনটিকে 'বাংলার তাজমহল' আখ্যা দিয়েছিলেন।

জয়নগর

তারকেশ্বর থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বালিগড়ি-১ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনে বাহিরখণ্ড রেলস্টেশন থেকে জয়নগর দেড় কিমি দূরবর্তী। এখানে স্থানীয় চট্টোপাধ্যায় বংশ প্রতিষ্ঠিত দুটি আটচালা পরিত্যক্ত শিবমন্দির আছে, নির্মাণকাল যথাক্রমে ১৭৪০ ও ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। উভয় মন্দিরগাত্রেই মৃৎফলকের কাহিনী, মূর্তি ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী বিদ্যমান। এছাড়া স্থানীয় ভড় পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আরও দুটি আটচালা শিবমন্দির আছে, একটির নির্মাণকাল ১৭৯১, অপরটির উনিশ শতক।

জাঙ্গীপাড়া

হুগলী জেলার একটি প্রাচীন স্থান, হাওড়া থেকে ৪৫ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। বর্তমানে জাঙ্গীপাড়ার সঙ্গে হাওড়া-হুগলীর বিভিন্ন অঞ্চলের সরাসরি বাস রাস্তার

সংযোগ হয়েছে। থানা ও ব্লক হিসাবে জাঙ্গীপাড়ার অধীনস্থ অনেকগুলি গ্রাম ও পঞ্চায়েত এলাকা আছে। এখানে ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি পশ্চিমমুখী আটচালা শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি ভাল অবস্থাতেই বিদ্যমান। সম্মুখভাগে মৃৎফলকে রামায়ণ কাহিনী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণের পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে আরও কয়েকটি ভগ্ন মন্দির আছে। এগুলির মধ্যে পদ্মপুকুর ঘাটে অবস্থিত অষ্টাদশ শতকের দুটি আটচালা শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য। জাঙ্গীপাড়া একই নামের থানা, ব্লক ও পঞ্চায়েত এলাকার সদর দপ্তর। জাঙ্গীপাড়া গ্রামের জে এল নম্বর ৬৭।

জামগ্রাম

পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত। বঙ্গদেশের বৃহত্তম একান্নবর্তী পরিবার নন্দীদের গ্রাম হিসাবে জামগ্রামের প্রসিদ্ধি। এখানে নন্দীদের লক্ষ্মীজনার্দন মন্দির, ঠাকুরদালান ও রাসমঞ্চ বিদ্যমান। লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দির সমতল ছাদের উপর একটি শিখর বিশিষ্ট। ঠাকুরদালানটি সমতল ছাদ ও খিলানযুক্ত। রাসমঞ্চটি নবরত্ন ধরনের। তিনটিরই প্রতিষ্ঠাকাল উনিশ শতকের গোড়ার দিক।

জীরাট

বলাগড় থানা ও ব্লকের অন্তর্গত জীরাট নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১০৯। জীরাট রেলস্টেশন ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া লুপ লাইনে অবস্থিত। অতীতে জীরাটের নাম ছিল মহম্মদপুর। জীরাটের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে যা জানা যায় তা হল দুই বন্ধু পণ্ডিত অভয়রাম সার্বভৌম এবং রামকানাই গোস্বামী সপ্তদশ শতকে এই গ্রামে এসে কালিয়াগড়ের (বলাগড় দ্রষ্টব্য) সিদ্ধেশ্বরী কালীর পূজারী কাশীনাথ অধিকারীর দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। অভয়রাম নিজের বসতবাটিতে মৃন্ময়ী কালী এবং রামকানাই নিজ বসতবাটিতে রাধাগোপীনাথ বিগ্রহ স্থাপন করেন। এতদঞ্চলের প্রাচীন দেবতা বুড়োশিব, মহাকাল-ভৈরব ও সিদ্ধেশ্বরী কালীর পর এই মৃন্ময়ী কালী ও রাধাগোপীনাথ প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠেন। মৃন্ময়ীদেবীর মন্দির ও মণ্ডপ নির্মাণ করেন যথাক্রমে অভয়রামের পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও পৌত্র মুকুন্দরাম। রাধাগোপীনাথের মন্দির ও মণ্ডপ নির্মাণ করেন রামকানাই গোস্বামীর অন্যতম প্রধান শিষ্য সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ের মাধব দত্ত। অভয়রামের বংশধরদের মধ্যে ফকিরচাঁদ চক্রবর্তী ডি-সুজা কোম্পানীর বেনিয়ান হিসাবে বহু অর্থের মালিক হন (তাঁর নামে উত্তর কলকাতায় গরাণহাটার কাছে ফকির চক্রবর্তী লেন আছে) এবং কলকাতা ছাড়া জীরাটে তিনি প্রাসাদতুল্য বাসভবন ও দুর্গোৎসবাদির জন্য চণ্ডীমণ্ডপাদি তৈরি করেন। সেই মণ্ডপের ভগ্নাবশেষ আজও আছে। তাঁদের পুষ্করিণীর বাঁধাঘাটের

পাশে ফকিরচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত দুইটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরের গায়ে লেখা আছে 'বিপ্র ফকিরচন্দ্রকৃত'। শ্রীশিবমন্দির। শকাব্দ ১৭৬৩।' (১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ)। মন্দির দুটি আটচালা ধরনের। রামকানাই প্রতিষ্ঠিত ঝুলন ও দোলমঞ্চটিও অদ্যাপি বর্তমান।

জেজুর

চন্দননগর মহকুমা ও হরিপাল ব্লকের অন্তর্গত জেজুর নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৮৩। পূর্বে এই গ্রামের নাম ছিল কসবা। কথিত আছে এই গ্রামে পুরাকালে নাগর নামক এক রাজার রাজধানী ছিল। স্থানীয় শ্মশান অঞ্চলটিকে এখনও নাগরগাছি বলা হয় যেখান থেকে একটি পাথরের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে রাণীয়া নামক একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধারের সময় কয়েকটি বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এখানকার হাটতলার কালীমন্দির ও শিবমন্দির বেশ প্রাচীন। ঘোষ ও বসুবংশের দুর্গাদালানটিও বেশ পুরাতন এবং বর্তমানে তা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় বিরাজমান। মিত্রবংশের শ্রীধর ও লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরও দর্শনীয়।

জেরুর

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত গুড়বাড়ি পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১। গুড়াপ স্টেশন থেকে চোপা হয়ে জেরুরে যেতে হয়। এখানে উনিশ শতকে নির্মিত একটি আটচালা শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি পূর্বমুখী, ভাল অবস্থা। মন্দিরগাত্রে টেরাকোটার কাজ আছে। দেবতা, মূর্তি, পশু ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ আছে মৃৎফলকের উপর।

ডিহি বায়ড়া

আরামবাগ থানা ও ব্লকের অন্তর্গত মায়াপুর পঞ্চায়েত থেকে মাত্র ৪ কিমি দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম, জে এল নম্বর ৪৪। আরামবাগ থেকে মাত্র ৪ কিমি দূরে অবস্থিত। পূর্বকালে এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধি ছিল। এখানকার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা নরেন্দ্রনারায়ণ বুন্দেলখণ্ড থেকে আসেন। তাঁর বংশধর রণজিৎ রায় দেবী বিশালাক্ষীর কৃপাধন্য ছিলেন বলে কথিত (দ্রষ্টব্য পারুল)। এখানে স্থানীয় পালবংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বরূপনারায়ণের একটি ছোট আটচালা মন্দির আছে। মন্দিরের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে প্রায় ষোল ফুট প্রস্থে সাড়ে চোদ্দ ফুট। নির্মাণকাল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ। মন্দিরটি পূর্বমুখী, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ। মন্দিরের সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ আছে। দেবমূর্তি, রামায়ণের কাহিনী, রাজদরবারের চিত্রাবলী এই অলঙ্করণকে সমৃদ্ধ করেছে।

তালচিনান

দাদপুর থানা ও ব্লকের অন্তর্গত গোস্বামী-মালিপাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১০৮। চুঁচুড়া রেল স্টেশন থেকে দূরত্ব ১৬ কিমি। এখানে পাঠকবংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ আছে, শিখরগুলি রেখ ধরনের, ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এবং উত্তম 'টেরাকোটা' অলঙ্করণ যুক্ত।

তারাগ্রাম

হাওড়া-বর্ধমান মেল লাইনের তালাণ্ডু রেলস্টেশন থেকে তারাগ্রামে যেতে হয়। এখানে হাটখোলার সুরদের প্রতিষ্ঠিত পাঁচটি শিব মন্দির আছে, একটি চড়কতলায় অপর চারটি মাঝের পাড়ায়। মন্দিরগুলি আটচালা ধরনের, নির্মাণকাল আঠারো-উনিশ শতক।

তারাজোল

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত হরাল-দাদপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। জে. এল নম্বর ৬৭ গুড়াপ-কালনা বাস রাস্তার উপর এই গ্রামটি পড়ে। এখানে পীর সুফু সাহেব এবং বুড়ো দেওয়ান সাহেবের মাজার আছে। তারাজোল দেওয়ান সাহেবের নামে একটি প্রাচীন পুষ্করিণীও আছে।

তারকেশ্বর

প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান এবং একই নামের থানা ও ব্লকের সদর দপ্তর, বৈদ্যবাটির ৩৩ কিমি পশ্চিম-উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। হাওড়া থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত রেলপথ আছে এবং শেওড়াফুলি রেলস্টেশন থেকেও তারকেশ্বর যাওয়া যায়। এছাড়া বর্ধমান, হুগলী ও অপরাপর জেলার নানাস্থান থেকে বাসযোগে তারকেশ্বর আসা যায়। তারকেশ্বরের প্রধান আকর্ষণ তারকনাথ শিবের মন্দির। মন্দিরটি বৈশিষ্ট্যহীন আটচালা, সামনে একটি নাটমন্দির আছে। বর্তমান মন্দিরটি শিয়াখালার নিকটবর্তী পাতুল-সন্ধিপুরের গোবর্ধন রক্ষিত কর্তৃক নির্মিত, সংলগ্ন নাটমন্দিরটি নির্মাণ করেন হাওড়ার চিন্তামণি দে। শিবমন্দিরের নিকট কালী ও লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির এবং দুধপুকুর নামক একটি পুষ্করিণী আছে যেখানে ভক্তরা স্নান করেন। নিকটেই তারকেশ্বর এস্টেটের পরিচালক মোহান্তের বাসভবন ও কর্মশালা বর্তমান। পূজা, উৎসব, ধর্মীয় ও সেবামূলক কাজকর্ম ছাড়াও এই এস্টেট একটি সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় পরিচালনা করে। সারা দেশ থেকেই তারকেশ্বরে তীর্থযাত্রীরা আসেন। এখানকার শিবরাত্রি ও গাজন বিখ্যাত। এই সকল উৎসব উপলক্ষে মেলা বসে। বিশেষ করে চৈত্র ও শ্রাবণ মাসে ভক্তরা বৈদ্যবাটীর নিমাই তীর্থের ঘাটে স্নান করে বাঁকে করে গঙ্গাজল

নিয়ে পদব্রজে তারকেশ্বরে গিয়ে তারকনাথের মাথায় জলসিঞ্চন করেন। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী তারকেশ্বর শিবলিঙ্গ স্বয়ম্ভূ। এটিকে সাধারণ পাথর মনে করে রাখাল বালকেরা তাঁর মাথায় ধান ভেঙে খাওয়াদাওয়া করত। যার ফলে তাঁর মাথায় একটি গর্ত হয়ে যায়। একটি গাভী ওই লিঙ্গের উপর দুগ্ধ বর্ষণ করত যা দেখে ওই গাভীর মালিক মুকুন্দ ঘোষ তারকনাথের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন। এই মুকুন্দ ঘোষ ছিলেন বালিগাড়ির ছত্রী জমিদার বিষ্ণুদাসের গোসম্পদের তত্ত্বাবধায়ক। রাজা বিষ্ণুদাস ও তাঁর ভাই ভারামল্ল তারকনাথের লিঙ্গকে মাটি থেকে তুলতে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ওই স্থানেই তাঁর মন্দির তৈরি করেন। তবে ইতিহাস মানতে গেলে বিষ্ণুদাস-ভারামল্লের আগেও এখানে শৈব কেন্দ্র ছিল। ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে তারকেশ্বরের সেবার জন্য রাজা ভারামল্ল বহু জমি নিষ্কর করে দেন এবং দশনামী শৈব সন্ন্যাসী মায়াগিরি ধুম্রপানকে এখানকার মোহান্ত নিযুক্ত করেন। দশনামীরা এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই তারকেশ্বর মঠ গড়ে তোলেন এবং গুপ্তিপাড়া, নয়নগড়, ভোটবাগান, বৈদ্যবাটি, গড়ভবানীপুর, সন্তোষপুর এবং চাঁইপাটের শৈব মঠগুলি তারকেশ্বরের অধীন হয়। তারকেশ্বরের মোহান্তদের অধিকাংশই সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত ছিলেন, তবে শ্রীমন্তগিরি ও মাধবগিরির মত কয়েকজন অতি কুচরিত্রের লোক ছিলেন। তাঁদের দুষ্কর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই তারকেশ্বরের মঠকে জনসাধারণের সম্পত্তি বলে ঘোষণা করা হয়, মোহান্তদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা হয়, পরিচালনার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধি ও সরকারী প্রতিনিধিদের ভূমিকা স্বীকৃত হয়।

তেতুলিয়া

ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনের বলাগড় স্টেশনে নেমে যেতে হয়। এখানে উনিশ শতকে নির্মিত তিনটি শিবমন্দির আছে, দুটি আটচালা ও একটি পঞ্চরত্ন।

ত্রিবেণী

বাঁশবেড়িয়ার উত্তরে ত্রিবেণী মগরা থানার অন্তর্গত। হিন্দু তীর্থস্থান হিসাবে ত্রিবেণী সুবিদিত। এখানে ভাগীরথীর তিনটি বেণী—মূল ভাগীরথী, যমুনা (কাঁচরাপাড়া খাল) ও সরস্বতী—পৃথক বা মুক্ত হয়েছে বলে এই ত্রিবেণী মুক্তবেণী নামে পরিচিত। পক্ষান্তরে প্রয়াগ বা এলাহবাদে যে ত্রিবেণী আছে তাকে বলা হয় যুক্তবেণী। পাল ও সেনযুগে ত্রিবেণীর যে প্রসিদ্ধি ছিল তা সেখান থেকে প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক অবশেষ থেকে প্রমাণিত হয়। লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ী তাঁর পবনদূত কাব্যে ত্রিবেণীর বর্ণনা করেছেন; পবনদূতে উল্লিখিত মুরারিমন্দির অবলুপ্ত। ষোড়শ শতকে রচিত বিপ্রদাস পিপলাই-এর মনসামঙ্গল কাব্যে (রচনাকাল ১৪৯৫) এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল

কাব্যে ত্রিবেণী উল্লিখিত। ত্রিবেণীর মধ্যযুগের ইতিহাস আমরা পূর্বে বিবৃত করেছি। ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম হেজেস লিখেছেন যে জলপথে কাশিমবাজার যাওয়া আসার সময় তিনি ত্রিবেণীতে অবতরণ করতেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রবার্ট হেজেস লিখেছেন যে ফারুখশিয়ারের রাজসভায় যে সকল ইংরাজ দূত হয়ে গিয়েছিলেন তাঁদের তিনি TREVINNY-তে অভ্যর্থনা করেন। ডাচ নৌ-অধ্যক্ষ স্টাভোরিনাস ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে TERBONEE-তে পরিভ্রমণ করেন।

ত্রিবেণীর গঙ্গাতীরে অবস্থিত জাফর খান গাজীর আস্তানা হুগলী জেলার প্রাচীনতম পুরাকীর্তি সমূহের মধ্যে একটি। এই আস্তানাটি একটি উঁচু ঢিবির উপর অবস্থিত এবং বর্তমানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক সংরক্ষিত। ছাদবিহীন দরগাটি আয়তাকার এবং দুইভাগে বিভক্ত, পাথরের ভিত্তির উপর নির্মিত এবং এবং পাথরের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দরজার পূর্বদিকের অংশটিতে জাফর খান গাজী, তাঁর দুই পুত্র আইন খান গাজী ও ঘাইন খান গাজী এবং তৃতীয় পুত্র বড় খান গাজীর পত্নীর সমাধি আছে অন্য অংশটিতে আছে বড় খান এবং তাঁর দুই পুত্র রহিম খান ও করিম খানের সমাধি। পূর্বদিকের অংশে চারটি দ্বারপথ আছে যেগুলির নিম্নাংশে মন্দিরের ছোট অনুকৃতি এবং যক্ষ পরিবৃত দেবদেবীর উৎকীর্ণ মূর্তি আছে যদিও সেগুলি নানাভাবে ঘর্ষণের ফলে বহুলাংশে অস্পষ্ট। পূর্ব ও উত্তরদিকের প্রবেশ পথের নিকটে বিষ্ণু, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রাম, কৃষ্ণ, নৃসিংহ, বরাহ প্রভৃতির ভগ্নমূর্তি দেখা যায়। দেওয়ালগুলিকে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে সেখানে ভাস্কর্যসমন্বিত প্রস্তরখণ্ডগুলিকে উল্টিয়ে গাঁথা হয়েছে। দরগার পশ্চিম অংশের বহির্ভাগে দেখা যায় যে কুড্যস্তম্ভগুলির দুদিকে পাথরের ভাস্কর্যময় ফলকগুলিকে উল্টিয়ে ব্যবহার করে কয়েকটি কক্ষার সৃষ্টি করা হয়েছে। এই অংশের অভ্যন্তরভাগের দেওয়ালে প্রাক্-বঙ্গলিপি পর্যায়ের লিপিতে উৎকীর্ণ কয়েকটি লেখের আভাস, যেগুলি আদিতে প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ চিত্রাবলীর কাহিনীসমূহের পরিচায়ক ছিল। (দ্রষ্টব্য: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'সপ্তগ্রাম', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৫তম খণ্ড, পৃঃ ১৭-২১)। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সম্ভবত এখানে আদিতে একটি বৈষ্ণব মন্দির ছিল, দরগার পূর্বদিকের অংশটি ছিল ওই মন্দিরের গর্ভগৃহ এবং পশ্চিমের অংশটি ছিল মণ্ডপ। পশ্চিমাংশে একটি ক্ষুদ্র শিখর সম্ভবত একটি অঙ্গশিখর, ও একটি মূর্তির অবশেষ দেখা যায় যার পশ্চাদভাগে আরবীয় ভাষায় রচিত একটি লেখ আছে। মূর্তির অবশেষ থেকে সর্পপরিবৃত যে পদযুগলের আভাস পাওয়া যায় তা থেকে বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেছিলেন যে এটি সম্ভবত জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি ছিল।

ওই একই চত্বরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত মসজিদটিও পূর্ববর্তী আমলের মন্দিরের মালমশলা দিয়ে তৈরি। মসজিদটি আয়তাকার, পার্শ্বশালা বিশিষ্ট, পুরু স্তম্ভের উপর রচিত পাঁচটি খিলানসহ। দুদিকে দুটি ছোট কুলুঙ্গি। আগে মসজিদটিতে দশটি গম্বুজ ছিল। এখন গম্বুজের সংখ্যা ছয়টি। মসজিদটি উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত। যে পুরু স্তম্ভগুলির দ্বারা মসজিদের ছাদ ধরা আছে সেগুলি দুটি সারিতে বিভক্ত। উত্তর দিক থেকে ধরলে দ্বিতীয় স্তম্ভটিতে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট উৎকীর্ণ বুদ্ধমূর্তির সারি লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে মসজিদের পিছনের দেওয়ালে চারটি মিহরাব আছে। উত্তর দিক থেকে দ্বিতীয়টি পূর্ববর্তী মন্দিরের দ্বার অংশ দিয়ে তৈরি। তৃতীয়টির উপরিভাগ তৈরি হয়েছে একটি মূর্তির পাদপীঠ অংশ দিয়ে, এবং দুই পার্শ্বে একটি নবগ্রহ পরিমণ্ডল এবং একটি মূর্তির চালচিত্র উল্টো করে গাঁথা হয়েছে। আরবীয় ভাষায় রচিত ছয়টি লেখ মসজিদের পশ্চিম দেওয়ালে উৎকীর্ণ আছে এবং পূর্ববর্ণিত দরগা অংশে আছে দুটি লেখ। ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ একটি লেখে তুর্কী জাফর খান গাজী কর্তৃক ওই মসজিদ নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। অপর একটি লেখে (১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দ) ফিরুজ শাহের রাজত্বকালে খান মুহম্মদ জাফর খান কর্তৃক (ইনি পূর্বোক্ত লেখের জাফর খান নন) দার-উল-খৈরৎ নামক একটি মাদ্রাসা স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে। জাফর খান গাজীর দরগা ও মসজিদের আদি নির্মাণকাল ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দ হলেও সমগ্র চত্বরটিকে বর্তমানের আকার দেওয়া হয় ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে।

ত্রিবেণীতে সরস্বতী ও ভাগীরথীর সংযোগস্থলের সামান্য উত্তরে ত্রিবেণী ঘাট। তার নিকটেই কয়েকটি মন্দির যেগুলি ভাস্তারার জমিদার ছকুরাম সিংহ কর্তৃক ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। প্রধান মন্দিরটির নাম বেণীমাধব মন্দির। এই চত্বরের গঙ্গার ঘাটে পাল আমলের চারটি মূর্তি পাওয়া যায় যেগুলি ব্রহ্মা, গঙ্গা, হরগৌরী ও গণেশের। বেণীমাধবের সঙ্গে আরও যে কটি মন্দির আছে সেগুলির নাম শশিশেখর, বিশ্বেশ্বর, রামেশ্বর, চণ্ডীশ্বর, গঙ্গাধর ও যোগেশ্বর। মন্দিরগুলি অষ্টকোণ ও গম্বুজাকার শিখরবিশিষ্ট। মুকুন্দদেব ঘাটটি পঞ্চদশ শতকে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব কর্তৃক নির্মিত।

দমদমা

পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম। এখানকার ভট্টাচার্য পাড়ায় উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি শিবমন্দির আছে। মন্দিরগুলি চারচালা। দুটি মন্দির ইতিমধ্যেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। বৈদ্যনাথ শিবের মন্দিরটি অবশ্য আটচালা। এছাড়া এখানকার বুড়িমা দালানও উল্লেখযোগ্য।

দশঘরা

ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত বিখ্যাত গ্রাম, ধনিয়াখালি থেকে ৮ কিমি পশ্চিমে অবস্থিত, তারকেশ্বর রেলস্টেশন থেকে দূরত্ব ১৩ কিমি। গুড়াপ রেলস্টেশন থেকে, বর্ধমান থেকে এবং চুঁচুড়া থেকে দশঘরা বাসে যাওয়া যায়। ধনিয়াখালি ব্লকের দশঘরা-১ পঞ্চায়েত এলাকায় দশঘরা গ্রামটি (বর্তমানে গঞ্জ) অবস্থিত। জে এল নম্বর ২৯। এখানকার পুরাতন ভূম্যধিকারীরা বারদুয়ারী রাজবংশ হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কিছু পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ এবং বিশালাক্ষী পুষ্করিণী তাঁদের কীর্তির স্মারক হিসাবে কথিত। দশঘরার বিখ্যাত বিশ্বাস পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা জগমোহন বারদুয়ারী রাজবংশের রামনারায়ণ পালচৌধুরীর বদান্যতায় বসতি স্থাপন করেন। তাঁর বংশধর সদানন্দ বিশ্বাস ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে গোপীনাথের বিখ্যাত পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মাণ করেন। পশ্চিমমুখী এই মন্দিরের পরিমাপ ২০ বর্গফুট। মন্দিরটি অত্যন্ত যত্ন সহকারে রক্ষিত। তিন দিকে বর্ণাঢ্য 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণ। দেবতা রামায়ণের কাহিনী, রাজদরবারের দৃশ্য, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী মৃৎফলকের উপর অলঙ্কৃত। মন্দিরের সামনে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি চারদিক খোলা খিলানযুক্ত মণ্ডপ বর্তমান। বিশ্বাস পরিবারের শিবমন্দির অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত। প্রথাগত আটচালা মন্দির, বাঁকানো স্তরযুক্ত কার্নিস। সম্মুখভাগের দেওয়ালে পত্রপুষ্পের অলঙ্করণ। সামান্য 'টেরাকোটা'র কাজ আছে। এছাড়া বিশ্বাসদের প্রতিষ্ঠিত চারচালা দোলমঞ্চ, আটকোণা রাসমঞ্চ ও একটি দুর্গাদালান শেষ অষ্টাদশ শতকে নির্মিত। সব কয়টিতেই স্তম্ভ ও খিলানের কারিগরি লক্ষণীয়। বিশ্বাস পরিবারের নহবতখানা, বৈঠকখানা ও কাছারিবাড়ি আজও বিদ্যমান। দশঘরার পুরাকীর্তির ক্ষেত্রে বিপিনকৃষ্ণ রায়ের দানও অসামান্য। বিপিনকৃষ্ণ (১৮৫১-১৯১১) কলকাতা বন্দরের নামকরা স্টিভেডর ছিলেন। দশঘরায় রাজভবনের ফটকের ন্যায় বিরাট ক্লকটাওয়ার সমন্বিত ফটক ও বিরাট বাড়ি, ঠাকুরবাড়ি, দুর্গাদালান, মন্দির, চিকিৎসালায়, স্থায়ী রাসমঞ্চ প্রভৃতি নির্মাণ করে তিনি দশঘরা গ্রামটিকে বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেন। তিনি একটি ঝিলও খনন করান এবং ঝিলের চারদিকে রেলিং দিয়ে ঘেরা উদ্যানের মধ্যে মাননীয় অতিথিদের আবাসস্থল হিসাবে একটি সুরম্য দ্বিতল ভবন নির্মাণ করেন যা ব্রাডলিবার্ট বাংলো নামে পরিচিত। রায় পরিবার কর্তৃক উনিশ শতকের শেষের দিকে প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরটিও স্থাপত্যের দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। পশ্চিমমুখী এই মন্দিরটির শিখরদেশ গম্বুজাকার, উল্লম্ব রেখাযুক্ত। সামনের বারান্দার ছাদ চালা ধরনের। সম্মুখভাগে সামান্য 'টেরাকোটা'র কাজ আছে। দশঘরার অপরাপর মন্দিরের মধ্যে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রামজয় মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দের মন্দিরটি

সমতল ছাদ, উদ্গত কার্নিস এবং তদুপরি নাতিউচ্চ পরট বিশিষ্ট। বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত একটি প্রথাগত আটচালা শিবমন্দির ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। পুরুস্তম্ভের উপর গঠিত তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ। তার নীচে বক্রবেষ্টনী। সম্মুখভাগে সুন্দর 'টেরাকোটা'র কাজ। ওই পরিবারেরই প্রতিষ্ঠিত বাসুলি মন্দিরের নির্মাণকাল মধ্য-অষ্টাদশ শতক। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, জোড়-বাংলা ধরনের। কার্নিসের নীচে এবং খিলান পথ সমূহের উপরে বক্রবেষ্টনী। কৌণিক স্তম্ভগুলি খাঁজকাটা। সম্মুখভাগে তেমন কোন অলঙ্করণ নেই। দশঘরার বুড়োশিব ও বিশালাক্ষী দেবী গ্রাম্য দেবতারূপে পূজিত হন। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে প্রতি বছর বুড়োশিবের গাজন হয়।

দাইনার

আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানা ও খানাকুল ১নং পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত গ্রাম। জে এল নং ৪৬। খানাকুল থেকে রিকশায় যাওয়া যায়। এখানকার পুরাকীর্তিসমূহের মধ্যে একটি শীতলা-মনসার মন্দির ও একটি ধর্মঠাকুরের মন্দির উল্লেখযোগ্য। প্রথম মন্দিরটি উনিশ শতকের শেষের দিকে নির্মিত দক্ষিণমুখী সমতল ছাদ ও উচ্চ আলিসাযুক্ত দালান ধরনের। সামনে বারান্দা। খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশদ্বার। স্তম্ভের উপর গঠিত খিলানগুলি পলকাটা। খিলানগুলির মাথায় ফুলের ছাঁচ কাটা। মন্দিরটি স্থানীয় জমিদার ফকিরদাস দত্ত কর্তৃক নির্মিত। ধর্মঠাকুরের মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ। স্থানীয় পণ্ডিতবংশ কর্তৃক নির্মিত। এই মন্দিরটিও সমতল ছাদ ও গোলাকার স্তম্ভের উপর গঠিত খিলানযুক্ত দালান ধরনের, বহুলাংশেই পূর্ববর্তী মন্দিরটির অনুরূপ।

দাঁতড়া

দাদপুর থানার অন্তর্গত পোলবা-দাদপুর ব্লকের গোস্বামী-মালিপাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১১৭। চুঁচুড়া থেকে সহজেই দাঁতড়া যাওয়া যায়। গ্রামটি কেদারমতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই গ্রামে ভট্টাচার্যদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির এবং চৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির আছে। অপর কয়েকটি মন্দির যেমন ভৈরবনাথ, কাশীনাথ প্রভৃতি বহু পূর্বেই বিলুপ্ত হয়েছে।

দাসপুর

কালনা-গুড়াপ বাসরাস্তার উপর অবস্থিত গ্রাম। এখানকার বাগদীপাড়ায় উনিশ-শতকে প্রতিষ্ঠিত দুটি আটচালা শিবমন্দির আছে, একটি বুড়োশিবের মন্দির নামে পরিচিত। নাথপাড়ায় সমতল ছাদবিশিষ্ট একটি দালান ধরনের শিবমন্দির আছে। এটিরও নির্মাণকাল উনিশ শতক।

দিগসুই

মগরা থানা ও চুঁচুড়া-মগরা ব্লকের অন্তর্গত দিগসুই নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত জে এল নম্বর ১২। মগরা-কোড়লা বাসরাস্তার উপর দিগসুই অবস্থিত। দিগসুই গ্রামের ব্রজলাল সুর প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি আটচালা শিবমন্দির ভগ্নাবস্থায় বর্তমান। তবে দিগসুই-এর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সুরবংশের কুলদেবতা যাদবরায়ের নবরত্ন মন্দির। মন্দিরটি আকারে বৃহৎ, বাকসার মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়, নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতক। শিখরগুলি রেখ ধরনের খাঁজকাটা। সম্মুখে সামান্য 'টেরাকোটা'র কারুকার্য বর্তমান। এই মন্দিরে একটি প্রস্তরফলকে প্রতিষ্ঠিতা রামকান্ত, প্রতিষ্ঠাকাল শকাব্দ ১৭১৪ (১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ) এবং স্থপতি নারায়ণ মিস্ত্রীর নাম লেখা আছে। এখানে হট্টেশ্বর মহাদেবের একটি প্রাচীন মন্দির আছে। মন্দিরটি শিবতলায় অবস্থিত, এক শিখর বিশিষ্ট, স্থানীয় নিয়োগীবংশ কর্তৃক ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এটি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত হয়। শিবতলায় আরও একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দ এবং ১৯৬৭ ও ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত। মাঝেরপাড়ায় দুটি আটচালা শিবমন্দির আছে, নির্মাণকাল উনিশ শতক।

দিহিবাতপুর

আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত দিহিবাতপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১২। দেউলপাড়া থেকে এক মাইলেরও কম দূরত্ব। এখানে সরকার বংশ প্রতিষ্ঠিত দুইটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির আছে, রেখধরনের খাঁজকাটা শিখর ও তিনটি প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট প্রথমটি পশ্চিমমুখী, ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, দৈর্ঘ্যে বারো ফুটের কিছু বেশি, প্রস্থে এগার ফুট। সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর দেবতা, রামায়ণের কাহিনী, রাজদরবারের দৃশ্য ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী। দ্বিতীয় মন্দিরটি ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত, সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর উদ্ভিজ্জধর্মী অল্প কিছু কারুকার্য।

দীঘা

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত দ্বারবাসিনী পঞ্চয়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৮৮। এটি দ্বারবাসিনীর পাশ্ববর্তী গ্রাম। এখানে একটি ভগ্ন প্রস্তরমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যা বর্তমানে বৈদ্যবাটীর সারদাচরণ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

দীঘানেশ্বর

পোলবা-দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত সাটীথান পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৭। এই গ্রামের সর্বেশ্বর শিবমন্দির উনিশ শতকে স্থানীয়

বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এখানে একটি পুরাতন ছোট মসজিদও আছে।

দুর্গাপুর

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত খাজুরদহ মেলকী পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৬৬। গুড়াপ রেলস্টেশন থেকে ভাস্তারা হয়ে দুর্গাপুর যেতে হয়। ভাস্তারা থেকে দুর্গাপুরের দূরত্ব ৫ কিমি। এখানে সুরবংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ছয়টি আটচালা শিবমন্দির আছে, যেগুলির মধ্যে দুটি জোড়া আটচালা। এগুলির মধ্যে একটি একক ও একটি জোড়া মন্দিরের নির্মাণকাল যথাক্রমে ১৭৭৪ ও ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দ। বাকি মন্দিরগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত। মন্দিরগুলির সম্মুখভাগে কিছু কিছু 'টেরাকোটা'র কাজ আছে। প্রধানত রামায়ণের কাহিনী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু।

দেউলপাড়া

আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। জে এল নং ১৩। দেউলপাড়া তারকেশ্বর রেলস্টেশন থেকে ৮ কিমি দূরে অবস্থিত। এখানে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত কয়েকটি মন্দির আছে। সর্বপ্রাচীন মন্দিরটি একটি শিবমন্দির, স্থানীয় দেবনাথ বংশ কর্তৃক ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি প্রথাগত আটচালা উত্তরমুখী, সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর উদ্ভিজ্জধর্মী অল্পকিছু চিত্রবিশিষ্ট। দ্বিতীয় মন্দিরটিও আটচালা, বর্তমানে পরিত্যক্ত, প্রাগুক্ত দেবনাথ বংশ কর্তৃক ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী দেখা যায়। তৃতীয় মন্দিরটি জয়চণ্ডী মন্দির নামে পরিচিত। এটি স্থানীয় দে-বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। নির্মাণকাল ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি আটচালা, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ সহ সম্মুখে মৃৎফলকের উপর দেবতা, রামায়ণের কাহিনী, রাজদরবারের দৃশ্য, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী। এটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত। চতুর্থ মন্দিরটিও আটচালা, প্রাগুক্ত দে বংশ প্রতিষ্ঠিত, নির্মাণকাল ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ। বর্তমানে পরিত্যক্ত। সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর রামায়ণের কাহিনী। নানা মূর্তি, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ বর্তমান।

দেপাড়া

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত ইলছোবা-দাসপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৪১। দেপাড়া পাণ্ডুয়া-কালনা রাস্তার উত্তরদিকে

অবস্থিত। জনশ্রুতি অনুযায়ী রাজা দেবপালের নাম থেকেই দেবপাড়া তথা দেপাড়া হয়েছে। এই দেবপাল সুপ্রসিদ্ধ পালবংশীয় রাজা কিংবা কোন স্থানীয় রাজা ছিলেন সেকথা বলা যায় না। এখানে একটি সুবৃহৎ দীঘি দেবপালের দীঘি নামে পরিচিত। দীঘির ধারে একটি পুরাতন মসজিদের সামান্য কিছু অবশেষ আছে এই মসজিদগাত্রে একটি আরবী লেখ ছিল। এছাড়া এখানে সুপ্রসিদ্ধ পীর হাফেজ আফতাবুদ্দীন ও মাণিক পীর সাহেবের সমাধি আছে। পার্শ্ববর্তী আঁশুয়া গ্রামে (জে এল নম্বর ১৪৫) পীর সুফী সাহেবের সমাধি ও একটি মসজিদ আছে। মসজিদের ভিতরে একটি প্রস্তরে খোদিত রসুলে কদম নামক পদচিহ্ন আছে।

দেবানন্দপুর

কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মভূমি, ব্যাণ্ডেল রেলস্টেশনের পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার উত্তরপাড়ার চারটি আটচালা মন্দির আছে, তিনটির প্রতিষ্ঠাকাল উনিশ শতক, একটিতে ১৭৬৪ তারিখ দেওয়া আছে। মাঝেরপাড়ায় একটি আটচালা রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও একটি আটচালা চণ্ডীমন্দির আছে। উভয়েরই নির্মাণকাল উনিশ শতক। একই সময়ে প্রতিষ্ঠিত একটি দোলমঞ্চ **ব্রাহ্মণপাড়ায়** অবস্থিত। এটি আটকোণা ও গম্বুজাকৃতি **শিখরবিশিষ্ট।**

দ্বারবাসিনী

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত দ্বারবাসিনী নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। জে এল নম্বর ৮৯। পাণ্ডুয়া থেকে ১০ কিমি দূরে কেদারমতী নদীর বাম তীরে দ্বারবাসিনীর অবস্থান। মগরা-খানপুর রাস্তা থেকে দ্বারবাসিনী যাওয়ার পথ বেরিয়ে গেছে। এখন চুঁচুড়া থেকেও সহজে যাওয়া যায়। আগে এখানে বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলপথের স্টেশন ছিল যে পথে এখানকার বিখ্যাত বালি চালান যেত। দ্বারবাসিনী আগে নীলচাষের জন্যও প্রসিদ্ধ ছিল। এখনও দক্ষিণপাড়া এলাকায় একটি নীলকুঠির অবশেষ দেখা যায়। দ্বারবাসিনীর সুবর্ণবণিক সম্প্রদায় যে একদা খুবই সমৃদ্ধ ছিল তা তাদের অট্টালিকাসমূহের অবশেষ থেকে অনুমান করা যায়। দ্বারবাসিনী এবং পার্শ্ববর্তী পুনাজগড় থেকে অনেকগুলি পাল-সেন আমলের মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে যা থেকে অনুমান করা যায় যে দ্বারবাসিনী একদা মহানাদ ত্রিবেণী-সপ্তগ্রামের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলভুক্ত ছিল। মূর্তিগুলির অধিকাংশই এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। কথিত আছে যে এখানে পাল উপাধিধারী একটি সদগোপ বংশ রাজত্ব করতেন। ভিন্ন জনশ্রুতি অনুযায়ী এখানকার পালেরা বিখ্যাত পাল রাজবংশেরই একটি শাখা বংশ ছিলেন এবং রাজা দ্বারপালের নাম

থেকেই দ্বারবাসিনী নামকরণ হয়েছে। দক্ষিণপাড়ায় একটি ঢিবিকে গড় হিসাবে চিহ্নিত করা হয় যেখানে লুপ্ত হয়ে যাওয়া অট্টালিকাসমূহের সামান্য অবশেষ, কিছু বুজে যাওয়া কূপ প্রভৃতির স্মারক পাওয়া যায়। কয়েকটি পুষ্করিণীর নামও তাৎপর্যপূর্ণ যেমন কামনা, পাপহরণ, জীবৎকুণ্ড, চন্দ্রকূপ প্রভৃতি। এখানে মোগলভিটা নামক স্থানে কিছু প্রাচীন ঘরবাড়ির নিদর্শন আছে। গ্রামের মধ্যে প্রাচীন প্রস্তরনির্মিত একটি বারাহী মূর্তি আছে। এখানকার বিষহরি মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই বিষহরি ও সেনেটের বিশালাক্ষী বিশেষ লোকধর্মীয় কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ, উভয়ে দুই ভগিনী হিসাবে কল্পিত। দেবীর সেবার জন্য কুচুপালের নবাবের কিছু জমি দান করা আছে। বিষহরি দেবী দ্বিভূজা, কৃষ্ণবর্ণা, বামে মহাদেব দণ্ডায়মান। জ্যৈষ্ঠ মাসে নাগপঞ্চমী দিবসে এখানে বিষহরির ঝাঁপান অনুষ্ঠিত হয়। কেদারমতীর তীরে মন্দির সম্মুখে একটি মেলাও বসে। মন্দিরটি সমতল ছাদবিশিষ্ট, নির্মাণকাল উনিশ শতক। এখান থেকে প্রভাসচন্দ্র পাল কর্তৃক আবিষ্কৃত যে সকল মূর্তি আশুতোষ মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে পাঁচ প্রকারের বিষ্ণুমূর্তি এবং বরাহ, সূর্য ও চণ্ডীমূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বারবাসিনীতে কয়েকটি পীরের আস্তানাও আছে।

দ্বারহাট্টা

হরিপাল থানা ও ব্লকের অন্তর্গত দ্বারহাট্টা পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৪৫। হরিপাল রেলস্টেশন থেকে ৫ কিমি দূরবর্তী, বাসে যাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রাম্যদেবতা দ্বারিকাচণ্ডীর নামানুসারে এই গ্রামের নামকরণ হয়েছে। এই গ্রামে একদা ডাচ ও ডেনীয়দের বাণিজ্যকুঠি ছিল। পূর্বে দ্বারহাট্টা হুগলী জেলার একটি মহকুমার সদর ছিল। শ্রীরামপুর ইংরাজদের হাতে এলে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বারহাট্টার পরিবর্তে শ্রীরামপুরের নামেই পূর্বাঞ্চলীয় মহকুমার নামকরণ হয়। দ্বারহাট্টার রাজরাজেশ্বর ও দ্বারিকাচণ্ডীর মন্দির কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত। রাজরাজেশ্বরের মন্দির অপূর্বমোহন সিংহরায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, নির্মাণকাল ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দ এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত। মন্দিরটি আটচালা। দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৪ ফুট এবং প্রস্থে ২১ ফুট। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট। মৃৎফলকের উপর অঙ্কিত অসংখ্য চিত্র মন্দিরটির শোভাবর্ধন করেছে। রামরাবণের যুদ্ধ, কৃষ্ণের নৌকাবিলাস, দুর্গা, মহাবীর, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কৃষ্ণ, অর্জুন প্রভৃতির মূর্তি এবং পর্তুগীজ সৈন্যদের চিত্র খুবই বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী। দ্বারিকাচণ্ডীর মন্দিরটিও সিংহরায়দের নির্মিত। এটিও আটচালা মন্দির ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দ্বারিকাচণ্ডী দ্বিভূজা দুর্গামূর্তি। মন্দিরটির বর্তমান ভগ্নদশা। যে সামান্য 'টেরাকোটা' শিল্পের নিদর্শন এখনও দেখা যায় তা খুবই উচ্চমানের।

ধনিয়াখালি

হুগলী জেলার সদর মহকুমায় ধনিয়াখালি থানা আয়তনে পাণ্ডুয়ার পরে হলেও জনসংখ্যায় প্রথম। পুরাকীর্তির সংখ্যা ও গুরুত্বের বিচারে ধনিয়াখালি অগ্রগণ্য। ধনিয়াখালি ব্লকে নিম্নলিখিত পঞ্চায়েত এলাকাগুলি বর্তমানঃ গোপীনাথপুর ১ এবং ২, পারাম্বুয়া-সাহাবাজার, দশঘরা ১ এবং ২, গুড়বাড়ি, ভাস্তারা, গুড়াপ, খাজুরদহ-মেলকী, ধনিয়াখালি ১ এবং ২, বেলমুড়ি, সোমসপুর ১ এবং ২, ভাণ্ডারবাটি ১ এবং ২ ও মান্দ্রা। পুরাকীর্তির দিক থেকে চোপা, গুড়বাড়ি, গুড়াপ, সোমসপুর, কাঁকড়াকুলি, বেলমুড়ি, ভাস্তারা, গোপীনাথপুর ও দশঘরা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল স্থানের পুরাকীর্তি বর্তমান গ্রন্থে পৃথকভাবে আলোচিত হয়েছে। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের অনেকগুলি রেলস্টেশন ধনিয়াখালি থানা এলাকার মধ্যে পড়ে। চুঁচুড়া, মগরা, বর্ধমান, শেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর, তারকেশ্বর ও আরামবাগ থেকে ধনিয়াখালির নানাস্থানে যাওয়ার বাস রাস্তা আছে। খোদ ধনিয়াখালিতে অবশ্য পুরাকীর্তির খুব বেশি নিদর্শন পাওয়া যায় না। এখানে বুড়োশিবের মন্দির সবচেয়ে প্রাচীন। আটচালা এই মন্দিরটি ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এটির সংস্কার করেন। দ্বিতীয় মন্দিরটিও আটচালা শিবমন্দির। সামনে পরবর্তীকালে নির্মিত একটি ঢালু বারান্দা আছে। মন্দিরটি ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নিত্যানন্দ রক্ষিত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ধনিয়াখালির সীমার মধ্যে অবস্থিত ঘনরাজপুরে সিদ্ধেশ্বরী কালীর একটি মন্দির আছে। এই সিদ্ধেশ্বরী কালী যদিও প্রাচীন স্থানীয় দেবতা, মন্দিরটি বিংশ শতাব্দীতে নির্মিত। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রস্তুত ভ্যালেন্টাইনের মানচিত্রে ধনিয়াখালিকে সলিমবাদ (বর্ধমান জেলা) হুগলীর রাস্তার উপর নির্দিষ্ট করা হয়েছে। রেনেলের অ্যাটলাসে (প্লেট সপ্তম, ১৭৭৯) DENEACOLLY-র পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্য অষ্টাদশ শতকে এখানে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটি বস্ত্রবয়নের কারখানা ছিল। ধনিয়াখালি মূল এলাকায় হাটখোলায় অবস্থিত প্রাগুক্ত বুড়োশিবের মন্দির ছাড়াও উনিশ শতকে নির্মিত আরও একটি শিবমন্দির আছে। আরও তিনটি আটচালা শিবমন্দির যথাক্রমে স্কুলপাড়া, রক্ষিতপাড়া ও চাঁপাবেড়ে অবস্থিত। রক্ষিতপাড়ার মন্দিরটি জগদীশ্বর শিব এবং চাঁপাবেড়ের মন্দিরটি সদাশিব মন্দির নামে পরিচিত। রক্ষিতপাড়ায় একটি পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ আছে, নির্মাণকাল ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। বাজার অঞ্চলে একটি জামা মসজিদ আছে। মসজিদটি এক গম্বুজ, নির্মাণকাল উনিশ শতক। বিভিন্ন বাস রাস্তা ছাড়াও হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে শিবাইচন্ডী স্টেশনে নেমে ধনিয়াখালি যাওয়া যায়।

ধরমপুর

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত গোপীনগর ১ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৪৫। তারকেশ্বর রেলস্টেশন থেকে আট কিমি দূরত্বে গোপীনগর, সেখান থেকে দেড় কিমি মত পথ অতিক্রান্ত করে ধরমপুর যেতে হয়। এখানে কোলে বংশ প্রতিষ্ঠিত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নির্মিত একটি পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। বর্তমানে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা। মন্দিরগাত্রে উদ্ভিজ্জধর্মী 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণ আছে।

নন্দীগ্রাম

হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের বৈঁচি স্টেশন থেকে যাওয়া যায়। এখানকার মাঝেরপাড়ার রামনাথ শিবের আটচালা মন্দির ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত।

নমাজগ্রাম

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত ক্ষীরকুণ্ডী-নমাজগ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১০৪। এখানকার প্রাচীন ইদগাহ পাণ্ডুয়া থানার বৃহত্তম ইদগাহ। এখানকার মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। পাণ্ডুয়া থেকে সরাসরি নমাজগ্রামে যাওয়া যায়।

নসীবপুর

সিঙ্গুর থেকে পুরুষোত্তমপুর হয়ে নসীবপুরে যেতে হয়। এখানে উনিশ শতকে সিংহরায়দের প্রতিষ্ঠিত একটি আটচালা শিবমন্দির আছে।

নিত্যানন্দপুর

মগরা থানা ও বলাগড় ব্লকের অন্তর্গত নিত্যানন্দপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১২৭। ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া রেলপথে ত্রিবেণীর পরের স্টেশনটিই হচ্ছে নিত্যানন্দপুর, এখন নাম বদল করে কুন্তীঘাট হয়েছে। নিত্যানন্দপুর গ্রামটি কুন্তীঘাট স্টেশনের দেড় কিমি পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ভট্টাচার্য পরিবার কর্তৃক ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিবের দুটি পশ্চিমমুখী আটচালা মন্দির আছে। মন্দির দুটি একদ্বারবিশিষ্ট। সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর পক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী বর্তমান। মন্দিরদ্বয় যথাক্রমে ঈশানেশ্বর ও ত্র্যম্বকেশ্বর মন্দির নামে পরিচিত। বৈষ্ণব সাধক রঘুনাথদাস গোস্বামী শ্রীমদ্ নিত্যানন্দপ্রভুর এখানে আগমন স্মরণীয় করার জন্য গ্রামের নিত্যানন্দপুর নামকরণ করেন। প্রখ্যাত পণ্ডিত চন্দ্রশেখর বাচস্পতি নবাব সরফরাজ খান কর্তৃক জমিদারি প্রাপ্ত হয়ে এই গ্রামে বাস শুরু করেন। তাঁর পৌত্র শঙ্করনারায়ণ ভট্টাচার্য এই মন্দিরদ্বয়ের প্রতিষ্ঠাতা। যে শিল্পী এই মন্দিরদ্বয়ের 'টেরাকোটা'র

কাজ করেছিলেন তাঁর নাম চিন্তামণি দে। অধিকাংশ মন্দিরের ক্ষেত্রেই স্থপতি বা শিল্পীর নাম অজানা থাকে। এই মন্দিরদ্বয়ের ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম দেখা যায়।

পলাশী

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম, বেলমুড়ি ও গুড়াপ রেলস্টেশনদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত, হাজিগড় স্টেশনের পশ্চিমে। এই গ্রামের পাশ দিয়ে ঘিয়া নদী প্রবাহিত। এখানে পতিদুর্গা অর্থাৎ শিবদুর্গার মন্দির ও মূর্তি আছে। শিবের পদতলে যণ্ড এবং দুর্গার পদতলে সিংহ বিরাজিত। শিবের দক্ষিণে নন্দী এবং দুর্গার বামে জয়া দণ্ডায়মান। পূজারী ব্রাহ্মণ নয়, হাড়িজাতীয়। আশ্বিন মাসে ও পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে বিরাট মেলা বসে। মন্দিরটি সপ্তদশ শতকে নির্মিত বলে কথিত। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে গুড়াপনিবাসী বিজয়কৃষ্ণ নন্দী এটিকে সংস্কার করেন।

পাউনান

পোলবা-দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত পোলবা পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৯৫। চুঁচুড়া স্টেশন থেকে পশ্চিমমুখী পথ পাউনান ভেদ করে গেছে। চুঁচুড়া থেকে সহজেই বাসে যাওয়া যায়। এখানকার স্থানীয় দেবতা টাটেশ্বরনাথের মন্দির অষ্টাদশ শতকে নির্মিত। মন্দিরপার্শ্বে পুষ্করিণী এবং সম্মুখে ভোগমন্দির প্রভৃতি বর্তমান যেগুলি অবশ্য পরবর্তীকালে তৈরি করা হয়েছে। গ্রামদেবী হিসাবে এখানে সিদ্ধেশ্বরী কালী পূজিতা হন। টাটেশ্বরনাথের মন্দির আটচালা, সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির সমতল ছাদবিশিষ্ট, তিনটি খিলান যুক্ত প্রবেশদ্বার সহ। পূর্ব বারওয়ারিতলায় উনিশ শতকে হালদারদের প্রতিষ্ঠিত একটি আটচালা শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ননীলাল হালদার কর্তৃক সংস্কৃত হয়। ছোটসান নামক দীঘির পাড়ে তিনটি উনিশ শতকে নির্মিত আটচালা শিবমন্দির আছে। পশ্চিমপাড়ায় একটি দালান ধরনের জীর্ণ শিবমন্দির বর্তমান। নন্দী ও সুরদের প্রতিষ্ঠিত দুটি ঠাকুরদালানও এই গ্রামে বর্তমান।

পাকরি

মগরা থানার অন্তর্গত গ্রাম, মগরা থেকে বাসে যাওয়া যায়। এখানকার কালীতলায় হালদার বংশ কর্তৃক ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি আটচালা শিবমন্দির আছে।

পাণ্ডুগ্রাম

গোঘাট থানা ও ব্লকের অন্তর্গত শ্যামবাজার পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৩৬। এখানকার শ্রীধর মন্দির উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি দালান

ধরনের, সমতল ছাদযুক্ত যদিও কার্নিসগুলি বাঁকানো। পাণ্ডুগ্রামের দূরত্ব কামারপুকুর থেকে ৬ কিমি।

পাণ্ডুয়া

হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের উপর পাণ্ডুয়া রেলস্টেশন। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড পাণ্ডুয়ার উপর দিয়ে চলে গেছে। শহরের এলাকা ৩.৭৫ বর্গ কিলোমিটার। এখানকার পুরাকীর্তিসমূহের নিদর্শনের প্রাচুর্য দেখে মনে হয় যে পাল-সেন আমলে এই এলাকার যথেষ্ট সমৃদ্ধি ছিল। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে পাণ্ডুয়া তুর্কী অধিকারে আসে। পাণ্ডুয়ার বিখ্যাত মিনারটি গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত, সাধারণভাবে ফিরুজ মিনার নামে প্রসিদ্ধ। গোলাকার ভিত্তির উপর নির্মিত পাঁচতলা এই মিনারটির প্রতিটি তলের পরিমাপ সমান নয়, ভিত্তিমূলের পরিধি ৬০ ফুট এবং সর্বোচ্চ তলের ১৫ ফুট। মোট উচ্চতা ভূমি থেকে ১২৫ ফুট। উপরের অংশটি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ভেঙ্গে গেলে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই অংশটিকে আবার নূতন করে গড়ে তোলা হয় যার ফলে উচ্চতা আরও দুই ফুট বেড়ে ১২৭ ফুট হয়। মিনারটির উপরে ওঠার জন্য একটি গোলাকার সিঁড়ি আছে। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী এটি শাহ সুফী কর্তৃক নির্মিত, নির্মাণকাল ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ। ফিরুজ মিনারের অনতিদূরে বাইশ দরওয়াজা মসজিদের অবশেষ দেখা যায়। আয়তাকার এই মসজিদের ছাদটি বিনষ্ট হয়েছে। আগে এখানে ৬৩টি গম্বুজ ছিল যা ব্লকমান গণনা করেছিলেন। নাম যদিও বাইশ দরওয়াজা, এখানে অশ্বক্ষুরাকৃতি খিলানের প্রবেশদ্বারের সংখ্যা ২৩টি। খিলানযুক্ত স্তম্ভনিচয়ের দ্বারা কেন্দ্রশালা ও পার্শ্বশালার বিভাজনের চিহ্ন এখনও দেখা যায়। মিহরাবের দুদিকে ১১টি কুলুঙ্গি। স্তম্ভগুলি পাথরের, বিভিন্ন নকশার আনুভূমিক বেষ্টনীযুক্ত। অনেকগুলি কোন পুরাতন মন্দির থেকে সংগৃহীত। দেওয়াল এবং খিলান ছোট হাল্‌কা রঙের ইঁটের তৈরি। মিহরাব অংশে কিছু 'টেরাকোটা'র কাজ আছে। মসজিদের বাইরে কয়েকটি পাথরের অসমাপ্ত স্তম্ভ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। উত্তরপশ্চিম কোণে একটি সিঁড়িবিশিষ্ট কক্ষের অবশেষ পাওয়া যায় যা শাহ সুফীর চিল্লাখানা নামে পরিচিত। এই মসজিদে কোন লেখ পাওয়া যায়নি। নির্মাণকাল ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দ বলে অনুমিত। ফিরুজ মিনারের দক্ষিণ দিকে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের অপর পার্শ্বে শাহ সুফীর সমাধি। শাহ সুফী দিল্লীর সুলতান ফিরুজ শাহ তুঘলকের ভগ্নীর পুত্র হিসাবে কথিত। এটি বর্গাকার, বাঁকানো কার্নিস ও গোল গম্বুজযুক্ত। চারদিকে বেষ্টনী বা প্রাকার, প্রাকারের কোণে মিনার। শাহ সুফীর আস্তানার পশ্চিমে একটি বড় মসজিদ আছে। অভ্যন্তরের দেওয়ালে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধরনের

অলঙ্করণের নিদর্শন দেখা যায়। বাইরে তিনটি প্রস্তরফলকে আরবীতে লিখিত কোরাণের বাণী উৎকীর্ণ আছে। ভিতরে আর একটি প্রস্তরফলকে লিখিত আছে যে এটি ৮৮২ হিজিরায় ইউসুফ খানের রাজত্বকালে উলুখ মজলিস-ই-আলম কর্তৃক নির্মিত। অপর একটি লেখে বলা হয়েছে যে ১১৭৭ হিজিরায় এই মসজিদটি লালকুমার নাথ নামক জনৈক হিন্দু কর্তৃক সংস্কৃত হয়। পাণ্ডুয়ার বোসপাড়ায় অবস্থিত কুতুব সাহিব মসজিদ, যা বড় আউলিয়া মসজিদ নামেও পরিচিত, ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল বাদশাহ মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ফথ খান নামক জনৈক আফগান কর্তৃক নির্মিত হয়। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটির স্তম্ভগুলির উপর দিয়েই মিনারসমূহ উদ্গত হয়েছে। মধ্যস্থলের কৌণিক স্তম্ভের অনুরূপ একটি স্তম্ভ আছে। মিহরাবের উপর তীক্ষ্ণাগ্র খিলান, দুদিকে কুলুঙ্গি। পাণ্ডুয়ার বিবেকানন্দ কলোনী অঞ্চলে মধ্য-অষ্টাদশ শতকের একটি পরিত্যক্ত মসজিদ আছে। ত্রিকক্ষ বিশিষ্ট এই মসজিদটির সামনের দিকে তিনটি প্রবেশপথ, এবং দুই পাশে দুটি। মিহরাব এবং সংলগ্ন কুলুঙ্গিদ্বয় খিলানযুক্ত।

পানসেওলা

চন্দননগর মহকুমার অন্তর্গত হরিপাল ব্লকের অলিপুর-কাশীপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১২। এখানকার প্রখ্যাত মিত্র পরিবারের (এই স্থানে প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র ও সারদাচরণ মিত্রের জন্ম) ও বসু পরিবারের বিশাল অট্টালিকার জীর্ণাবশেষ বর্তমান। এখানে বসু পরিবার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ও কালীমন্দির এবং সিংহরায়দের প্রতিষ্ঠিত ছয়টি শিবমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরগুলি আটচালা ধরনের এবং সাধারণ মানের।

পারাম্বুয়া-সাহাবাজার

সদর মহকুমার ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত পারাম্বুয়া-সাহাবাজার নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত পাশাপাশি দুটি গ্রাম, পারাম্বুয়ার জে এল নম্বর ৫৮ এবং সাহাবারের ৩৬। তারকেশ্বর বা চুঁচুড়া থেকে বাসে গোপীনাথপুর হয়ে এখানে আসতে হয়। সাহাবাজারে গোলাম আলি পীরের দরগা খুবই প্রসিদ্ধ। এখানে প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির দিনে গোলাম আলির সম্মানে একটি মেলা বসে। এই পীর হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই ভক্তিভাজন এবং কথিত আছে যে মনস্কামনা সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এই পীরের পুকুরে সিন্নি অর্থাৎ বাতাসা ভাসিয়ে দিলে তা যদি ফিরে আসে তাহলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

পারুল

আরামবাগ থানার অন্তর্গত। বর্তমানে আরামবাগ পুরসভার অধীন। এখানে দুটি আটচালা মন্দির আছে। প্রথমটি রঘুনন্দন মন্দির, চক্রবর্তী বংশ কর্তৃক

প্রতিষ্ঠিত। দৈর্ঘ্যে ২৩ ফুট, প্রস্থে ২১ ফুট, নির্মাণকাল ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত। মন্দিরটি পূর্বমুখী, ভাল অবস্থায় বিদ্যমান। সম্মুখে মৃৎফলকের উপর দেবদেবী, রামায়ণের কাহিনী রাজদরবারের চিত্রাবলী ও তৎসহ পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জের অলঙ্করণ দেখা যায়। মন্দিরের তিনটি খিলানপথ। দ্বিতীয় মন্দিরটি বিশালাক্ষী মন্দির নামে পরিচিত, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সাড়ে উনিশ ফুট, নির্মাণকাল ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। এটি দক্ষিণমুখী, সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ। চিত্রাবলীর মধ্যে দেবদেবী, পশুপক্ষী ও পত্রপুষ্পের সমাহার দেখা যায়। এই মন্দির ও নিকটস্থ দিঘি স্থানীয় জমিদার রণজিৎ রায়ের কীর্তি। এই মন্দির নিয়ে একটি লোককাহিনী প্রচলিত আছে। রণজিৎ রায়ের নিকট দেবী বিশালাক্ষী প্রতিশ্রুত হন যে তিনি তাঁর কন্যা হয়ে জন্মাবেন কিন্তু যদি কোনদিন তাঁকে চলে যেতে বলা হয় তিনি তদ্দণ্ডেই চলে যাবেন। একদিন বারুণী উৎসবের সময় কন্যারূপী দেবী রণজিতের কাছ থেকে স্নান করতে যাওয়ার অনুমতি চান এবং অন্যমনস্কভাবে রণজিৎ সেই অনুমতি দেন। অতঃপর দেবী ওই দিঘির জলে চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হয়ে যান।

পুইনান

দাদপুর থানা ও পোলবা-দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত দাদপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৮। চুঁচুড়া থেকে তারকেশ্বর ও হরিপাল যাওয়ার বাসরাস্তায় পুইনান গ্রাম পড়ে। এই গ্রামে হালদার, শেঠ ও ঘোষদের কয়েকটি মন্দির আছে। এখানে হালদারদের প্রতিষ্ঠিত তিনটি আটচালা শিবমন্দির উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত। শেঠদের একটি ভগ্ন ঠাকুরদালান ছাড়াও এই গ্রামে একটি পুরাতন ধর্মরাজের মন্দির আছে। এই মন্দিরের দুই দিকে রাজরাজেশ্বরের মন্দির এবং একটি দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চ আছে। এইগুলিতে কিছু 'টেরাকোটা'র কাজ দৃষ্টিগোচর হয়। কামেশ্বরের মন্দিরও একটি পুরাতন মন্দির যেটি ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শেঠ পরিবার কর্তৃক সংস্কৃত হয়। ঘোষবংশীয়দের একটি রাধাকৃষ্ণের মন্দির এখানে আছে। হালদারদের প্রতিষ্ঠিত পূর্বোক্ত তিনটি শিবমন্দির কামেশ্বরতলায় অবস্থিত। শেঠপাড়ায় ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত একটি অষ্টকোণ শিখরযুক্ত রাসমঞ্চ বিদ্যমান। পুইনান থেকে একটি বিষ্ণুমূর্তি ও একটি ভগ্ন সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

পুনাজগড়

দ্বারবাসিনীর নিকটস্থ গ্রাম। এখান থেকে প্রভাসচন্দ্র পাল দুটি বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কার করেন। মূর্তিগুলি দশম শতকের এবং পালযুগের। একটি মূর্তি

স্থানীয়ভাবে গ্রামবাসিগণ কর্তৃক পূজিত হয়। অপর মূর্তিটি বৈদ্যবাটীর সারদাচরণ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।

পুরশুড়া

আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানা, ব্লক ও পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। এখানকার সিংহবংশ প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথ মন্দির ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি প্রথাগত আটচালা, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট। সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী বর্তমান। রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণ ও অন্যান্য দেবতা, রাজদরবারের দৃশ্য, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ এই চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু। পুরশুড়া থানার অন্তর্গত পুরাকীর্তিসমূহের জন্য ভাঙ্গামোড়া, দিহিবাতপুর, বাখরপুর দেউলপাড়া, জঙ্গলপাড়া, শোঙালুক, বৈকুণ্ঠপুর, রসুলপুর, হরিণাখালি, ইছাপুর প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

পুরুষোত্তমপুর

সিঙ্গুর থানা ও ব্লকের অন্তর্গত নসিবপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৪৭। বৈদ্যবাটী স্টেশন থেকে ৮ কিমি পশ্চিমে পুরুষোত্তমপুর অবস্থিত। এখানে সিংহরায়দের প্রতিষ্ঠিত আটচালা বিশালাক্ষী মন্দির ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। বর্তমানে ভঙ্গুর অবস্থা। সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর রামায়ণের কাহিনী, দেবতা, রাজদরবার, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণের চিত্রাবলী বর্তমান। এছাড়া নিকটবর্তী এলাকায় অষ্টাদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত একটি ডাকাত-কালী মন্দির এবং ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি শীতলা মন্দির আছে। দুটি মন্দিরই আটচালা ধরনের।

পূর্ব রামনগর

তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত এবং তারকেশ্বরের সন্নিকটবর্তী এলাকা। এখানে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত লীলাবতীর একটি ভগ্ন আটচালা মন্দির আছে।

পোলবা

সদর মহকুমার অন্তর্গত পোলবা থানা, পোলবা-দাদপুর ব্লক ও তৎসহ একই নামের পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত জে এল নম্বর ৯৬। পোলবা ব্লকে পোলবা ছাড়াও মহানাদ, আকনা, রাজহাট, আমনান, মাকালপুর, দাদপুর, সাটিথান, বাবনান, হারিট, গোস্বামী মালিপাড়া ও সুগন্ধ্যা পঞ্চায়েত এলাকা অবস্থিত। পোলবা মগরা থেকে ৮ কিমি এবং ব্যাণ্ডেল থেকে ১০ কিমি দূরত্বে অবস্থিত। এখানকার রায়, পাল ও নিয়োগী পরিবার খুবই প্রাচীন। রায় পরিবারের পত্তন করেন, শ্যাম রায়, যিনি প্রতাপাদিত্যের কর্মচারী ছিলেন বলে কথিত। তাঁর

বংশের হরচন্দ্র রায় কুচবিহারের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। তিনি পোলবায় সুরম্য অট্টালিকা, ঠাকুরদালান, নাটমন্দির এবং গঙ্গাধর শিবমন্দির স্থাপন করেন। কালক্রমে সবই বিনষ্ট হয়ে যায়। গঙ্গাধর মন্দির অতিশয় জীর্ণ হয়ে পড়লে তাঁর বংশধর প্রাণকৃষ্ণ মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন বাংলা ১৩৫৬ (ইং ১৯৪৯) সালে। পোলবার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরটি পুরাতন। এই মন্দিরটি বিনষ্ট হয়ে গেলে স্থানীয় দত্তবংশের তারিণীচরণ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এটির পুনর্নির্মাণ করেন। নিকটস্থ একটি পুষ্করিণী সংস্কারের সময় একটি প্রাচীন আমলের বাসুদেবের মূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরেই রক্ষিত আছে। এখানকার পাল পরিবারের জনার্দন পাল গোপালসাগর নামক একটি দিঘি কাটানোর সময় ধাতুনির্মিত কৃষ্ণ ও রাধার বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। বিগ্রহদ্বয় তাঁদের বংশে পূজিত হয়। জনার্দনের বংশধর কাশীনাথ পাল রাধাগোবিন্দের মন্দির, দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সেগুলি একেবারেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। দত্তবংশীয়দেরই নির্মিত একটি দুর্গাদালান হসপিটাল রোডের উপর অবস্থিত, নির্মাণকাল উনিশ শতকের শেষের দিক।

প্রসাদপুর

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত রামেশ্বরপুর-গোপালনগর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৮৫। মগরা থেকে বাসে চেপে যাওয়া যায়। এখানে পালবংশ কর্তৃক ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি পরিত্যক্ত আটচালা মন্দির আছে। পূর্বমুখী এই মন্দিরের সম্মুখভাগে দেবতা, রাজদরবারের দৃশ্য, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী মৃৎফলকের উপর উৎকীর্ণ।

ফুরফুরা

জাঙ্গীপাড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত ফুরফুরা নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১০২। ফুরফুরা জাঙ্গীপাড়া থানা থেকে মাত্র ৬ কিমি দূরবর্তী, এখন সহজেই যাওয়া যায়। পূর্বে শিয়াখালা হয়ে ঘুরপথে ফুরফুরা যেতে হত। পূর্বে এই স্থানটি বাখণ্ডি নামে পরিচিত ছিল এবং বালিয়া-বাসন্তী নামে কথিত জনৈক বাগদী জাতীয় রাজার অধীন ছিল। যে স্থানে এই রাজার দুর্গ ছিল তা এখনও রাজার গড় নামে পরিচিত। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি পাণ্ডুয়া বিজেতা শাহ সুফীর নির্দেশে শাহ হোসেন বোখারি বাখণ্ডি অধিকারের জন্য প্রেরিত হন। গোড়ায় তিনি বারবার পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তিনি বাখণ্ডি অধিকারে সমর্থ হন। জনশ্রুতি অনুযায়ী এখানকার একটি পবিত্র পুষ্করিণীর জলের গুণে স্থানীয় রাজা অপরাজিত ছিলেন, কিন্তু চারজন রহমান ভ্রাতা গোমাংস ফেলে এই পুষ্করিণীর পবিত্রতা নষ্ট করায় রাজার অলৌকিক

শক্তির হানি হয় এবং তিনি পরাজিত হন। অনুরূপ কাহিনী মহানাদ ও দ্বারবাসিনীর তুর্কী বিজয়ের ক্ষেত্রেও বর্তমান। অধিকৃত অঞ্চলটি ফুরফুরা নামে পরিচিত হয়। যে চারজন রহমান ভ্রাতা এই অঞ্চলটি বিজয়ের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের সমাধিযুক্ত মাজার গঞ্জ লোহার নামক স্থানে অবস্থিত।

বোখারি ফুরফুরায় নিজের লোকদের বসতি করান। এখানকার বেলপাড়ায় তাঁর সমাধি আছে। বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান নিষ্কর আয়মা ভূমি লাভ করেন এবং নিজেদের বসতবাড়ি গড়ে তোলেন। স্থানীয় অভিজাতশ্রেণীর মুসলমানরা তাঁদের নিজেদের আশরফ এবং এই আয়মাদারদের বংশধর বলে পরিচয় প্রদান করেন। তুর্কী ও মুঘল আমলে ফুরফুরা মুসলিম জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চার বড় কেন্দ্রে পরিণত হয়। এই স্থানে বহু সাধু ও বিদ্বানদের আবির্ভাব ঘটে। গ্রামের মধ্যে পীর ও আউলিয়াদের বহু সমাধি আছে। ফাল্গুন মাসে এখানে যে বাৎসরিক মহ্‌ফিল অনুষ্ঠিত হয় তাতে বহু ভক্ত ও আলেমবৃন্দ যোগদান করেন। স্থানীয় পীর মৌলানা মহম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই উৎসবের সূচনা করেন। তাঁর পূর্বপুরুষরা সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে বাগদাদ থেকে দিল্লীতে আগমন করেন এবং সম্রাট তাঁদের নিষ্কর জায়গীর আয়মা দিয়ে ফুরফুরা বসবাসের জন্য প্রেরণ করেন। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হজরত মৌলানা জোবের শাহ নামে একজন যোগসিদ্ধ ফকীর বাস করতেন।

ফুরফুরা শরীফে একটি প্রাচীন মসজিদ আছে যা মুশকিল খান কর্তৃক ১৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এছাড়া আনওয়ার কুলি নামে পরিচিত হজরত মহম্মদ কবীর সাহেবের সমাধি এখানে আছে। তিনি আলেপ্পো থেকে এখানে এসেছিলেন। মোল্লা শিমলা অঞ্চলে তাঁর সমাধিটি অবস্থিত। ফুরফুরার প্রাগুক্ত প্রাচীন মসজিদটি একগম্বুজ বিশিষ্ট, কেন্দ্রশালার ছাদের চার কোণের পরটের উপর চারটি ছোট মিনার। কেন্দ্রশালার তিনদিকে বারান্দা। বারান্দার চার কোণে পরটের উপর চারটি বড় মিনার, পূর্বমুখী প্রবেশদ্বারের উপর দুটি কৌণিক বড় মিনারের মধ্যবর্তী স্থানে দুটি মাঝারি মাপের মিনার। প্রবেশপথে বারান্দার দুদিকে দুটি খিলাননির্মিত জাফরিবদ্ধ জানালা, দক্ষিণ ও উত্তরের বারান্দায় পাঁচটি করে জাফরিবদ্ধ খিলানযুক্ত রুদ্ধ প্রবেশপথ, বলাই বাহুল্য সৌকর্যের জন্যই নির্মিত। মধ্যে মধ্যে মসজিদটি সংস্কৃত হয়েছে।

বদনগঞ্জ

আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অন্তর্গত প্রাচীন গ্রাম, বদনগঞ্জ-ফলুই এক নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৪৯। গ্রামটি একদা তসর ও রেশমশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বদনগঞ্জ পাণ্ডুগ্রাম থেকে চার কিমি

দূরে অবস্থিত। এখানকার শ্রীধর-লালজীউর মন্দির স্থানীয় দে পরিবার কর্তৃক ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি দ্বিতল, সমতল ছাদবিশিষ্ট, মৃৎফলকের উপর স্বল্পসংখ্যক চিত্রাবলী বিদ্যমান, যেগুলির মধ্যে দেবতা, রাজদরবারের চিত্রাবলী প্রভৃতি পাওয়া যায়। এটি দালান ধরনের মন্দিরের নিদর্শন। বদনগঞ্জে আরও একটি মন্দির আছে। এটি বরাট বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দামোদর মন্দির, নির্মাণকাল ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দ। মন্দিরটি নবরত্ন, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী খুবই আকর্ষণীয়। দেবতা, রাজদরবারে দৃশ্য, নানা ধরনের পশু ইত্যাদি এই চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু।

বরিঝাঁটি

চণ্ডীতলা থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বরিঝাঁটি নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত গ্রাম, জে এল নম্বর ৮৪। এখানকার মল্লেশ্বর মন্দির খুবই প্রাচীন। মন্দিরটি পঞ্চরত্ন, সামান্য 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণ বিশিষ্ট।

বল্লালদিঘি

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত পাঁচগড়া তোড়গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ২২। জনশ্রুতি অনুযায়ী এখানে রাজা বল্লালসেন প্রতিষ্ঠিত একটি দিঘির নামেই গ্রামটির নামকরণ হয়েছে। এই গ্রামের পূর্বদক্ষিণ প্রান্তে বিখ্যাত পীর শাহ্ খোওয়াজুদ্দীন সাহেবের সমাধি আছে।

বলাগড়

সদর মহকুমার অন্তর্গত থানা ও ব্লকের নাম বলাগড় গ্রাম থেকেই হয়েছে যা বর্তমানে শ্রীপুর বলাগড় পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১০৫। বলরাম ঠাকুরের গড় থেকেই বলাগড় নামটির উদ্ভব। বলাগড় নৌকা নির্মাণের বড় কেন্দ্র। পূর্বে এখানে জাহাজও তৈরি হত। এখানে তৈরি পালতোলা জাহাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীও একদা ব্যবহার করত। বলাগড়ের পুরাকীর্তির জন্য শ্রীপুর, সুখাড়িয়া ও সোমড়া দ্রষ্টব্য। বর্তমানে এখানে একটি রাধাগোবিন্দের মন্দির এবং একটি চণ্ডীমন্দির আছে। নিকটবর্তী কালিয়াগড় (বর্তমানে জিরাট পঞ্চায়েত এলাকায়, জে এল নম্বর ১০৭) বলয়োপপীঠ হিসাবে পরিচিত। জনশ্রুতি হিসাবে এখানে সতীর বলয় খুলে পড়েছিল। দেবীর ভৈরবের নাম মহাকাল। তাঁর মন্দিরটি স্থানীয় সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত। শোনা যায় এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির ডাকাতদের প্রতিষ্ঠিত।

বসুয়া

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম, বোসো নামেও পরিচিত, শিবাইচণ্ডী রেলস্টেশন থেকে যেতে হয়। এখানকার বিখ্যাত সিংহপরিবার

মহানাদ থেকে আসেন এবং এঁদেরই একটি শাখা ভাস্তারা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন (দ্রষ্টব্য ভাস্তারা)। এই সিংহ পরিবারের গৌরহরি সিংহ অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে বসুধাবাসিনী দেবীর মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বসুধাবাসিনীর মূর্তি দুর্গামূর্তি, কাষ্ঠনির্মিত। দেবী অসুরনাশিনী, বামে সিংহ দক্ষিণে বাঘ। এছাড়া গৌরহরি একটি শিবমন্দির ও একটি মহাপ্রভুর মন্দির নির্মাণ করেন। চৈত্র সংক্রান্তির দিন নীল উপলক্ষে বসুধাবাসিনীর বিগ্রহ [illegible] উক্ত শিবমন্দিরে নিয়ে আসা হয় এবং দেবী সেখানে চারদিন অবস্থান ক[illegible]ন। মহাপ্রভুর বিরাট নাটমন্দির এখনও বর্তমান। এছাড়া সিংহদের কুলদে[illegible] রাধাকান্তের মন্দিরও এখানে অবস্থিত। রাধাকান্ত মন্দিরটি সমতল ছাদ বি[illegible]। সামনে স্তম্ভযুক্ত বারান্দা, পরটযুক্ত ছাদ। সিদ্ধান্তপাড়ায় অবস্থিত শিবমন্দিরটি পঞ্চরত্ন, বাবুপাড়ায় অবস্থিত মন্দিরদ্বয় আটচালা। তিনটি মন্দিরেরই নির্মাণকাল উনিশ শতক। তারকেশ্বর থেকে বাস যোগেও বসুয়া যাওয়া যায়।

বড়গাছিয়া

শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর রেলপথে অবস্থিত নালিকুল স্টেশনের অনতিদূরে অবস্থিত গ্রাম। এখানকার সিংহপাড়ায় দুটি আটচালা শিবমন্দির আছে। প্রতিষ্ঠাকাল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ অথবা ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ। এছাড়া এখানে একটি ত্রিস্তর শিখরযুক্ত দোলমঞ্চ ও একটি দুর্গাদালান আছে যেগুলি মন্দিরদ্বয়ের সমসাময়িক।

বাকসা

চণ্ডীতলা থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বাকসা নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৭৭। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে জনাই রোড রেলস্টেশন। ষোড়শ শতকে পর্তুগীজরা এখানে সরস্বতী নদীর উপর একটি ছোট বন্দর স্থাপন করে। এখানকার চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠা সুলতানী আমল থেকে। এছাড়া এখানকার মিত্র বংশ ও সিংহ বংশ (এই বংশেই কালীপ্রসন্ন সিংহ জন্মগ্রহণ করেন) বিশেষ প্রসিদ্ধ। মিত্রবংশোদ্ভব দেওয়ান ভবানীচরণ মিত্র ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বাকসায় দ্বাদশ শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। সরস্বতীর তীরে সারিবদ্ধভাবে মন্দিরগুলি দণ্ডায়মান, প্রতিটি মন্দিরই আটচালা, এক মাপের এবং ৬০ ফুট উচ্চ। প্রতি বছর এখানে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে একটি বৃহৎ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বাকসার বিখ্যাত রঘুনাথ মন্দির ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে ভ্রুকুটরাম মিত্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি বৃহদায়তন এবং নবরত্ন অর্থাৎ নয়টি শিখর বিশিষ্ট। ভবানীচরণ মিত্র প্রাগুক্ত দ্বাদশ শিবমন্দির ছাড়াও আরও ছয়টি আটচালা

শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দুইটি করে তিনটি বিভিন্ন স্থানে মন্দিরগুলি বিদ্যমান। সিংহ পরিবার প্রতিষ্ঠিত শীতলা মন্দিরও বাকসার পুরাকীর্তির প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বাখরপুর

আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানা ও ব্লকের ভাঙ্গামোড়া পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। জে এল নম্বর ৩। তারকেশ্বর থেকে বাসে গোপীনগর হয়ে দামোদর পেরিয়ে বাখরপুর যেতে হয়। এখানে ভট্টাচার্য পরিবার প্রতিষ্ঠিত ঊনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত একটি আটচালা ও একটি চারচালা মন্দির আছে। বর্তমানে উভয় মন্দিরই পরিত্যক্ত। আটচালা মন্দিরটি পূর্বমুখী, দৈর্ঘ্যে প্রায় বাইশ ফুট এবং প্রস্থে উনিশ ফুটের কিছু বেশি। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট। মন্দিরের উপরাংশের অবস্থা এখনও বেশ ভাল, সম্মুখে মৃৎফলকের উপর দেবতা, রামায়ণের কাহিনী, রাজদরবার, পশু ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী। চারচালা মন্দিরটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত। দৈর্ঘ্যে ২৪ ফুট ও প্রস্থে ১৮ ফুটের কাছাকাছি, খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট। মৃৎফলকের উপর কিছু কারুকার্য সামনের বারান্দার দিকে দেখতে পাওয়া যায়।

বাজুয়া

গোঘাট থানা ও ব্লকের অন্তর্গত রঘুবাটি পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত প্রাচীন গ্রাম। এখানে একটি প্রাচীন মসজিদের নিদর্শন আছে। এই মসজিদটি মজলিস খানওয়ার কর্তৃক ষোড়শ শতকে নির্মিত হয়। মসজিদটিতে দুইটি শিলালেখ বর্তমান, একটি মসজিদগাত্রে এবং অপরটি মসজিদের সম্মুখবর্তী তোরণে। তোরণটি ভেঙে পড়ার জন্য সেখানকার শিলালেখটি কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত করা হয়েছে। মসজিদগাত্রে উৎকীর্ণ দ্বিতীয় লেখটিতে বলা হয়েছে যে এই মসজিদটি সৈয়দ আসরফ অল হুসেনের পৌত্র এবং হুসেন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহের আমলে ৯৩৮ হিজরায় নির্মিত। মসজিদটি এখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার সংরক্ষণ করেন।

বাটিকা

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বাটিকা-বৈঁচি পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত জে এল নম্বর ৭। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত এই গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ পীর আমিন শাহ ও দেওয়ান সাহেবের সমাধি আছে। প্রতি বছর ২৬শে মাঘ তারিখে দেওয়ান সাহেবের উরস্ উৎসব সম্পন্ন হয়।

বালিগড়ি

তারকেশ্বর থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বালিগড়ি-২ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৫৩। বালিগড়ি তারকেশ্বর রেলস্টেশন থেকে ৩ কিমি দূরে অবস্থিত। এখানে দে পরিবার নির্মিত ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত একটি পরিত্যক্ত আটচালা মন্দির আছে। মন্দির সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর রামায়ণের কাহিনী, দেবতা ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণের চিত্রাবলী বর্তমান।

বালিডাঙ্গা

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত গুড়বাড়ি পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১১। বালিডাঙ্গা খানপুর-মেমারী রাস্তায় কানা দামোদরের ধারে অবস্থিত, চোপা থেকে আড়াই কিমি দূরবর্তী। এখানে ধাড়া বংশের প্রতিষ্ঠিত ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত একটি আটচালা মন্দির আছে, বর্তমানে পরিত্যক্ত। মন্দিরের সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী বর্তমান। রামায়ণের কাহিনী, দেবতা, পশু ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ এই চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু।

বালি-দেওয়ানগঞ্জ

আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অন্তর্গত গ্রাম; গ্রামটি একদা রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল। আরামবাগ শহর থেকে প্রায় ১০ কিমি দূরে দারকেশ্বর নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। রেশম ছাড়াও পিতলের সামগ্রীর জন্য বালি-দেওয়ানগঞ্জ একসময়ে খুবই নামজাদা ছিল। বালির পূর্ব নাম মকদমনগর। মকদম পীরের একটি ক্ষুদ্র আস্তানা অদ্যাপি এই গ্রামে আছে। এখানকার রাউতপাড়া, দালালপাড়া ও পাল পাড়ায় কয়েকটি মন্দির আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত মঙ্গলচণ্ডী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরটি ত্রয়োদশরত্ন বা তেরটি শিখর বিশিষ্ট, সম্মুখে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী। রাউতপাড়ার পাঁচটি মন্দিরের মধ্যে দুর্গামন্দিরটির স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এই মন্দিরটির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটি জোড়বাংলা মন্দিরের উপর একটি নবরত্ন মন্দির বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মন্দিরটির নিম্নাংশের পরিমাপ ২২ বর্গফুট। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের বড় মাপের কারুকলা বর্তমান। কার্নিসের নীচে বিশেষভাবে নির্মিত রেখধরনের শিখরযুক্ত চৌখুপির মধ্যে মূর্তিগুলি প্রতিষ্ঠিত। এটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত হয়। নিকটস্থ সর্বমঙ্গলা মন্দিরের সামনের দিকেও মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী আছে। দালালপাড়ায় অপর একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে যা ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত,

কিন্তু বর্তমানে পরিত্যক্ত। এই মন্দিরের মৃৎফলকের চিত্রাবলী বঙ্গদেশের 'টেরাকোটা' শিল্পের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনসমূহের একটি। এছাড়া এখানকার ঘোষবংশ প্রতিষ্ঠিত দামোদর মন্দিরটিও উল্লেখযোগ্য যা ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এটি প্রথাগত আটচালা মন্দির, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট, এবং সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী শোভিত। পালপাড়ায় অবস্থিত অষ্টকোণ রাসমঞ্চটির কেন্দ্রস্থ শিখরসহ আট কোণে আটটি শিখর, এবং সেই হিসাবে এটি নবরত্ন ধরনের। এই রাসমঞ্চটির বিভিন্ন কোণে মৃৎফলকে বৃহদায়তন মূর্তিসমূহ বিস্ময়ের উদ্রেক করে। মূর্তিগুলির চরিত্র ধর্মনিরপেক্ষ। সেনানী, বীণাবাদনরতা নারী প্রভৃতির চিত্রাবলীর তুলনা পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র বড় পাওয়া যায় না।

বাঁশবেড়িয়া

হুগলী শহরের উত্তরে বাঁশবেড়িয়া একটি স্বতন্ত্র পৌরসভা এলাকা। চুঁচুড়া-হুগলীর গঙ্গাতীরবর্তী পথটি বাঁশবেড়িয়ার ভিতর দিয়ে ত্রিবেণী অভিমুখে চলে গেছে। এই পথে বাস চলাচল করে। ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকেও বাঁশবেড়িয়ায় আসা যায়। পূর্ব রেলপথের ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনে বাঁশবেড়িয়া ও ত্রিবেণী রেলস্টেশন আছে। হাওড়া থেকে দুটি স্টেশনের দূরত্ব যথাক্রমে ৪৫ ও ৪৮ কিমি। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সম্রাট শাহজাহান বর্ধমান জেলার পাটুলির রাঘব দত্তরায়কে (পরবর্তীকালে এঁরা দেবরায় হিসাবেই পরিচিত হন) সাতগাঁও অঞ্চলের ২১টি পরগণার জমিদারি প্রদান করেন। তাঁর পুত্র রামেশ্বর দত্ত মুঘলগণ কর্তৃক পঞ্জ-পর্চা ও রাজা-মহাশয় উপাধি প্রদত্ত হন। বাঁশঝাড় সমাকীর্ণ এই এলাকা পরিষ্কার করে তিনি একটি দুর্গ নির্মাণ করেন যা থেকে স্থানটির নাম বাঁশবেড়িয়া হয়। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত অনন্তবাসুদেবের বিখ্যাত মন্দিরটি তাঁরই কীর্তি। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ প্রস্তরফলকে বলা হয়েছে মহীবোমাঙ্গশীতাংশুগণিতশকবৎসরে। 'অঙ্কস্য বামা গতি' এই নিয়মানুসারে এই শ্লোকার্ধ থেকে ১৬০১ শক, অর্থাৎ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়।

অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরটিকে একরত্ন বলা যায়, চারচালা কাঠামোর উপর একক শিখর বিশিষ্ট। শিখরটি আটকোণা। মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ৩৫ ফুট ৮ ইঞ্চি, প্রস্থে ৩২ ফুট ৪ ইঞ্চি। মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী এই মন্দিরের বিশেষত্ব, যার তুলনা খুবই কম আছে। মন্দিরগাত্রে প্রধানত দেবদেবীর মূর্তিই অঙ্কিত। দুর্গা, কালী, শিব, কৃষ্ণের রাসলীলা, নৌকাবিলাস, নারায়ণের অনন্তশয্যা প্রভৃতি ধর্মীয় বিষয়বস্তু ছাড়াও অশ্বারোহী সৈনিক, যুদ্ধচিত্র, বাঘ, হরিণ, সন্ন্যাসীর নিকট রাজার দীক্ষাগ্রহণ, সমুদ্রযাত্রা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় এই চিত্রাবলীতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

নিখুঁত পরিস্ফুটন নৈপুণ্য, সুচারু রেখাবৈশিষ্ট্য ও সচেতন বাস্তবতাবোধ চিত্রগুলিকে যেন জীবন্ত করেছে। মন্দিরের তিন দিক জুড়েই চিত্রাবলীর সমারোহ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু একমাস বাঁশবেড়িয়ায় অবস্থান করে প্রতিটি মৃৎফলকের চিত্র স্বহস্তে অঙ্কন করেন।

রামেশ্বরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রঘুদেব এবং রঘুদেবের পর তাঁর পুত্র গোবিন্দদেব বাঁশবেড়িয়ার রাজা হন (রঘুদেবের ভ্রাতুষ্পুত্র মনোহর শেওড়াফুলিরাজের পত্তন করেন)। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দদেবের মৃত্যুর তিনমাস পর তাঁর বিধবা পত্নী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেন। এই পুত্রের নাম হয় নৃসিংহদেব। গোবিন্দদেবের অকালমৃত্যুর সুযোগে বর্ধমান ও নদীয়ার রাজারা বঙ্গদেশের নবাব সরকারের যোগসাজসে বাঁশবেড়িয়া-রাজের অধিকাংশই দখল করে নেন। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের চেষ্টায় হারানো সম্পত্তির কিছুটা অংশ নৃসিংদেবের হাতে ফিরে আসে। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নৃসিংহদেব স্বয়ম্ভবা কালীমন্দির নির্মাণ করেন যার ধ্বংসপ্রাপ্ত ভিত্তিমূল হংসেশ্বরী মন্দিরের উত্তর-পূর্বে এখনও দেখতে পাওয়া যায়। নৃসিংহদেব ১৭৯২ থেকে ১৭৯৯ পর্যন্ত বারাণসীতে তন্ত্রচর্চা করেন এবং উড্ডীশতন্ত্র নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের জন্য তিনি একটি বঙ্গদেশের মানচিত্র তৈরি করেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তাঁর স্ত্রী শঙ্করী এই মন্দির নির্মাণ সম্পন্ন করেন ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে।

হংসেশ্বরী মন্দির হুগলী জেলা তথা সমগ্র বাংলাদেশের দর্শনীয় মন্দিরসমূহের একটি। মন্দির স্থাপত্যের দিক থেকে প্রথাবহির্ভূত। নৃসিংহদেব একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মন্দিরটির পরিকল্পনা করেছিলেন। তান্ত্রিক ষটচক্রভেদ তত্ত্বটিকে তিনি এই মন্দির স্থাপত্য দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। মন্দিরটি ত্রয়োদশরত্ন কিন্তু পাঁচতলা। অন্য রত্নমন্দিরের ক্ষেত্রে যেমন ছাদের প্রতি কোণে শিখর বসানো হয়। এই মন্দিরের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়। এটি বিভিন্ন তলসম্পন্ন শিখরভবনের সমাহার, গর্ভগৃহ থেকে প্রতিটি শিখরভবনেরই সোপানযুক্ত সংযোগপথ আছে। এবং এই সংযোগকে অবলম্বন করে একটি গোলকধাঁধার সৃষ্টি করা হয়েছে যেখানে একবার ঢুকে পড়লে সহজে বার হওয়া যায় না, পথপ্রদর্শকের সাহায্য ছাড়া। এর নিহিতার্থ হচ্ছে যথার্থ গুরুর সাহায্য ছাড়া ষটচক্রভেদ সম্ভব নয়। অভ্যন্তরীণ সোপান পথ সমূহ ইড়া, পিঙ্গলা, সুসুম্না প্রভৃতি নাড়ীর প্রতীক। মন্দিরের প্রবেশপথে তিনটি খিলানযুক্ত বারান্দা। যার

দুদিকে দুটি ত্রিতল শিখরভবন। অন্যান্য শিখরভবনগুলি বিভিন্ন উচ্চতায় মন্দিরের চারদিক ঘেঁসে বর্তমান। এগুলির খিলানের ফোকরযুক্ত, বৃহদায়তন ও মোচাকৃতি।

বাঁশবেড়িয়ার এই দুটি প্রধান দর্শনীয় ছাড়াও স্থানীয় কুণ্ডু পরিবারের ভবন, ঠাকুরদালান ও মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কুণ্ডুরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে লবণের কারবার করে বিশেষ সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। কুণ্ডুদের ভবনটির নির্মাণকাল ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দ, দক্ষিণমুখী তিনমহলা এই ভবনটির প্রতিটি মহলের সামনে উন্মুক্ত প্রাঙ্গন, ভিতরে কুলদেবতা শ্রীধরের অধিষ্ঠান। রথতলার কুণ্ডুদের রাধাকৃষ্ণ মন্দির ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। ওই রথতলাতেই কুণ্ডুদের দুটি শিবমন্দির আছে, একটি অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত। অপরটির নির্মাণকাল মধ্য-উনিশ শতক। তিনটি মন্দিরই প্রথাগত আটচালা। দক্ষিণপাড়ার ধোপাঘাটে শ্যামরায় ঘোষ কর্তৃক ১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ছয়টি আটচালা শিবমন্দির অলঙ্করণবর্জিত হলেও প্রাচীনত্বের হিসাবে পুরাকীর্তির দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উনিশ শতকের মধ্য ও শেষভাগে নির্মিত আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মন্দির বাঁশবেড়িয়ায় আছে, যেমন জলেশ্বরী ঘাটে বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দুটি আটচালা শিবমন্দির, কুণ্ডুঘাটের জোড়া শিবমন্দির, মুখার্জী রোডে বর্ধমানের মহারাজা মহ্‌তাবচন্দ্রকর্তৃক ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত অষ্টকোণ গম্বুজাকৃতি শিখরবিশিষ্ট মন্দির। নন্দন পরিবারের মালিকানাধীন দুটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির, মুখোপাধ্যায় পরিবারের মালিকানাধীন 'টেরাকোটা' অলঙ্করণযুক্ত দুটি আটচালা শিবমন্দির এবং ভট্টাচার্য পরিবারের মালিকানাধীন তিনটি আটচালা শিবমন্দির এছাড়া মধ্য-উনিশ শতকে নির্মিত বর্ধমানরাজের বাড়ি ও ঠাকুরদালান, হংসেশ্বরী মন্দিরপথে দেবরায়দের প্রাচীন সমৃদ্ধির নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি অট্টালিকা এবং তাঁদেরই নির্মিত একটি দ্বারভবনের ধ্বংসাবশেষ বাঁশবেড়িয়ার অতীত গৌরবকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়।

বাসুদেবপুর

আরামবাগের সন্নিহিত অঞ্চল। এখানে শিব ও রঘুনন্দনের দুটি মন্দির আছে, যেগুলির নির্মাণকাল যথাক্রমে ১৭২৬ ও ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। দুটি মন্দিরই প্রথাগত আটচালা বেষ্টণীযুক্ত কৌণিক স্তম্ভ ও বাঁকানো কার্নিসসহ। সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর কারুকলা বিদ্যমান। বাসুদেবপুরে আরও একটি তৃতীয় মন্দির আছে। পঞ্চরত্ন মন্দির, বর্তমানে পরিত্যক্ত। এই মন্দিরটিরও সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ বিদ্যমান।

বাসুদেবপুর

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত হরাল-দাসপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৬২। গ্রামটি গুড়াপ-কালনা বাসরাস্তার উপরে পড়ে। এখানে পীর সাহাবান্দ সাহেবের মাজার আছে।

বাহিরগড়

জাঙ্গীপাড়া থানা, ব্লক ও পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত জে এল নম্বর ৫৬। জাঙ্গীপাড়া থেকে অল্পদূরবর্তী। আগে হাওড়া ময়দান থেকে মার্টিন কোম্পানীর চাঁপাডাঙ্গা অভিমুখী রেলপথে বাহিরগড় স্টেশন ছিল। এখন বাসযোগে জাঙ্গীপাড়া যাওয়া খুবই সহজ। অষ্টদশ শতকের প্রথম দিকে সিংহরায় বংশ এই অঞ্চলে প্রতিপত্তিশালী হয়ে ওঠে। এই সিংহরায়েরা জৌনপুর জেলার কেশব হাজারী এবং তাঁর পুত্র বিষ্ণুদাসের (তাঁর অপরপুত্র ভারমল্ল রামনগরের রাজা ছিলেন) বংশধরত্ব দাবি করেন। এই অঞ্চল তাঁদের গড়বেষ্টিত প্রাসাদের বহির্ভাগে অবস্থিত বলে বাহিরগড় নামে খ্যাত। বর্তমানে তাঁদের পুরাতন আমলের কিছুই অবশিষ্ট নেই। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত দুটি আটচালা মন্দির আছে। প্রথমটি দামোদর মন্দির যা বর্তমানে স্থানীয় শেঠ পরিবারের কর্তৃত্বাধীন। মন্দিরগাত্রে শুভমস্ত শকাব্দ ১৬৬৫ উৎকীর্ণ আছে, অর্থাৎ মন্দিরটি ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দ্বিতীয়টি সিংহরায়দের শিবমন্দির, প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। উভয় মন্দিরেরই সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী বর্তমান। রামায়ণের কাহিনী কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবমূর্তি, রাজদরবারের দৃশ্য এবং পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ এই চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু। দামোদর মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে সাড়ে একুশ ফুট, প্রস্থে আঠারো ফুট।

বিলসরা

হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের বৈঁচি স্টেশন থেকে বিলসরা যেতে হয়। এখানে অনেকগুলি শিবমন্দির আছে। তামলিপাড়ায় একটি, মধ্যপাড়ায় দুটি ও উত্তরপাড়ায় তিনটি। পালপাড়ার একটি মন্দির বুড়োশিবের মন্দির বলে পরিচিত। সব কটি মন্দিরই উনিশ শতকে নির্মিত। উত্তরপাড়ার তিনটি মন্দিরের শীর্ষদেশ গম্বুজাকার। বাকি মন্দিরগুলি আটচালা ধরনের। মধ্যপাড়ায় অবস্থিত শ্রীধর জীউর মন্দির দালান ধরনের সমতল ছাঁদ বিশিষ্ট। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি দুর্গাদালানও এখানে আছে। তামলিপাড়ায় একটি কালীমন্দির বর্তমান।

বীরলোক

আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানা ও খানাকুল ২নং পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত গ্রাম। জে এল নং ৪১। খানাকুল থেকে রিকশায় যেতে হয়।

এখানকার উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্তি সমূহের মধ্যে খান পরিবার কর্তৃক অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে নির্মিত সিংহবাহিনীর মন্দিরের কথা বলা যায়। এই পঞ্চরত্ন দক্ষিণমুখী মন্দিরটি ঢালু ছাদ ও বাঁকানো কার্নিসযুক্ত। তিনটি প্রবেশদ্বার মনুষ্যমূর্তির দ্বারা অলঙ্কৃত। এছাড়া উনিশ শতকের গোড়ার দিকে বটব্যাল পরিবারের দ্বারা নির্মিত দুইটি শিবমন্দিরও উল্লেখযোগ্য। দুটি মন্দিরই দক্ষিণমুখী, আটচালা, বাঁকানো কার্নিস ও ঢালু চালযুক্ত, কার্নিসের নিচে চৌখুপির অলঙ্করণ, খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার, খিলান পলকাটা ও উদ্গত স্তম্ভের উপর গঠিত।

বেগমপুর

চণ্ডীতলা থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বেগমপুর নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, গ্রাম জে এল নম্বর ৭৩। তাঁত শিল্পের জন্য এই গ্রাম প্রসিদ্ধ। তাছাড়া এখানে পানের চাষ খুবই বিখ্যাত। এখানকার পান ভারতের নানাস্থানে রপ্তানী হয়। পূর্বে এখানে নীলের চাষও হত এবং একটি নীলকুঠির অবশেষ গ্রামের দক্ষিণ দিকে লক্ষ্য করা যায়। এখানে কয়েকটি আটচালা মন্দির আছে যেগুলির মধ্যে বসাকদের স্থাপিত শিবমন্দির এবং বেগমপুর বাজারের শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য। ঘোষ পরিবারের ঠাকুরদালানও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বেগমপুরের সং একদা বিখ্যাত ছিল। বেগমপুরের অনতিদূরে বড়তাজপুরে বৃহৎ মিনার শোভিত একটি মসজিদ আছে।

বেজড়া

চন্দননগর মহকুমার ভদ্রেশ্বর থানা ও সিঙ্গুর ব্লকের অন্তর্গত খলিসানি পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৪। এই বেজড়া ইতিহাসে প্রসিদ্ধ বিদারা যেখানে ডাচদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ হয়েছিল। এই গ্রামটি চন্দননগর রেল স্টেশন থেকে দুই কিমি এবং মানকুণ্ডু স্টেশন থেকে দেড় কিমি পশ্চিমে অবস্থিত। এই গ্রামের গৌরমোহন মিত্র লর্ড মিন্টোর দেওয়ান ছিলেন এবং সেই হিসাবে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিলেন। তিনি এখানে একটি কৃষ্ণমন্দির একটি দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলি জীর্ণাবস্থায় আজও বর্তমান।

বেতড়া

গোঘাট থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বদনগঞ্জ ফুলুই ২নং পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৪১। এখানে মাকড়া পাথর দিয়ে তৈরি একটি আটচালা মন্দির এবং তার সামনে একটি চারচালা মণ্ডপ আছে। বর্তমানে পরিত্যক্ত মন্দিরটির পরিমাপ ১২ বর্গফুট এবং মণ্ডপটির পরিমাপ ৮.৯ বর্গফুট।

বেরেলা

হাওড়া বর্ধমান মেন লাইনের পাণ্ডুয়া স্টেশন থেকে বেরেলা যেতে হয়। পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের বেরেলা-কোঁচমালী পঞ্চায়েত এলাকায় এই গ্রাম অবস্থিত। এখানে উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত ছয়টি আটচালা শিবমন্দির আছে, দুটি মাঝেরপাড়ায়, বাকি চারটি যথাক্রমে পশ্চিমপাড়া, পূর্বপাড়া, গোপানোপাড়া ও পীরতলায়।

বেলমুড়ি

সদর মহকুমার ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের পঞ্চায়েত এলাকায় বেলমুড়ি গ্রামের অবস্থিতি, জে এল নম্বর ১৯০। চুঁচুড়া থেকে তারকেশ্বর এবং চুঁচুড়া থেকে হরিপাল এই দুই রাস্তার সংযোগস্থলে বেলমুড়ি অবস্থিত। হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনে বেলমুড়ি রেলস্টেশন বর্তমান। বেলমুড়ির পূর্বনাম ছিল কৃষ্ণরামবাটি। এখানকার বসুবংশ প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ মন্দির খুবই বিখ্যাত। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা চিন্তামণি ওরফে প্রীতিরাম বসু। কিন্তু মূল মন্দিরটি বিনষ্ট হয়ে গেলে তাঁরই বংশধর বৈকুণ্ঠদাস বসু ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে মন্দিরটি পুনর্নির্মাণ করেন। এখানকার দ্বাদশ শিবমন্দিরও বসুদের কীর্তি, তবে মন্দিরগুলির অধিকাংশই ধ্বংসপ্রাপ্ত। এই মন্দিরগুলি ১৬৮৮ শকে অর্থাৎ ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এছাড়া বসুদের আরও দুটি শিবমন্দির এখানে আছে তবে এই দুই মন্দিরের শিবলিঙ্গদ্বয় একটি নূতন মন্দিরে বর্তমানে স্থানান্তরিত। পূর্বোক্ত দ্বাদশ শিবমন্দিরে কিছু ''টেরাকোটা' অলঙ্করণ লক্ষ্য করা যায়। বসুরায় বংশের ঠাকুরবাড়ি ও দুর্গাদালানের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এগুলি সমতল ছাদ ও খিলান বিশিষ্ট, নির্মাণকাল ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ, প্রতিষ্ঠাতা রসিকলাল রায়। বেলমুড়ির কারকুনপাড়ায় তিনটি ভগ্ন আটচালা শিবমন্দির বর্তমান, নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতক।

বেলুন

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বেলুন-ধামাসীন পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৯৯। এখানে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর তীর খনন করার সময় একটি মৃন্ময় মুখকলস, পাথরের একটি চণ্ডীমূর্তি, একটি হনুমানমূর্তি ও একটি বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া লালপাথরের তৈরি একটি নাগমূর্তি এবং দুটি মনসামূর্তিও এখানে পাওয়া গেছে। উনিশ শতকে নির্মিত একটি আটচালা শিবমন্দির এখানে আছে। এখানকার পূর্বপাড়ার বুড়িমা দালানটিও উল্লেখযোগ্য।

বৈকুণ্ঠপুর

আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত। তারকেশ্বর থেকে চৌতারা হয়ে দামোদর পেরিয়ে যেতে হয়। এখানে যথাক্রমে চৌধুরী পরিবার ও সিংহরায় পরিবার প্রতিষ্ঠিত একটি নবরত্ন ও একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। উভয় মন্দিরই উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত। নবরত্ন মন্দিরটি শ্রীধর মন্দির নামে পরিচিত, দৈর্ঘ্যে আঠারো ফুটের কিছু বেশি, প্রস্থে ষোল ফুটের কাছাকাছি। শিখরগুলি মোচাকৃতি খাঁজকাটা তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার। সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবমূর্তি, রাজদরবারের দৃশ্য এবং পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী বিদ্যমান। পঞ্চরত্ন মন্দিরটি পরিত্যক্ত। এই মন্দিরটিও সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর রামায়ণের কাহিনী দেবতা ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী।

বৈদ্যপুর

শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর লাইনের লোকনাথ স্টেশন থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত। এখানে উনিশ শতকে নির্মিত লোকনাথ শিবের আটচালা মন্দির এবং একটি সমতল ছাদ ও খিলানযুক্ত মণ্ডপ বিদ্যমান।

বৈঁচিগ্রাম

পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত বর্ধিষ্ণু এলাকা। হাওড়া-বর্ধমান শাখার মেন লাইনে অবস্থিত বৈঁচিগ্রাম রেলস্টেশনের দূরত্ব হাওড়া থেকে ৬৮ কিমি। নামটি সম্ভবত বৈঁচিফলের গাছ থেকে এসেছে। গ্রামটিতে আদিতে তাম্বুলি বণিকদের বসতি ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এই সম্প্রদায়ের গোকুল সিংহ গোপালের নামে উৎসর্গীকৃত একটি শিখরমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। হার্বার্ট রিজলী একটি লেখের ভিত্তিতে এটির নির্মাণকাল ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে নির্দিষ্ট করেছেন। কিন্তু লেখটি পাওয়া যায় না। ব্লক প্রদত্ত বঙ্গীয় পুরাতাত্ত্বিক বিভাগের রিপোর্টে (১৮০৮-০৯) বলা হয়েছে যে এটির নির্মাণকাল ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দ। ডেভিড ম্যাকাচ্চন শেষের তারিখটির উপর নির্ভর করেছেন। মন্দিরটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ১৭ ফুটের মত। সামান্য 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণযুক্ত। মন্দিরের নিকটে অবস্থিত দোলমঞ্চটি রেখ ধরনের শিখরযুক্ত, নির্মাণকাল ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দ। এটি প্রথাগত আটচালা, বক্র কার্ণিস ও একদ্বার বিশিষ্ট, সম্মুখভাগে 'টেরাকোটা'র কাজ। একটি ফলকে মহিষমর্দিনীর মূর্তি উৎকীর্ণ। কর পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত তিনটি শিবমন্দিরের নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতক। এগুলি পূর্বোল্লিখিত মন্দিরটিরই অনুরূপ। বর্তমানে ভগ্নদশায়। কদমতলা-গোস্বামীপাড়ার রাধামাধবের মন্দিরটিও অষ্টাদশ শতকের শেষের

দিকে নির্মিত। প্রথাগত আটচালা, সামনে চারচালা মণ্ডপ, তিনটি খিলানপথ। বৈঁচিগ্রামের জমিদারদের মধ্যে বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় স্বনামধন্য। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় আজও বর্তমান। মধ্য উনিশ শতকে নির্মিত মুখোপাধ্যায়দের জমিদারবাড়িও দর্শনীয়। তাঁদের ঠাকুরদালানটি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, দুর্গাদালানটির নির্মাণকাল মধ্য উনিশ শতক। উভয় ক্ষেত্রেই প্রথাগত স্থাপত্যরীতি অনুসৃত। থামের উপর গঠিত খিলানযুক্ত দালান। রায়পাড়ায় মুখোপাধ্যায়দের প্রতিষ্ঠিত একটি রাসমঞ্চ ও দুইটি শিবমন্দির আছে। রাসমঞ্চটির নির্মাণকাল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ, উচ্চ মঞ্চের উপর প্রতিষ্ঠিত, চতুষ্কোণ। চারটি কৌণিক স্তম্ভের উপর খিলান সহযোগে রাসমঞ্চটির দেহভাগ গঠিত। উপরে রেখ ধরনের শিখর। লম্বালম্বি খাঁজকাটা, দেওয়ালে 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণ। শিবমন্দিরদুটি অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে বা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত। মন্দিরদ্বয়ের শিখরদেশে রেখ দেউলের অনুরূপ খাঁজকাটা। কৌণিক স্তম্ভগুলি খুবই পুরু এবং বেষ্টনীযুক্ত, সমান কার্নিস। পশ্চিমপাড়ায় একটি ত্রিকক্ষ বিশিষ্ট তিনটি গম্বুজযুক্ত বড় মসজিদ আছে। নির্মাণকাল মধ্য-উনিশ শতক। বৈঁচিগ্রামে বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক ও শাস্ত্রবিদ ভাগবতাচার্য নীলকণ্ঠ গোস্বামী ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এখানকার উৎসবাদির মধ্যে মনসার ঝাঁপান, দাঁ পরিবারের রথযাত্রা ও গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের অভয়া পূজা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বৈদ্যবাটী-শেওড়াফুলি

শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত গঙ্গাতীরবর্তী বৈদ্যবাটী ও শেওড়াফুলি যদিও দুইটি পৃথক রেলস্টেশনের দ্বারা পরিচিত, এই দুটি শহর চুঁচুড়া-হুগলীর মত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। পূর্বে বৈদ্যবাটি-শেওড়াফুলি অঞ্চলটি শেওড়াফুলি-রাজের অন্তর্গত ছিল। শেওড়াফুলির রাজবংশ বাঁশবেড়িয়া-রাজের শাখা। বাঁশবেড়িয়ার রাজা রামেশ্বরের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে তাঁর পুত্র রঘুদেব আর্শা পরগণার জমিদারি পান এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মনোহর বোরো তালুকের অধিকারী হন। এই মনোহরই শেওড়াফুলি রাজের প্রতিষ্ঠাতা। রাজা মনোহর রায় ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজবাটিতে সর্বমঙ্গলা দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর পূজা নির্বাহের জন্য শ্রীরামপুরের বহু সম্পত্তি দেবোত্তর করেন। তিনি বৈদ্যবাটিতে রাঘবেশ্বর শিবমন্দির স্থাপন করেন। মন্দিরটি অদ্যাপি বর্তমান, যদিও ভগ্নদশায়। মনোহরের অপরাপর কীর্তির মধ্যে গুপ্তিপাড়ার শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির উল্লেখযোগ্য (গুপ্তিপাড়া দ্রষ্টব্য)। মাহেশে জগন্নাথদেবের সেবার জন্য তিনি জগন্নাথপুর নামক পল্লী নিষ্কর করে দেন।

মনোহরের পুত্র রাজা রাজচন্দ্র রায় শ্রীপুর, মোহনপুর এবং গোপীনাথপুর পল্লীগুলিকে শ্রীরামচন্দ্রের বিগ্রহসেবার জন্য দেবোত্তর করেছিলেন। এই এলাকাগুলি পরে শ্রীরামপুর নামে প্রসিদ্ধ হয়। রাজচন্দ্রের পৌত্র হরিশ্চন্দ্র ভাগীরথীর তীরে নিস্তারিনী নামক কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। এই মন্দিরে দেবী কালিকার মূর্তি ছাড়াও আরও কয়েকটি প্রস্তর ও কাংসনির্মিত মূর্তি আছে যেগুলি শেওড়াফুলি-বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের আদি নিবাস বর্ধমান জেলার পাটুনি থেকে আনীত।

বৈদ্যবাটির হাট একদা বিখ্যাত ছিল। রাজা হরিশ্চন্দ্র সেই হাটকে শেওড়াফুলিতে স্থানান্তরিত করেন। যে স্থানে এই হাট অবস্থিত ছিল সেই স্থানটিকে পর্তুগীজ বণিকেরা দীর্ঘাঙ্গ বা দিগঙ্গ বলত। ১৬৮৮-র বাওরির মানচিত্রে এই স্থানটি দেশুণ, ১৭০৩-এর পাইলট চার্টে দেগন এবং রেনেলের মানচিত্রে দিগাম বলে উল্লিখিত। এটি আসলে দেগঙ্গা অঞ্চল যেখানকার সম্পর্কে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে বলা হয়েছে যে সেখানে চাঁদ সদাগর নিমগাছে চাঁপাফুল দেখেছিলেন। এই 'নিমের গাছে চাঁপার ফুলের' কাহিনীটি নিমাই তীর্থের ঘাট প্রসঙ্গে বহু গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। নিমাইতীর্থের ঘাটকে কেন্দ্র করে এই স্থানে তিনটি মেলা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়। নিমাইতীর্থের পুরাতন ঘাটটি ভগ্ন হলে চন্দননগরের কাশীনাথ কুণ্ডু ঘাটটির সংস্কার করেন ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে। এই ঘাট থেকে পাল আমলের (দশম শতাব্দী) একটি সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হয়, উচ্চতায় তিন ফুট, কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত।

এই স্থানে একটি পুষ্করিণী খননকালে একটি ভদ্রকালীর মূর্তি আবিষ্কৃত হয়। রাজা মনোহর রায় ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে ভদ্রকালীর মন্দির নির্মাণ করেন এবং তারকেশ্বরের মোহান্তের হাতে তার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তারকেশ্বরের খাতাপত্রে এটিকে বৈদ্যবাটীর মঠ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মন্দির সংলগ্ন যাত্রী নিবাসটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

বৈদ্যবাটির মহামায়া সাহিত্যমন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত সারদাচরণ মিউজিয়াম বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের স্মৃতিরক্ষার্থে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এখানে শিলালিপি, তাম্রশাসন, মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, অলঙ্কার, চিত্রশিল্প, হস্তশিল্প, বাদ্যযন্ত্র, কুটির শিল্পের নানা নমুনা, দলিল দস্তাবেজ, ভাস্কর্য-প্রভৃতি নানা দর্শনীয় সামগ্রী আছে, অধিকাংশই হুগলী জেলা থেকে সংগৃহীত। এই সংগ্রহশালা থেকে হুগলী জেলার সংস্কৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য অবগত হওয়া যায়।

বোড়াগড়ি

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বেরেলা-কোঁচমালি পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৪। বোড়াগড়ি বৈঁচি রেলস্টেশন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানে তাম্বুলিদের প্রতিষ্ঠিত আটচালা গোপাল মন্দির ১৬০১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। তিনটি খিলানদ্বার বিশিষ্ট দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটির সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর দেবতা, নানাপ্রকার মূর্তি, রাজদরবারের দৃশ্য, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণের চিত্রাবলী বর্তমান। দ্বিতীয় মন্দিরটি একটি পরিত্যক্ত পঞ্চরত্ন মন্দির। এটিও তাম্বুলিদের প্রতিষ্ঠিত, প্রতিষ্ঠাকাল ১৭৩৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দ। একটি প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট এই মন্দিরটির শিখর সমূহ রেখ ধরনের, খাঁজকাটা, মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর মূর্তি, পশু ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণের চিত্রাবলী বর্তমান। এখানকার পশ্চিমপাড়ায় দুটি এবং রায়পাড়ায় একটি আটচালা শিবমন্দির আছে, নির্মাণকাল উনিশ শতক।

ভদ্রকালী

উত্তরপাড়া দ্রষ্টব্য।

ভদ্রেশ্বর

চন্দননগরের দক্ষিণে অবস্থিত শিল্পপ্রধান শহর। হাওড়া-ব্যাণ্ডেল রেলপথে ভদ্রেশ্বর হাওড়া থেকে একদশতম রেলস্টেশন। সম্ভবত, ভদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ থেকে স্থানটির নাম ভদ্রেশ্বর হয়েছে। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে ভদ্রেশ্বরের উল্লেখ আছে। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত পাইলট চার্টে ভদ্রেশ্বর 'বুদেসী' নামে অভিহিত হয়েছে। ভদ্রেশ্বর একদা সংস্কৃতচর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। শ্রীরামপুরে বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের আগে ডেন বণিকগণ ভদ্রেশ্বরে কুঠি স্থাপন করে যে কারণে ভদ্রেশ্বরের একাংশ দিনেমার ডাঙ্গা নামে আজও পরিচিত। অতঃপর এখানে জার্মান (অষ্ট্রীয় ও প্রুশীয়দের যৌথ উদ্যোগ) অস্টেন্ড কোম্পানী কুঠি নির্মাণ করে বাণিজ্য শুরু করে। এই কোম্পানী 'জার্মান সততার' সঙ্গে বাণিজ্য করায় অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানীগুলির বিষনজরে পড়ে এবং শেষ পর্যন্ত ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কোম্পানী কারবার গুটিয়ে দেশে ফিরে যায়। ভদ্রেশ্বরের পুরাকীর্তি হিসাবে তেলিনীপাড়ার অন্নপূর্ণা মন্দির এবং পাইকপাড়ার রামসীতা মন্দির উল্লেখযোগ্য। অন্নপূর্ণা মন্দিরটি তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। বিশাল নবরত্ন মন্দির, আয়তনের দিক থেকে বাকসাড়া রঘুনাথ মন্দির ও মহানাদের ব্রহ্মময়ী মন্দিরের সঙ্গে তুলনীয়। রামসীতা মন্দিরটিও

নবরত্ন এবং 'টেরাকোটা' অলঙ্করণ সমৃদ্ধ। মৃৎফলকের উপর কৃষ্ণলীলার দৃশ্যরাজি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দুঃখের বিষয় এগুলির অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়েছে।

ভাঙ্গামোড়া

আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত ভাঙ্গামোড়া পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ২। তারকেশ্বর রেলস্টেশন থেকে গোপীনাথপুর হয়ে দামোদর পেরিয়ে ভাঙ্গামোড়ায় যেতে হয়। এখানে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত কয়েকটি মন্দির আছে। বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ প্রতিষ্ঠিত শীতলা মন্দিরটি আটচালা, আকারে ছোট্ট একদ্বার বিশিষ্ট। সম্মুখে মৃৎফলকের কলাকৃতি দেখা যায়। দ্বিতীয় মন্দিরটি পঞ্চরত্ন, ময়রাদের প্রতিষ্ঠিত বর্তমানে পরিত্যক্ত। মন্দিরটি পূর্বমুখী, খাঁজকাটা রেখ ধরনের শিখর এবং একটিমাত্র প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট। সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণ বর্তমান। দে বংশ প্রতিষ্ঠিত আটচালা মন্দিরটি পরিত্যক্ত হলেও মোটামুটি ভাল অবস্থায় আছে। এই মন্দিরটিতেও 'টেরাকোটা' অলঙ্করণের নিদর্শন পাওয়া যায়। আরও একটি আটচালা মন্দির ভাঙ্গামোড়ায় আছে, বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং একটি বৃহৎ বটগাছের দ্বারা আচ্ছাদিত।

ভাণ্ডারহাটি

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত ভাণ্ডারহাটি ১নং পঞ্চায়েত এলাকায় ভাণ্ডারহাটি গ্রাম অবস্থিত, জে এল নম্বর ৮০। ধনিয়াখালি থেকে ৬ কিমি দক্ষিণে ধনিয়াখালি-হরিপাল রাস্তার উপরে ভাণ্ডারহাটির অবস্থান। এখানকার জমিদার চৌধুরী পরিবারের ভবনটির অবশেষ এবং বেনেপাড়া অঞ্চলে সুবর্ণবণিকদের ঘন সন্নিবিষ্ট প্রাচীন অট্টালিকাশ্রেণী এতদকালের পুরাতন সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দেয়। এই অঞ্চলের পুরাকীর্তির গুরুত্ব সম্পর্কে বলা যায় যে এখান থেকে বহু সংস্কৃত পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি কলকাতার সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এখান থেকে প্রাপ্ত একটি বোধিসত্ত্ব লোকেশ্বর মূর্তি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ভাণ্ডারহাটিতে পনেরটি শিবমন্দির আছে, আটটি চৌধুরীপাড়ায় এবং সাতটি চ্যাটার্জিপাড়ায়। ছয়টি মন্দির তারিখযুক্ত, নির্মাণকাল ১৭৩৯, ১৭৪২, ১৮১৩ (দুইটি), ১৮৫৯ এবং ১৮৮৬। বাকিগুলি উনিশ শতকের কোন না কোন সময়ে নির্মিত। দুটি মন্দির বাদ দিয়ে বাকিগুলি আটচালা। ব্যতিক্রমী দুটি মন্দিরের মধ্যে একটি এক শিখর বিশিষ্ট এবং অপরটি দোতলা, দালান ধরনের। এছাড়া দোলমঞ্চতলায় উনিশ শতকে নির্মিত একটি আটকোণা দোলমঞ্চ বর্তমান।

ভালিয়া

আরামবাগ থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বাতানল পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত একটি গ্রাম, জে এল নম্বর ৭৩। আরামবাগ থেকে আরামবাগ-তারকেশ্বর রাস্তা ধরে পূর্বমুখো ৬ কিমি এগিয়ে এসে উত্তরাভিমুখী পথে ৫ কিমি অগ্রসর হলে ভালিয়ায় উপনীত হওয়া যায়। এখানকার রঘুনাথ মন্দির ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে সরকার বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, আটচালা, দৈর্ঘ্যে ২৪ ও প্রস্থে ২৩ ফুট, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারসহ। সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর কৃষ্ণসহ নানা দেবমূর্তি, রাজদরবারের চিত্রাবলী এবং পশু ও পত্রপুষ্পের অলঙ্করণ বিদ্যমান।

ভাস্তারা

সদর মহকুমার ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত ভাস্তারা নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৫৩। গুড়াপ থেকে এবং চুঁচুড়া বা মগরা থেকে সরাসরি বাসে ভাস্তারা যাওয়া যায়। এখানকার পুরাকীর্তিসমূহ স্থানীয় সিংহবংশের প্রেরণায় গড়ে ওঠে। ভাস্তারার সিংহ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণপ্রাণ সিংহ ধনিয়াখালির বোসো গ্রাম থেকে এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে কুলদেবতা রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ সেখানে স্থাপন করেন। কৃষ্ণপ্রাণের প্রপৌত্র ছকুরাম সিংহ এই অঞ্চলে পথঘাট নির্মাণ, জলাশয় ও দেবালয় স্থাপন, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি কাজে অগ্রগণ্য ছিলেন। শ্রীধরমন্দির প্রাঙ্গণে দোল উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ছকুরামের নির্মিত বিরাট রথটি এখনও আছে। এছাড়া তিনি ত্রিবেণীর বেণীমাধব মন্দির সংস্কার করেন এবং সেখানে আরও ছয়টি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন (ত্রিবেণী দ্রষ্টব্য)। তিনি ত্রিবেণী থেকে ভাস্তারা পর্যন্ত তেইশ মাইল দীর্ঘ সুপ্রশস্ত এক পথ নির্মাণ করেন এবং তার দুদিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে বৃক্ষরোপণ করেন। ভাস্তারার জনসাধারণ পুরাকীর্তি সচেতন এবং একটি মন্দির সংস্কার সমিতিও একদা খুবই সক্রিয় ছিল। সংস্কৃত মন্দিরসমূহের মধ্যে স্বয়ম্ভূদেবের মন্দির উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি এক শিখরবিশিষ্ট। নির্মাণকাল উনিশ শতক। সুপ্রাচীন অতীতে যে ভাস্তারা অঞ্চলটি খুবই সমৃদ্ধ ছিল তার প্রমাণ হিসাবে বলা যায় যে পুষ্করিণী প্রভৃতি খননের সময় এখান থেকে বিষ্ণু, সূর্য, বরাহ প্রভৃতির মূর্তি পাওয়া গেছে। দশম শতকের পাল আমলের কিছু মূর্তি যা এখান থেকে পাওয়া গেছে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রক্ষা করা হয়েছে। এখানে ডিঙ্গাভাঙ্গার সাঁকো থেকে একটি চামুণ্ডা মূর্তি সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। মূর্তিটি লম্বায় এক ফুট এবং চওড়ায় নয় ইঞ্চি, বর্তমানে গ্রামদেবতা হিসাবে পূজিত। এখানে মাখন

পীরের আস্তানা আছে যেখানে বহু লোক আজও সিন্নি মানত করে। ভাস্তারার অপরাপর পুরাকীর্তির মধ্যে উনিশ শতকে নির্মিত তিনটি শিবমন্দির উল্লেখযোগ্য, দুটি সমতল ছাদবিশিষ্ট দালান ধরনের। তৃতীয়টি অষ্টকোণ এবং গম্বুজাকৃতি শিখরবিশিষ্ট।

ভুঁইপাড়া

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বেলুন-ধামাসীন পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৮৩। এখানে পাণ্ডুয়া থেকে যাওয়াই সুবিধাজনক। ভুঁইপাড়ায় আজগবী সাহেব, আকদিল সাহেব ও আলী পীর সাহেবের সমাধি আছে।

ভুইমোহন

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত জামনা পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৯। ভুইমোহন বৈঁচি-বৈদ্যপুর রাস্তার সন্নিকটে পীড়াগ্রামের বাসস্ট্যাণ্ড থেকে মাত্র দশ-বারো মিনিটের পথ। গ্রামটি ধুসা নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সব্দার মিস্ত্রী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি তিনগম্বুজ বিশিষ্ট বড় মন্দির আছে।

মণ্ডলাই

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত জামগ্রাম-মণ্ডলাই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৩৭। পাণ্ডুয়া রেলস্টেশন থেকে ৫ কিমি দূরবর্তী। এখানকার করবংশ প্রতিষ্ঠিত গোপাল মন্দির ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি উত্তরমুখী, আটচালা, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার এবং সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ বিশিষ্ট।

মলয়পুর

আরামবাগ থানা ও ব্লকের অন্তর্গত মলয়পুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত গ্রাম, জে এল নম্বর ৬৯। এখানে উনিশ শতকে নির্মিত একদ্বার বিশিষ্ট ছোট আটচালা মন্দির আছে। কিন্তু প্রথাগত আটচালা বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে এই মন্দিরটির কিছু পার্থক্য আছে। এখানে মন্দিরের উপর রথ বা রত্নমন্দির ধরনের শিখর স্থাপন করা হয়েছে।

মহানাদ

পোলবা থানার অন্তর্গত সুবিখ্যাত গ্রাম। মহানাদ পাণ্ডুয়া রেলস্টেশন থেকে সোয়া ছয় কিমি দক্ষিণে অবস্থিত। পাণ্ডুয়া থেকে বাসে বা রিকশায় যাওয়া যায়।

মগরা রেলস্টেশন থেকে মহানাদ আট কিমি উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। মগরা থেকে মহানাদ যাওয়ার পাকা বাসরাস্তা আছে। চুঁচুড়া থেকেও সরাসরি বাসে মহানাদ যাওয়া যায়।

মহানাদ হুগলী জেলার একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান। এখানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার তরফ থেকে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুসন্ধান চালিয়ে ননীগোপাল মজুমদার তাঁর রিপোর্টে বলেন, 'The village of Mahanad in the Hoogly District has from time to time yielded gold coins of Kushana and Gupta dynasties and its antiquity is proved also by the numerous mounds situated in this village and its neighbourhood as well as by fragments of stone sculptures that lie scattered all over the locality.' এখান থেকে আবিষ্কৃত গুপ্ত যুগের কিছু নিদর্শন কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে। মজুমদারের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার উদ্যোগে এখানে সামান্য খননকার্য চালানো হয় যার ফলে গুপ্তযুগের একটি প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তীকালে স্থানীয় প্রত্নতত্ত্বপ্রেমিক শ্রীপ্রভাসচন্দ্র পাল মহানাদ থেকে বহু প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কার করেন এবং সেগুলি কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে প্রেরণ করেন। দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালাতেও কিছু নিদর্শন প্রেরিত হয়। সামান্য কিছু নিদর্শন নিয়ে তিনি নিজের বাড়িতেও একটি ছোট সংগ্রহশালা করেন। বৈদ্যবাটির সারদাচরণ মিউজিয়ামেও কিছু মহানাদের সামগ্রী আছে।

মহানাদ থেকে প্রাপ্ত যে সকল নিদর্শন কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে আসে সেগুলির মধ্যে জম্ভল ও মায়াদেবীর প্রস্তরমূর্তি (পার্শ্ববর্তী সুদর্শন গ্রাম থেকে সংগৃহীত), গুপ্তযুগের মৃৎপাত্র, পোড়ামাটির ছাঁচ, পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের একটি স্টাকো, পাল যুগের একটি হরপার্বতী মূর্তি, পার্শ্ববর্তী রোসনা পল্লীতে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্তি, রাজা শশাঙ্কের সুবর্ণমুদ্রা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে একটি কুমারগুপ্তের সুবর্ণমুদ্রা ও একটি স্কন্দগুপ্তের সুবর্ণমুদ্রা সংরক্ষিত আছে। এখানকার বশিষ্ঠ গঙ্গায় আবিষ্কৃত একটি একপাদ-ভৈরবমূর্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে রাখা আছে। বৈদ্যবাটির সারদাচরণ মিউজিয়ামে মহানাদ থেকে আবিষ্কৃত গুপ্তযুগের মৃন্ময় প্রদীপ, চারটি মৃন্ময় ঢাকনি, তিনটি মৃন্ময় ওজনের বাটখারা ও একটি মৃন্ময় টাকু, পালযুগের দুটি প্রস্তরের বিষ্ণুমূর্তি এবং মুসলমান যুগের নকশাযুক্ত ইট, রঙিন মৃৎপাত্র, নকশাকাটা হাঁড়ি প্রভৃতি সামগ্রী রক্ষিত আছে।

পাল-সেন আমলে মহানাদ একটি সামন্তরাজ্য ছিল। ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিকে পাণ্ডুয়ায় মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর মহানাদও তুর্কী অধিকারে আসে। আরও পরবর্তীকালে এই স্থানে বর্ধমানের মহারাজার জমিদারী প্রসারিত হয়। মহানাদে হিন্দুধর্মের শৈব-শাক্ত ধারাটি জনপ্রিয় হয়। এছাড়া এখানে নাথ ধর্মেরও বিশেষ প্রসার ঘটে। মহানাদের নাথ সম্প্রদায়ের বিশেষ দেবতা ছিলেন জটেশ্বরনাথ শিব যাঁকে কেন্দ্র করে এখানে নাথ সম্প্রদায়ের একটি মঠ গড়ে ওঠে। মঠাধীশের উপাধি ছিল যোগীরাজ।

জটেশ্বরনাথের মন্দির ঠিক কবে কার দ্বারা নির্মিত হয়েছিল বলা যায় না। গঠনশৈলী দেখে মনে হয় যে এটি অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি নির্মিত হয়েছিল। পরে তারকচন্দ্র সাহা মন্দিরটি সংস্কার করেন। পূর্বমুখী এই মন্দিরটি একরত্ন, রেখ ধরনের, বক্ররেখ শিখরযুক্ত। এই মন্দিরের গঠনরীতির সঙ্গে মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের সাদৃশ্য আছে। বাঁকানো কার্নিস, ভিতরের ছাদ অবতলিত ও আলম্বনিবদ্ধ, খিলানের ধরন কৌণিক ও পলকাটা, ফুলের নক্শাকাটা মোটা থেকে সরু হয়ে যাওয়া স্তম্ভের উপর ন্যস্ত, সমতল ছাদ দিয়ে ঘেরা প্রদক্ষিণপথ। মন্দির সংলগ্ন এলাকায় একপাদ-ভৈরব, ভৈরবনাথ, কালভৈরব প্রভৃতির প্রস্তরমূর্তি, একটি বিশাল যোনিপট্ট লিঙ্গ এবং লিঙ্গের ভগ্নাংশ, এবং পাল-সেন যুগের স্থাপত্যের কিছু টুকরো ভাঙ্গা নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

জটেশ্বরনাথের নিকটেই ঝাপতলায় অনেকগুলি ছোটখাটো মন্দির আছে যেগুলির মধ্যে অন্নপূর্ণার জোড়-বাংলা মন্দিরে দেবীমূর্তির পাশে দুটি বুদ্ধমূর্তি বিদ্যমান। এই জোড়-বাংলা ধরনের মন্দিরটি উত্তরমুখী, বাঁকানো কার্নিসযুক্ত, উভয়পার্শ্বে কানাওয়ালা ছাদের প্রান্তস্থ দেওয়ালের ত্রিকোণ অংশ শিরার ন্যায় পরিদৃশ্যমান, গর্ভগৃহ এবং সংলগ্ন বারান্দা আয়তাকার, ভিতরের ছাদ কৌণিকভাবে অবতলিত, তিনটি গোলাকার খিলানযুক্ত বহির্ভাগ। গঠনশৈলীর বিচারে মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে নির্মিত। ঝাপতলার আর একটি মধ্য ঊনবিংশ শতকে নির্মিত নাথ যোগী সম্প্রদায় পরিচালিত শিবমন্দির আছে। পশ্চিমমুখী এই মন্দিরের ছাদ-অর্ধগোলাকৃতি, শিখর গম্বুজাকৃতি। কার্নিস বাঁকানো, খিলানযুক্ত প্রবেশপথ, খিলান পলকাটা এবং কলসাকৃতি ভিত্তির উপর দাঁড়ানো ফুলের নক্শাকাটা স্তম্ভের বন্ধনে আবদ্ধ।

মহানাদের করপাড়ায় অনেকগুলি মন্দির আছে। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ভীমচন্দ্র কর কর্তৃক নির্মিত ভুবনেশ্বর শিবের মন্দিরটি আটচালা ও পূর্বমুখী। বিহগাকৃতি বন্ধনীর উপর বাঁকানো কার্নিস। ভিতরের ছাদ অবতলিত ও আলম্বনিবদ্ধ, খিলানযুক্ত প্রবেশপথ, খিলান পলকাটা ও কলসাকৃতি ভিত্তির উপর দাঁড়ানো ফুলের নকশাকাটা স্তম্ভের বন্ধনে আবদ্ধ। করপাড়ায় অবস্থিত ভীমচন্দ্র কর

নির্মিত চন্দ্রশেখর শিবের মন্দিরটি পূর্বোক্ত মন্দিরের অনুরূপ। করপাড়ার সুবিখ্যাত লালজীউর মন্দির ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে করবংশের দ্রবময়ী দাসী কর্তৃক নির্মিত। উচ্চ ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটি একচূড়। চূড়াটি পিরামিডের মত, চূড়ার সর্বোচ্চ অংশটি গম্বুজাকৃতি। প্রবেশদ্বারের খিলান পলকাটা, গ্রীক ধরনের স্তম্ভের আলম্বে নির্মিত। ছাঁচে তৈরি আস্তরের দ্বারা অলঙ্কৃত। করপাড়ায় আরও দুটি সমতল ছাদ বিশিষ্ট মন্দির আছে। দুটিই ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত এবং বর্তমানে পরিত্যক্ত। দুটি মন্দিরই চতুষ্কোণ, পূর্বমুখী, মোটা থেকে সরু হয়ে আসা স্তম্ভের আলম্বে নিবদ্ধ ঢাকা পলকাটা খিলান। ছাঁচে তৈরি আস্তরের নক্শায় অলঙ্কৃত।

চৌমাথায় অবস্থিত উত্তরপশ্চিমমুখী অগ্নীশ্বর শিবের আটচালা মন্দির ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বর্ধমান রাজপরিবারের তেজচাঁদ বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত। মন্দিরের ছাদ অর্ধগোলাকৃতি, কার্নিস বাঁকানো, সাদামাটা খিলান। প্রায় একই সময়ে নির্মিত দক্ষিণপাড়ার গোটেশ্বর শিবের মন্দিরও বাঁকানো কার্নিস, অর্ধগোলাকৃতি ছাদ ও সমভূজ খিলান বিশিষ্ট। এই মন্দিরটি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী কর্তৃক নির্মিত। দক্ষিণপাড়ায় কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগীর ঠাকুরবাড়ির দোচালা-দালান টাসকান ধরনের স্তম্ভশ্রেণীর উপর গঠিত তিনটি অর্ধগোলাকৃতি খিলানের উপর ন্যস্ত। মূল খড়ের চালের বদলে এখন করোগেটেড টিনের চাল লাগানো হয়েছে। ঠাকুরদালানটির নির্মাণকাল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক। উক্ত কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী প্রতিষ্ঠিত ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত দক্ষিণপাড়ার ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির মহানাদের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়, যদিও মন্দিরটিকে বর্তমানে আগাগোড়া সংস্কার করা হয়েছে। উচ্চ মঞ্চের উপর অধিষ্ঠিত এই ত্রিতল নবরত্ন মন্দিরের শিখরগুলি অষ্টকোণযুক্ত বেলনাকার, সরু খিলানের উন্মুক্তিসহ, সর্বোচ্চ অংশ গম্বুজাকৃতি। মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মময়ী কালিকাদেবী ও চারকোণে চারটি শিবলিঙ্গ এবং তিনতলার সুবৃহৎ চূড়ায় হংসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বিরাজিত। বারান্দার চার কোণে প্রকোষ্ঠ। গর্ভগৃহের উত্তরে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে আইওনীয় ধরনের স্তম্ভের উপর পলকাটা খিলান। দ্বিতলেও অনুরূপ খিলান বর্তমান। এই মন্দিরের আকারের বিরাটত্ব সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মহানাদে কাজীমন ফকিরের সমাধি একটি পবিত্র স্থান হিসাবে মুসলমান ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের নিকট পরিচিত। অনুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত সমাধিস্থলটিকে ঘিরে প্রতি বছর ১লা মাঘ একটি মেলা বসে।

মহেশপুর

জাঙ্গীপাড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত রাধানগর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। এখানে সপ্তদশ শতকে নির্মিত একটি খুব ছোট পরিত্যক্ত আটচালা মন্দির আছে, পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৩ ফুট ও প্রস্থে ১২ ফুট ৩ ইঞ্চি। মন্দিরটি একদ্বারবিশিষ্ট। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী বর্তমান।

মাকালপুর

পোলবা-দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত মাকালপুর নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৩০। এখানকার সিংহরায় বংশের ঈশ্বর সিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দ্বাদশ শিবের মন্দির উল্লেখযোগ্য। আটচালা এই বারোটি মন্দিরের নির্মাণকাল ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ। এছাড়া নেত্র সিংহ প্রতিষ্ঠিত জোড়া শিবমন্দির এবং তাঁর ভাই চিত্র সিংহ প্রতিষ্ঠিত পঞ্চরত্ন মন্দির ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দ্বাদশ শিবমন্দির জমিদারপাড়ায় অবস্থিত, যেখানে শ্রীধর জীউর আরও একটি মন্দির বর্তমান। এই মন্দিরটি দালান ধরনের সমতল ছাদযুক্ত তবে ছাদের কেন্দ্রে একটি শিখর বর্তমান। পূর্বোক্ত জোড়াশিবমন্দির ডাকাতপাড়ায় অবস্থিত। এছাড়া সৎপাড়াতেও একটি আটচালা শিবমন্দির আছে। জমিদার পাড়ায় সিংহরায়দের দুটি অট্টালিকার পরিচয় পাওয়া যায় যেগুলির নির্মাণশৈলীর ক্ষেত্রে বিদেশী রীতির প্রতিফলন দেখা যায়।

মাধবপুর

আরামবাগ থানা ও ব্লকের অন্তর্গত মাধবপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৪৬। মাধবপুর মায়াপুর বাস স্টপেজ থেকে দুই কিমি দূরে অবস্থিত। মাধবপুর গ্রামের রায় বংশ প্রাচীন জমিদার বংশ। এই জমিদারেরা রাজা রণজিৎ রায়ের বংশধর বলে কথিত (দ্রষ্টব্য পারুল)। এই বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাম মন্দিরটি ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি আটচালা, পূর্বমুখী, সম্মুখভাগে উদ্ভিজ্জধর্মী কিছু অলঙ্করণ বিদ্যমান।

মামুদপুর

গোঘাট থানা ও ব্লকের অন্তর্গত শ্যামবাজার পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৩৫। কামারপুকুর থেকে মামুদপুরের দূরত্ব মাত্র ৬ কিমি। এখানকার বিষ্ণু মন্দিরটি রায়বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। নির্মাণকাল ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন, শিখরগুলি রেখ ধরনের খাঁজকাটা এবং তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিশিষ্ট। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর কারুকার্য বর্তমান। দেবতা, রামায়ণের কাহিনী, রাজদরবার, পশুপক্ষী ও পত্রপুষ্প এই কারুকর্মের বিষয়বস্তু।

মামুদপুর

মগরা থানার অন্তর্গত গ্রাম, মগরা থেকে বাসে যাওয়া যায়। এখানে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় মুখোপাধ্যায় বংশ প্রতিষ্ঠিত একটি আটচালা শিবমন্দির আছে।

মারসিট

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বেলুন-ধামাসীন পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১০০। এটি বেলুনের পার্শ্ববর্তী গ্রাম, পাণ্ডুয়া থেকে যেতে হয়। এখানে পীর ইসমাইল শাহের মাজার আছে। প্রতিবছর ৮ই মাঘ তারিখে তাঁর উরস উৎসব সম্পন্ন হয়।

মালঞ্চ

গোঘাট থানার অন্তর্গত বালি দেওয়ানগঞ্জ থেকে ৬ কিমি দূরবর্তী। এখানে চক্রবর্তীবংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি আটচালা শিবমন্দির আছে। নির্মাণকাল ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। মন্দিরটির পরিমাপ সামান্য কিছু মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী বর্তমান। দেবতা ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ এই চিত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য।

মাহেশ

শ্রীরামপুর সংলগ্ন প্রাচীন স্থান। কিংবদন্তী অনুযায়ী প্রাচীনকালে জগন্নাথদেব শ্রীক্ষেত্র থেকে গঙ্গাস্নান করতে এসে এখানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন যে কারণে এখানে তাঁর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয় এবং রথযাত্রা চালু হয়। মাহেশের সুবিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরের ইতিহাস খুবই বিচিত্র। জনশ্রুতি অনুযায়ী ধ্রুবানন্দ নামে এক ব্রহ্মচারী গঙ্গাতীরে বালুকামধ্যে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি প্রাপ্ত হন এবং সেগুলিকে মাহেশে প্রতিষ্ঠা করেন। শেওড়াফুলি রাজবংশের কাগজপত্র থেকে জানা যায় যে রাজা মনোহর রায় মাহেশে প্রথম জগন্নাথদেবের মন্দির নির্মাণ করেন এবং জগন্নাথ দেবের সেবার জন্য জগন্নাথপুর নামে একটি গ্রাম দান করেন। হান্টারের মতে জগন্নাথ মন্দির ষোড়শ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এটি বল্লভপুরের রাধাবল্লভ মন্দিরের সমসাময়িক। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে নবাব খান আলি গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করার সময় ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে জগন্নাথদেবের মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মন্দিরের সেবায়েত রাজীব অধিকারীর যত্নে প্রীতিলাভ করে তিনি জগন্নাথের সেবার জন্য জগন্নাথপুর মহালের রাজস্ব মকুব করে একটি ছাড়পত্র দেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই দেশের দেওয়ানি গ্রহণ করলে ওই ছাড়পত্র কোম্পানীর নিকট দাখিল করা হয়। কোম্পানীও অতঃপর জগন্নাথপুর মহালকে নিষ্কর বলে ঘোষণা করে। রাজা মনোহর রায় কর্তৃক নির্মিত মন্দির ভগ্ন হয়ে গেলে সপ্তগ্রামের মল্লিক বংশোদ্ভূত নিমাইচরণ মল্লিক ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নূতন

করে জগন্নাথ মন্দির গড়ে তোলেন। মন্দিরটির পরিমাপ ২২ বর্গফুট। রেখ ধরনের এই মন্দিরটি বারান্দাযুক্ত। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর স্থানে স্থানে পুষ্পচিত্র সমাবেশিত।

মুখটিকরি

পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত গ্রাম। এখানে ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দে কাতুরা খান প্রতিষ্ঠিত একটি এক-গম্বুজ মসজিদ আছে।

মেঘসার

পোলবা-দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত মহানাদ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১২৫। দ্বারবাসিনী হয়ে মেঘসার যেতে হয়। কথিত আছে মহানাদের রাজা অম্বরেন্দ্র তাঁর পত্নী মেঘমালার জন্য মেঘসরোবর নামে একটি দিঘি খনন করেন। এই মেঘসরোবর থেকে মেঘসার নাম হয়েছে। এখান থেকে সাড়ে-তিনফুট উচ্চতাবিশিষ্ট একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়।

মেমানপুর

গোঘাট থানা ও ব্লকের অন্তর্গত। এখানে সপ্তদশ শতকে নির্মিত বলে কথিত একটি মাকড়া পাথর দিয়ে তৈরি মন্দির আছে। মন্দিরটি শ্যামসুন্দর মন্দির নামে পরিচিত। পরিমাপ ২৬ বর্গফুট। সাদামাটা অলঙ্করণশূন্য। গঠনের দিক থেকে পঞ্চরত্ন, খাঁজকাটা রেখ ধরনের শিখর ও খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট। ছাদ ও প্রবেশদ্বারের মধ্যবর্তী অংশ যতটা না উঁচু তার চেয়ে অনেক বেশি চওড়া।

মৌবেশ

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকে অবস্থিত চোপার নিকটবর্তী একটি গ্রাম, গুড়াপ স্টেশন থেকে বাসযোগে দশঘরা যাওয়ার পথে পড়ে। এখানে ঘোষবংশ প্রতিষ্ঠিত উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত একটি পশ্চিমমুখী আটচালা শিবমন্দির আছে। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর দেবতা ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী বিদ্যমান।

রঘুনাথপুর

আরামবাগ মহকুমার খানাকুল থানার অন্তর্গত। খানাকুল থেকে রিকশায় যেতে হয়। এখানে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত গম্বুজাকার শিখর বিশিষ্ট নারায়ণ মন্দির, উনিশ শতকে নির্মিত দালান ধরনের শিব-শীতলার মন্দির, বাঁকা রায়ের দোলমঞ্চ ও রামমোহন রায়ের স্মৃতিবিজড়িত গৃহের অবশেষ দেখা যায়।

রসুলপুর

আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানা ও ব্লকের দিহিবাতপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। এখানে একটি আটকোণা আটচালা মন্দির আছে। আটটি খিলানযুক্ত গম্বুজাকৃতি ছাদের উপর অনুরূপ ছোট আর একটি গম্বুজাকার ছাদ সহযোগে এই ব্যতিক্রমী আটচালাটি নির্মিত। প্রবেশদ্বারের দুই পাশে লম্বালম্বি কিছু অলঙ্করণ বিদ্যমান।

রাজবলহাট

জাঙ্গীপাড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত পঞ্চায়েত এলাকার কেন্দ্রীয় গ্রাম। পূর্বে হাওড়া ময়দান থেকে মার্টিন কোম্পানীর রেলে আঁটপুর স্টেশনে নেমে রাজবলহাটে যেতে হত। এখন তারকেশ্বর শাখার হরিপাল রেলস্টেশনে নেমে বাসে করে সহজেই রাজবলহাটে যাওয়া যায়। রাজবলহাটের নামকরণ এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাজবল্লভীর নামানুসারে হয়েছে। পূর্বে এই স্থান ভূরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ষোড়শ শতকে রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় কর্তৃক রাজবল্লভীর মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরটি বর্তমানে আমূল সংস্কৃত। রাজবল্লভীর মূর্তি অদ্ভুত, বাম হস্তে রুধির পাত্র, দক্ষিণ হস্তে ছুরিকা। বাম পদ বিরূপাক্ষ মহাদেবের মস্তকে, দক্ষিণ পদ মহাকাল ভৈরবের বক্ষে ন্যস্ত। মূর্তিটি উচ্চতায় প্রায় ছয় ফুট। পীঠনির্ণয় গ্রন্থে রাজবলহাটকে একটি শাক্ত পীঠ বলা হয়েছে। বয়নশিল্পের জন্য রাজবলহাট খুবই বিখ্যাত, যে কারণে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে একটি কমার্সিয়াল রেসিডেন্সি চালু করে। গ্রামটি খুবই সুবিন্যস্ত যে কারণে প্রবাদ আছে, 'চার চক, চোদ্দ পাড়া তিন ঘাট; এই নিয়ে হয় রাজবলহাট'। এখানে শীলপাড়ার শীলদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীধর দামোদর ও ঘটকদের রাধাকান্ত মন্দির 'টেরাকোটা' ভাস্কর্যশিল্পের অপরূপ নিদর্শন। মন্দির দুটি আটচালা, যথাক্রমে ১৭২৪ ও ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দামোদর মন্দির দৈর্ঘ্যে ২০ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১৯ ফুট। রাধাকান্ত মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ২১ ফুট ৮ ইঞ্চি। উভয় মন্দিরই তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিশিষ্ট। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর দেবতা, রাজদরবার, রামায়ণ, পশু ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ বিদ্যমান। রাধাকান্ত মন্দির প্রাঙ্গণে আরও কয়েকটি দেবদেউল ছিল কিন্তু সেগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। দত্ত পরিবারের দামোদর মন্দিরটি ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এটি পঞ্চরত্ন, সামান্য 'টেরাকোটা' অলঙ্করণযুক্ত। চক্রবর্তী পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আটচালা সীতারাম মন্দিরটি ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত, দৈর্ঘ্যে ১৭ ফুট ৮ ইঞ্চি, প্রস্থে ১৬ ফুট ৫ ইঞ্চি। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার ও বহির্ভাগে 'টেরাকোটা'র কারুকার্য বিশিষ্ট। উনবিংশ

শতাব্দীর প্রথম দিকে কুণ্ডুদের প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ মন্দিরটি একরত্ন এবং বহির্ভাগে সামান্য 'টেরাকোটা' অলঙ্করণযুক্ত। এছাড়া রাজবলহাটে কয়েকটি আটচালা শিবমন্দির আছে। সানাপাড়ার শিবমন্দিরদ্বয় অষ্টাদশ শতকে নির্মিত। রাজবল্লভী ট্রাস্টের দ্বারা রক্ষিত আরও চারটি আটচালা শিবমন্দির উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের নামে রাজবলহাটে 'অমূল্য প্রত্নশালা' বিদ্যমান। এখানে সংগৃহীত পুরাবস্তুসমূহ যথেষ্ট বৈচিত্র্যময়। রাঢ় বাংলার বিভিন্ন পল্লী থেকে সংগৃহীত বহু পুঁথি, মূর্তি, মুদ্রা, পট, কাঠশিল্পের নিদর্শন, শোলার কাজ, চিত্রাবলী, যুদ্ধাস্ত্র প্রভৃতি এই প্রত্নশালার সম্পদ। ব্রহ্মদেশের ও চীনদেশেরও কিছু সামগ্রী এখানে আছে।

রাজহাটি

খানাকুল থানা ও ব্লকের অন্তর্গত রাজহাটি ২নং পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৮২। গ্রামটি খানাকুল থেকে ৫ কিমি দূরে অবস্থিত। এখানে তিনটি প্রথাগত আটচালা মন্দির আছে। এইগুলির মধ্যে বিশালাক্ষী মন্দিরটি সর্বপ্রাচীন, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে স্থানীয় পারিয়াল পরিবার কর্তৃক নির্মিত। দ্বিতীয় মন্দিরটিও পূর্বোক্ত পরিবার কর্তৃক সম্ভবত একই সময়ে নির্মিত। এই মন্দিরটি সিংহবাহিনী মন্দির নামে পরিচিত। দুটি মন্দিরই দক্ষিণমুখী। উভয় মন্দিরগাত্রেই অলঙ্কৃত মৃৎফলক সমাবেশিত। কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবমূর্তি, রামায়ণের কাহিনী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ এই চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু। তবে প্রথমটির তুলনায় দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে চিত্রাবলীর আধিক্য দেখা যায়। তৃতীয় মন্দিরটি শিবমন্দির। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। মন্দিরটির নির্মাণকাল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। এই মন্দিরগাত্রেও মৃৎফলকের উপর কিছু চিত্রের সমাবেশ আছে।

রাধানগর

ধনিয়াখালি থেকে চুঁচড়া-তারকেশ্বর বাসরাস্তার উপর অবস্থিত গ্রাম। এখানে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি শিবমন্দির এবং চারকোণযুক্ত একটি দোলমঞ্চ আছে।

রাধানগর

খানাকুল থানার অন্তর্গত। খানাকুল থেকে রিকশায় যাওয়া যায়। এখানে দুটি আটচালা শিবমন্দির, একটি রাসমঞ্চ ও একটি দোলমঞ্চ আছে। নির্মাণকাল উনিশ শতক।

রানিবাজার

হরিপাল রেলস্টেশন থেকে আঁটপুর হয়ে রানিবাজার যেতে হয়। এখানে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি অতি বিশাল আটচালা শিবমন্দির আছে। এখানে অষ্টাদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী কালীর বিশাল আটচালা মন্দিরটিও দর্শনীয়।

রামনগর

আরামবাগ থানা ও ব্লকের অন্তর্গত সালেপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৯৪। গ্রামটি আরামবাগ শহর থেকে ৬ কিমি দূরে অবস্থিত। এখানকার হালদার বংশ প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরটি বিখ্যাত। মন্দিরটি প্রথাগত আটচালা, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার বিশিষ্ট। নির্মাণকাল ১৭৪১ খ্রীষ্টাব্দ। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর উৎকীর্ণ চিত্রাবলী দৃশ্যমান। কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবমূর্তি, রামায়ণের কাহিনী, রাজদরবারের দৃশ্য ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ এই চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু।

রিষড়া

হাওড়া স্টেশন থেকে মাত্র এগারো মাইল বা সতের কিমি উত্তরে রিষড়া রেলস্টেশন হাওড়া-ব্যাণ্ডেল লাইনে অবস্থিত। রিষড়া শ্রীরামপুরের ঠিক পূর্ববর্তী স্টেশন বর্তমানে খুবই শিল্পসমৃদ্ধ ও অবাঙালী অধ্যুষিত এলাকা। রিষড়ায় ডেনীয়দের একটি ছাপা কাপড়ের কারখানা ছিল। এখানে নীলচাষও হত, একটি নীলকুঠির অবশেষ আজও রিষড়ায় আছে। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রথম চটকল রিষড়াতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। রিষড়ায় প্রস্তুত আরও দুটি সামগ্রী লুপ্ত পুরাকীর্তির পর্যায়ে পড়ে, যা হল বাদামী রাম (মদ্য) এবং রাক্ষুসে গজা। বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস রিষড়ায় ৬০ বিঘা জমির উপর একটি বাগানবাড়ি করেছিলেন যেখানে তিনি প্রায়ই বিশ্রাম করতে আসতেন। বর্তমানে এই ভবনটি হেস্টিংস জুট মিলের অন্তর্গত, এবং শ্রীমতী হেস্টিংসের রোপিত আমগাছের কয়েকটি এখনও বর্তমান। রিষড়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির খুবই প্রাচীন। এটি ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে জটাধর পাকড়াশী কর্তৃক প্রথম নির্মিত হয়। রেজা খাঁ এই দেবীর সেবার জন্য ১৮ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমি ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দান করেন। তিলকরাম দাঁ প্রতিষ্ঠিত মদনগোপালের মন্দির ও রাসমঞ্চ, শিবমন্দির ও স্নানের ঘাট রিষড়ার পুরাকীর্তিসমূহের উল্লেখযোগ্য স্মারক। সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরটি নবরত্ন ধরনের। শিখরগুলির উদ্গত অংশ প্রতি তলের উচ্চতার সঙ্গে সমতাসম্পন্ন, কেন্দ্রীয় শিখরটি মোচাকৃতি, সামনে বড় দালান। সিদ্ধেশ্বরীর বর্তমান মন্দিরটি অবশ্য খুব প্রাচীন নয়। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। শিবমন্দিরটি

প্রথাগত আটচালা। স্থানীয় লৌকিক দেবতা কালু রায়ের মন্দির সমতল ছাদ বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্রাকার কক্ষ মাত্র। রিষড়ায় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি মসজিদ আছে। মসজিদটি ত্রিতল, বড়মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ। সামনে পলকাটা খিলানযুক্ত সুউচ্চ হলঘর। ছাদের চার কোণে চারটি মিনার, ত্রিতলের উপর গম্বুজ ও চার কোণে চারটি মিনার। রিষড়ায় আরও একটি প্রাচীন মসজিদ আছে যা মোড়পুকুর মসজিদ নামে খ্যাত। এটির নির্মাণকাল মধ্য অষ্টাদশ শতক। মোড়পুকুর এলাকাতেই কেশবচন্দ্র সেন একটি বাগান ক্রয় করে সাধন-কানন নাম দিয়ে সেটিকে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের একটি কেন্দ্র করে তোলেন।

রুক্মিনী

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত জামগ্রাম-মণ্ডলাই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত জে এল নম্বর ৩৮। পাণ্ডুয়া রেলস্টেশন থেকে রুক্মিনীর দূরত্ব তিন কিমি। এখানে বসু পরিবার প্রতিষ্ঠিত একটি আটচালা শিবমন্দির আছে। নির্মাণকাল ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর দেবতা ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী বিদ্যমান।

রুদ্রাণী

সদর মহকুমার ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত বেলমুড়ি পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৮৯। এখানকার মদনমোহনের মন্দির বিখ্যাত। মন্দির সম্পর্কে যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা হচ্ছে এই যে ঠাকুর বৈরাগ্য নামক একজন সাধক বৃন্দাবনের গিরিগোবর্ধনের একটি গুহায় মদনমোহনের দারুময় মূর্তি প্রাপ্ত হন এবং তিনি রুদ্রাণীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। পাঠান নৃপতি দায়ুদ খান মোগলদের দ্বারা তাড়িত হয়ে তাঁর আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং চলে যাওয়ার সময় ঠাকুর বৈরাগ্যকে বেশ কিছু অর্থ দিয়ে যান। সেই অর্থে মদনমোহনের মন্দির নির্মিত হয়। মন্দিরে চারটি দারুময় মূর্তি বর্তমান—নীলবর্ণ মদনমোহন, শুভ্রবর্ণ বলরাম ও স্বর্ণবর্ণ রাধিকা ও রেবতী। মন্দিরটি কয়েকবার সংস্কৃত হয়। মন্দিরটি দালান ধরনের, বর্তমানে সংস্কৃত। তারকেশ্বর থেকে রুদ্রাণী বাসে যাওয়া যায়।

রুপুর

শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর লাইনের নালিকুল রেলস্টেশন থেকে রিকশায় রুপুর যাওয়া যায়। এখানে উনিশ শতকে নির্মিত একটি প্রথাগত আটচালা শিবমন্দির আছে।

রোসনা

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত বেলুন-ধামাসীন পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১১৭। এটি বেলুনের নিকটস্থ গ্রাম। পাণ্ডুয়া থেকে যেতে হয়। এখানে একটি পুষ্করিণী খননকালে দুটি ভগ্ন ও একটি অভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। মূর্তিগুলি কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

লক্ষ্মীপুর

গোঘাট থানার অন্তর্গত গ্রাম, আরামবাগ থেকে দূরত্ব চার কিমি। এখানে অধিকারী বংশ প্রতিষ্ঠিত দুটি পরিত্যক্ত মন্দির আছে। প্রথমটি পঞ্চরত্ন এবং দ্বিতীয়টি আটচালা। প্রথমটির নির্মাণকাল ১৮৪০, দ্বিতীয়টিও উনিশ শতকে নির্মিত। পঞ্চরত্ন মন্দিরটি পূর্বমুখী। মন্দিরের শিখরগুলি রেখ ধরনের, কিন্তু খাঁজকাটা নয়। বাঁকানো কার্নিস। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী বিদ্যমান। কৃষ্ণ প্রভৃতির দেবমূর্তি ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ এই চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু। অপর মন্দিরটি প্রথাগত আটচালা। এই মন্দিরে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী অনুপস্থিত।

লোহাগাছি

হরিপাল রেলস্টেশন থেকে আঁটপুর হয়ে লোহাগাছি যেতে হয়। এখানে উনিশ শতকে নির্মিত একটি প্রথাগত আটচালা শিবমন্দির আছে।

শিয়াখালা

চণ্ডীতলা থানা ও ব্লকের অন্তর্গত শিয়াখালা নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। জে এল নম্বর ১২। জনাই-এর ৬ কিমি উত্তর পশ্চিমে শিয়াখালার অবস্থান। শিয়াখালা নামটি সম্ভবত শিলাক্ষেত্র থেকে এসেছে। এখানকার উত্তরবাহিনী দেবী বহু প্রাচীন লৌকিক দেবতা। দেবীর আদি মন্দির বহুকাল পূর্বেই ধ্বংস হয়ে গেছে। বর্তমান মন্দিরটি স্থানীয় জনসাধারণের চেষ্টায় নির্মিত হয়েছে। পূর্বে মৃন্ময় মূর্তিতেই দেবীর পূজা হত। দেবীর একটি খুব ছোট মূর্তি কৌশিকী নদীর গর্ভ থেকে পাওয়া যায়। সেই মূর্তিরই অনুকরণে মাটির মূর্তি তৈরি হত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র প্রস্তরমূর্তি মন্দির থেকে অপহৃত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই দেবীর একটি বড় প্রস্তরমূর্তি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ যামিনীকান্ত বলের চেষ্টায় নির্মিত হয়। দ্বিভূজা এই মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় সাত ফুট, বর্ণ হরিদ্রাভ, দক্ষিণহস্তে খড়্গ এবং বাম হস্তে খর্পর। দেবীর দক্ষিণ পদ মহাকালের বুকে এবং বামপদ যুক্তকরে উপবিষ্ট বটুক ভৈরবের মাথার উপর নস্ত। মহাকালের নাভিদেশে একটি বৃহৎ আকারের অসুরের মুণ্ড ও গলার কাছে দুটি

সাপের মূর্তি দেখা যায়। দেবীর দুই চরণের মধ্যে দৈত্য নিশুম্ভের একটি ছিন্ন মুণ্ড আছে। দেবী রক্তাম্বরধারিণী, মুকুট ও অন্যান্য অলঙ্কারধারিনী এবং সেই সঙ্গে নৃমুণ্ডমালিনীও বটে। এই ধরনের দেবীমূর্তি ভারতের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না এবং সেই হিসাবে উত্তরবাহিনী একক। বর্তমান মন্দির এবং মূর্তি আধুনিক হলেও এই দেবী যে বিশেষ প্রাচীন তার প্রমাণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছেঃ 'উত্তরবাহিনী বন্দো গ্রাম শেয়াখালা'।

শেওড়াফুলি

বৈদ্যবাটি-শেওড়াফুলি দ্রষ্টব্য।

শোঙালুক

আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত ভাঙ্গামোড়া পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। জে এল নম্বর ৪। শোঙালুক ভাঙ্গামোড়া থেকে মাত্র ৫ কিমি দূরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে এখানে দেবীসিংহ নামে একজন স্থানীয় রাজার রাজত্ব ছিল। এখানে একটি পুষ্করিণী খননকালে কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়। এখানে অষ্টাদশ শতকে স্থানীয় গোস্বামীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ মন্দির বিখ্যাত। পূর্বমুখী এই মন্দিরটির পরিমাপ সাড়ে ষোল বর্গফুট। মন্দিরটি পঞ্চরত্ন, শিখরগুলি রেখ ধরনের খাঁজকাটা, খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশদ্বার সহ। মন্দিরের সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর সজ্জিত দেবতা, রাজদরবারের দৃশ্য, কিছুটা বড় আকারের মূর্তি ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী বর্তমান।

শ্যামবাজার

গোঘাট থানা ও ব্লকের অন্তর্গত শ্যামবাজার পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৩৯। কামারপুকুর থেকে পাণ্ডুগ্রাম হয়ে শ্যামবাজারে যেতে হয়। গ্রামটি একদা তসর ও তাঁতের কাপড় এবং আবলুস কাঠের খেলনার জন্য বিখ্যাত ছিল। এখানে বর্গাকার ভিত্তির উপর নির্মিত একটি চারচালা মন্দির আছে। এছাড়া দত্ত ও দাস বংশ প্রতিষ্ঠিত দুইটি রাধা-দামোদর মন্দির আছে। নির্মাণকাল যথাক্রমে ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ। মন্দির দুটি পঞ্চরত্ন। উভয়েরই সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী বর্তমান। বিষয়বস্তু দেবতা, রাজদরবারের দৃশ্য, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ।

শ্যামপুর

তারকেশ্বর থানা ও ব্লকের অন্তর্গত পূর্ব রামনগর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। জে এল নম্বর ৫৫। বাহিরখণ্ড রেলস্টেশন থেকে শ্যামপুরের দূরত্ব

আড়াই কিমি। এখানে ঘোষাল বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি পরিত্যক্ত আটচালা মন্দির এবং মধ্য-উনিশ শতকে সিংহরায় ও হালদার বংশ প্রতিষ্ঠিত দুইটি শিবমন্দির আছে। হালদার বংশ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি ছাড়া বাকি তিনটি মন্দিরে 'টেরাকোটা'র কাজ আছে। দেবতা, রামায়ণের কাহিনী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ এই মন্দিরগুলির 'টেরাকোটা' শিল্পের বিষয়বস্তু।

শ্রীপুর

বলাগড় থানা ও ব্লকের অন্তর্গত শ্রীপুর-বলাগড় পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১০১। বলাগড় বা জিরাট রেলস্টেশন থেকে সহজেই শ্রীপুর যাওয়া যায়। এখানকার পুরাকীর্তিসমূহ স্থানীয় জমিদারবংশ মিত্র-মুস্তৌফীদের হাতে গড়া। এই মুস্তৌফীদের আদি নিবাস ছিল নদীয়া জেলার উলা-বীরনগর। বংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দন মিত্র-মুস্তৌফী শ্রীপুরে জমিদারির পত্তন করেন এবং একটি গড়বেষ্টিত এলাকায় প্রাসাদ, মন্দিররাজি, চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতি গড়ে তোলেন। গড়টি এখনও দৃষ্ট হয়। শ্রীপুরের সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় বস্তু হল মুস্তৌফীদের দোচালা চণ্ডীমণ্ডপটি। প্রাচীন কারুকলা ও কারিগরির এটি একটি অত্যুত্তম নিদর্শন। খড়ের চালের বদলে এখন টিনের চাল দেওয়াতে মণ্ডপটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য অনেক নষ্ট হয়ে গেছে কিন্তু কাঠের কারুকার্যগুলি এখনও রয়েছে। হুগলী জেলায় এইরকম আরও একটি চণ্ডীমণ্ডপ আছে আঁটপুরে যার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, পৌরাণিক চিত্র কাঠের স্তম্ভের গায়ে, কড়িকাঠেও ফ্রেমের উপর খোদাই করা হয়েছে যা দেখলে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে একটি নাটমণ্ডপ স্তম্ভ ও খিলানের দ্বারা গঠিত। এছাড়া হুগলীর বাইরে উলায় (নদীয়া জেলা) অনুরূপ একটি কাঠের চণ্ডীমণ্ডপ আছে। উলা থেকে মিত্র-মুস্তৌফীরা শ্রীপুরে আসেন। আঁটপুরের চণ্ডীমণ্ডপটিও মিত্র বংশের। এই মিত্ররা কোন্নগর থেকে আঁটপুরে গিয়েছিলেন। শ্রীপুরের মিত্রদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল কিনা এ বিষয়ে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন আছে। গড়ের চত্বরের মধ্যে জোড়াশিবের পঞ্চরত্ন মন্দির আছে, শিখরগুলি রেখ ধরনের খাঁজকাটা এবং সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর উদ্ভিজ্জধর্মী কারুকার্য বর্তমান। এছাড়া গড় এলাকার মধ্যেই একটি আটচালা শিবমন্দির, দোলমঞ্চ ও রাধাগোবিন্দের মন্দির আছে। গড় এলাকার বাইরে বড় রাস্তার উপর একটি আটচালা শিবমন্দির, বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর দালান ধরনের মন্দির ও একটি সুন্দর স্তম্ভ ও খিলান নির্মিত দোলমঞ্চ আছে। চণ্ডীমণ্ডপটির নির্মাণকাল ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ। পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে নির্মিত। অবশিষ্ট মন্দিরগুলির নির্মাণকাল ঊনবিংশ শতকের শেষ দিক। বড় রাস্তার উপরে

অবস্থিত মন্দির ও দোলমঞ্চ পরবর্তীকালে নির্মিত। শ্রীপুরের গোবিন্দ মন্দিরটি একচূড়াবিশিষ্ট এবং সম্মুখে দুর্গাদালানের ন্যায় প্রশস্ত চাতাল আছে। এটি ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দ নিধিরাম মুস্তৌফী কর্তৃক নির্মিত। এই মন্দিরের নিকটস্থ দোলমঞ্চটি ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রুদ্ররাম মুস্তৌফী কর্তৃক নির্মিত। শ্রীপুরের ছয়টি বড় শিবমন্দিরের মধ্যে তিনটি আটচালা, দুটি পঞ্চরত্ন এবং একটির মাদলাকৃতি উপরিভাগ। রাধাগোবিন্দের মন্দিরটি চারচালা। মঙ্গলচণ্ডীর মন্দির এবং শেঠদের ঠাকুরদালান সমতল ছাদ বিশিষ্ট।

শ্রীরামপুর

হুগলী জেলার পূর্বদিকে অবস্থিত এই একই নামের মহকুমার প্রধান শহর। কলিকাতা থেকে দূরত্ব ২০ কিমি। শ্রীরামপুর মহকুমার পূর্বে হুগলী নদী, উত্তরে চন্দননগর মহকুমা, পশ্চিমে দামোদর ও দক্ষিণে হাওড়া জেলা। এই মহকুমায় চারটি থানা এলাকা অছে—শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া, চণ্ডীতলা ও জাঙ্গীপাড়া। মহকুমার আয়তন ২৫৭ বর্গ কিমি বা ১৬০ বর্গমাইল।

শ্রীরামপুর হাওড়া-ব্যাণ্ডেল রেললাইনের অষ্টম স্টেশন। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড এই শহরের উপর দিয়ে চলে গেছে। শ্রীরামপুর নামটি শ্রীরামচন্দ্র জীউ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে শেওড়াফুলির রাজা মনোহর রায় এই শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির নির্মাণ করেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেনীয় বা দিনেমার শাসকেরা এই শহরের রাম রাখেন ফ্রেডরিকনগর। শ্রীপুর, আকনা, গোপীনাথপুর, মোহনপুর ও পেয়ারাপুর এই পাঁচটি স্থান নিয়ে ফ্রেডরিকনগর গঠিত হয়েছিল। বার্ষিক ১৬০১ সিক্কা টাকা খাজনায় ডেনীয়রা শেওড়াফুলি-রাজের কাছ থেকে এই স্থানগুলি ইজারা নেন। ডেনীয় কুঠির অধ্যক্ষ সোয়েটমানের চেষ্টায় শ্রীরামপুর শহরটির বিশেষ উন্নতি ঘটে। গঙ্গার তীরে এই শহরটি তৎকালীন ইউরোপীয়দের একটি বিহার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্শম্যান ও ওয়ার্ড খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুরে আগমন করেন। কিছুকাল পরে উইলিয়াম কেরী তাঁদের সঙ্গে মিলিত হন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্নেল বাই-এর চেষ্টায় সেন্ট ওলাফের গীর্জা নির্মিত হয়। বঙ্গদেশে খ্রীষ্টান মিশনারীদের কার্যকলাপের প্রধান কেন্দ্র ছিল শ্রীরামপুর। বাংলাভাষা ও সাহিত্য, মুদ্রণশিল্প ও প্রকাশনা এবং আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর ছিল অগ্রনী। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের মিশনারীগণ শ্রীরামপুর কলেজের জন্য জমি ক্রয় করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের রাজকীয় সনদ অনুযায়ী কলেজ তৈরি হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা এই

শহরটিকে ডেনীয়দের নিকট থেকে ক্রয় করে নেন। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মহকুমার সদর দপ্তর দ্বারহাট্টা থেকে শ্রীরামপুরে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর পৌরসভার পত্তন হয়।

গোস্বামীরা শ্রীরামপুরের প্রাচীন জমিদার পরিবার, এই শহরের উন্নতির ক্ষেত্রে যাঁদের দান অপরিসীম। বর্ধমানের পাটুলি থেকে আগত রামগোবিন্দ গোস্বামী (চক্রবর্তী) শেওড়াফুলি-রাজের থেকে এখানে বাস্তুভূমি পান। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র হরিনারায়ণ ডেনীয় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ান হিসাবে প্রভূত বিত্তের অধিকারী হন। তাঁর পুত্র রঘুরাম জন পামার কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন এবং সেইসঙ্গে ছিলেন ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অংশীদার। তিনি বিপুল জমিদারি খরিদ করেন, এমন কি ডেনীয়রা ইংরাজদের নিকট শ্রীরামপুর বিক্রয়ের উদ্যোগী হলে তিনি বারো লক্ষ টাকায় তা কিনে নিতে চান। রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী এবং তুলসী গোস্বামী এই বংশেরই লোক ছিলেন।

এই গোস্বামী পরিবারের অনেকগুলি প্রাসাদতুল্য ভবন আছে যেগুলির অধিকাংশই রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী ও তুলসী গোস্বামীর নামাঙ্কিত রাস্তার উপর অবস্থিত। অধিকাংশ ভবনই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্যভাগে নির্মিত, দ্বিতল অথবা ত্রিতল, ইউরোপীয় ধরনের স্তম্ভের উপর নির্মিত বারান্দা, উদ্গত খিলানের সরদলযুক্ত জানালা ও দরজা, পরটযুক্ত ছাদ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে ছাদের সম্মুখভাগে পেডিমেন্ট। কিশোরীলাল গোস্বামী রাস্তার উপর অবস্থিত রাজবাড়িটির কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। ওই রাস্তার উপরেই গোস্বামীদের একটি ভবনের উপরের অষ্টকোণ ত্রিতল অংশের মাথায় একটি সুদৃশ্য গম্বুজের অবস্থান। কয়েকটি ভবন ডেনীয় আমলের, যেমন তুলসী গোস্বামী স্ট্রীটে যে ভবনটি মেয়েদের কলেজ হিসাবে ব্যবহৃত হয় (এই ভবনের দ্বিতল অংশটি অবশ্য অনেক পরে তোলা হয়েছে)। গোস্বামীদের বাগানবাড়ি ও অতিথিভবনও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামপুর রেল স্টেশনের সন্নিকটে যে ভবনটি ট্রেন থেকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি তুলসী গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজা কিশোরীলাল গোস্বামী মেমোরিয়াল হল। ভবনটি অবশ্য ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দ্বিতল ভবনটির সম্মুখে হলঘর সংলগ্ন স্তম্ভোপরি নিবদ্ধ বারান্দা, উভয় দিকে দ্বিতল কক্ষশ্রেণী। উপরে বিস্তৃত বারান্দার ছাদের সম্মুখাংশ জুড়ে বৃহৎ ত্রিকোণ পেডিমেন্ট ভবনটিকে একটি বিশেষ গাম্ভীর্য প্রদান করেছে। বর্তমানে ভবনটিতে শ্রীরামপুর পৌরসভার অধিষ্ঠান। রাজা কিশোরীলাল গোস্বামীর নামাঙ্কিত রাস্তায় অবস্থিত গোস্বামীদের রাসমঞ্চ ও ঠাকুরদালান উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত। রাসমঞ্চটি উচ্চ ভিত্তির উপর স্থাপিত, অষ্টকোণ, কেন্দ্রীয় ও কৌণিক শিখরযুক্ত। আট দিকের দেওয়ালে আটটি খিলান।

ঠাকুরদালানটিও উচ্চ মঞ্চের উপর অবস্থিত। স্তম্ভের উপর গঠিত সারি সারি খিলানযুক্ত।

ডেনীয় গভর্নরের বিশাল এলাকা নিয়ে গঠিত বাসভবন বর্তমানে আদালত ও নানা প্রশাসনিক দপ্তর হিসাবে ব্যবহৃত। এই ভবনের বিশাল ফটকটি দেখার মত যার উপর একটি মুকুট এবং ডেনীয় রাজকীয় প্রতীক এফ. আর সিক্স (ফ্রেডেরিক রেক্স সিক্স) বর্তমান। নিকটবর্তী অঞ্চলের অপরাপর সৌধরাজির মধ্যে রোমান ক্যাথলিক গীর্জা, সেন্ট ওলাফ গীর্জা এবং জেলখানা উল্লেখযোগ্য। সেন্ট ওলাফ গীর্জাটি ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। সম্মুখের বারান্দা ইউরোপীয় ধরনের চারটি জোড়া-স্তম্ভের উপর নির্মিত। পরটযুক্ত সম্মুখের ছাদের প্রান্তে ত্রিকোণ পেডিমেন্ট। দ্বিতল শিখর। শিখরের উপরিভাগ মোচাকৃতি। প্রবেশপথে ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডরিকের মনোগ্রাম। সামনের ছোট পার্কে পুরাতন আমলের কামানের সারি। এই কামানগুলি পূর্বে রাজকীয় উৎসবাদিতে তোপ দাগার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত কানাইলাল গোস্বামী ১৫টি কামান একত্রে সেন্ট ওলাফের গীর্জার সামনে স্থাপনে ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে শ্রীরামপুরের সঙ্গে ডেনদের সম্পর্কের বিষয় একটি ফলকে উৎকীর্ণ করে রেখেছেন।

শ্রীরামপুরের আদি রোমান ক্যাথলিক চ্যাপেল ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এটিতে স্থান অকুলান হলে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নুতন করে তা নির্মাণ করা হয়। এই কাজে তৎকালীন বারেত্তো পরিবারের প্রচুর দান ছিল। কনভেন্টটি পরবর্তীকালে উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত হয়। জননগর ব্যাপিস্ট মিশন গীর্জা শেষ অষ্টাদশ শতকের দ্বিতল ভবন, কলেজ রাস্তার উপর অবস্থিত, যেখানে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সর্বপ্রথম বাস করতেন। সম্মুখের অংশ একতলা, স্তম্ভের উপর দীর্ঘ বারান্দা, খিলানযুক্ত জানালা-দরজা। শীলবাগানের চ্যাপেল স্ট্রিটে অবস্থিত চেজায়ার হোম শেষ-অষ্টাদশ শতকে নির্মিত মিশনারীদের আবাসস্থল। বারান্দাযুক্ত দ্বিতল ভবন। স্তম্ভের উপর গঠিত বারান্দা, জানালাগুলির মাথায় উদ্গীত ত্রিকোণের সরদল। এই ভবনেই একটি চ্যাপেল আছে, স্তম্ভনির্মিত তিনটি কক্ষায় বিভক্ত সম্মুখভাগ, মাথায় অর্ধচন্দ্রাকার পেডিমেন্ট, প্রার্থনা হলের দুই পার্শ্বে জানালার সারির উপর উদ্যত অর্ধচন্দ্রাকৃতি খিলান। তুলসী গোস্বামী রাস্তার উপর অবস্থিত হান্না হাউস ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এবং ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে পরিবর্ধিত। এটি সন্ন্যাসিনীদের আবাস হিসাবে ব্যবহৃত হত। এটি হান্না মার্শম্যানের সম্মানে নির্মিত।

ডেনীয় কবরখানার কথাও এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে। শ্রীরামপুরে রেলওয়ে স্টেশনের অনতিদূরে এই সমাধিক্ষেত্রে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের

সমাধি আছে। এখানে প্রোটেস্টান্ট ও ক্যাথলিকদের জন্য পৃথক স্থান নির্দিষ্ট। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের বহু সমাধি এখানে আছে যাঁদের মধ্যে প্রধান ডেনীয় বিচারপতি হলেনবার্গের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত একথাও বলা দরকার যে দেশীয় খ্রীষ্টানদের সমাধি নির্মাণও প্রথম শ্রীরামপুরে হয়। প্রথম মৃত দেশীয় খ্রীষ্টানের নাম গোকুল দাস। মিশনারীগণই তাঁর মৃত্যুর চারদিন পূর্বে তাঁর সমাধির জন্য জমি ক্রয় করেন। এবং প্রথম দেশীয় দীক্ষিত খ্রীষ্টান কৃষ্ণ পাল নিজ ব্যয়ে গোকুলের শবাধার মসলিনে আবৃত করেন।

বিশপ হেবার শ্রীরামপুর সম্পর্কে বলেছিলেন যে এই শহরটি কলকাতার চেয়ে অনেক বেশি ইউরোপীয়। শ্রীরামপুর থেকে ডেনীয়রা চলে গেলেও গঙ্গাতীরে তাঁদের নির্মিত সুরম্য অট্টালিকাসমূহ আজও তাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের স্মৃতি বিজড়িত শ্রীরামপুর মিশন কলেজের সুদৃশ্য ভবনটি শ্রীরামপুরের গঙ্গাতীরে কেরীর নামাঙ্কিত রাস্তার উপর অবস্থিত, নির্মাণকালের সূচনা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ। এটি পূর্বমুখী দ্বিতল ইউরোপীয় ধরনের স্থাপত্যানুসারী ভবন, সামনের ত্রিকোণ পেডিমেন্টযুক্ত গাড়িবারান্দা, গ্রীক ধরনের সুদৃশ্য স্তম্ভরাজির উপর ন্যস্ত। জানালাগুলির মাথাতেও উদ্গত ত্রিকোণের খিলান, দ্বিতলে স্তম্ভযুক্ত হলঘর। ১৫০০০ পাউণ্ড ব্যয়ে এই ভবন নির্মাণ করা হয়। মার্কুইস অফ হেস্টিংস এবং শ্রীরামপুরের ডেনীয় গভর্নর কর্নেল কেফটিং এই ভবন নির্মাণে সাহায্য করেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের সম্রাট ষষ্ঠ ফ্রেডেরিকের আদেশনানামায় এই কলেজ ছাত্রদের ডিগ্রী প্রদানের অধিকারী হয়। এটি এশিয়া মহাদেশের প্রথম ডিগ্রী কলেজ। কলেজের কেন্দ্রীয় ভবনটি দৈর্ঘ্যে ১৩০ ফুট, প্রস্থে ১২০ ফুট। খিলান দ্বারা গঠিত একতলার হল দৈর্ঘ্যে ৯৫ ফুট, প্রস্থে ৬৬ ফুট, উচ্চতায় ২০ ফুট। দোতলার হলটিরও একই মাপ, শুধু উচ্চতায় ২৬ ফুট। দুদিকে উপরে ও নীচে বারোটি করে ঘর আছে, এগুলির মধ্যে আটটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৩৫ ফুট ও প্রস্থে ২৭ ফুট করে। কলেজে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালা বর্তমান।

গঙ্গাতীরে হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কসের এলাকার মধ্যে অল-দীন ও হেনরী মার্টিনের প্যাগোডা অবস্থিত। প্রথমটি মুঘল যুগে ধর্ম প্রচারের কেন্দ্র হিসাবে গড়ে ওঠে। দ্বিতীয়টি একটি আটচালা মন্দির যা পূর্বে রাধাবল্লভের মন্দির ছিল এবং নানা কারণে পরিত্যক্ত হয়েছিল। বিশাল এই পরিত্যক্ত মন্দিরটি রেভারেণ্ড ডেভিড ব্রাউন ক্রয় করেন। বিখ্যাত মিশনারী হেনরী মার্টিন এটিকে একটি খ্রীষ্টীয় ভজনাগারে পরিণত করেন এবং এটি হেনরী মার্টিনের প্যাগোডা নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে শ্রীরামপুরে একাধিক গীর্জা নির্মিত হলে এটির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। অতঃপর এখানে একটি মদ্য প্রস্তুতের চোলাইখানা গড়ে

তোলা হয় এবং এখানে প্রস্তুত রাম প্যাগোডা-রাম নামে পরিচিত হয়। আরও পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এটির দখল নেন, কিছু সংস্কার করেন এবং পুরাকীর্তি **হিসাবে 'প্রত্নতত্ত্ব অধিকার' কর্তৃক সংরক্ষিত হয়।**

এই রাধাবল্লভের নামেই শ্রীরামপুরের প্রান্তীয় অঞ্চলের নামকরণ হয় বল্লভপুর। কথিত আছে যে চাতরার রুদ্ররাম পণ্ডিত বল্লভপুরে সাধনা করতেন। তখন বল্লভপুর ছিল অরণ্যাকীর্ণ। তাঁর সাধনায় প্রীত হয়ে কৃষ্ণ স্বয়ং যোগীর বেশে তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁকে বলেন যে, তিনি যেন গৌড়ের সুলতানের শয়নকক্ষের দ্বারপ্রান্তের প্রস্তরস্তম্ভ থেকে তাঁর মূর্তি তৈরি করে প্রতিষ্ঠা করেন। তদনুযায়ী রুদ্ররাম গৌড়ে গিয়ে বিস্মিত হয়ে দেখেন যে নানারূপ অশুভ লক্ষণ দেখে ওই বিশেষ প্রস্তরটিকে সুলতান প্রাসাদ থেকে অপসারিত করেছেন। ওই ভারি পাথরকে কিভাবে নিয়ে আসবেন এই চিন্তায় রুদ্ররাম খুবই ব্যাকুল হন। তখন দেবতা তাঁকে স্বপ্নে জানান যে তিনি যেন পাথরটিকে নিকটস্থ নদীতে ফেলে দিয়ে বল্লভপুরে ফিরে যান। তিনি বল্লভপুরে ফিরে এসে দেখেন যে ওই পাথর সেখানে ভেসে চলে এসেছে। তা থেকে তিনটি কৃষ্ণমূর্তি তৈরি করা হয়—প্রথমটির নাম হয় রাধাবল্লভ, দ্বিতীয়টির নাম হয় শ্যামসুন্দর যে মূর্তি এখন খড়দহে পূজিত হয়; এবং তৃতীয়টির নাম হয় নন্দদুলাল যাঁর অধিষ্ঠান সাঁইবোনায়। ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রুদ্ররাম অন্যান্য ভক্তের সহযোগিতায় রাধাবল্লভ মন্দির গড়ে তোলেন। এই মন্দিরই হচ্ছে প্রাগুক্ত হেনরী মার্টিনের প্যাগোডা। এই মন্দিরটি পরিত্যক্ত হলে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার নয়নচাঁদ মল্লিক বর্তমান রাধাবল্লভ মন্দির নির্মাণ করেন। রাধাবল্লভ এবং রাধিকার যুগ্ম মূর্তি ছাড়াও জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি এখানে বর্তমান। পূর্বে রথযাত্রার সময় মাহেশের জগন্নাথকে এই মন্দিরে নিয়ে আসা হত। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে উভয় মন্দিরের সেবাইতদের ঝগড়ার ফলে এই প্রথা উঠে গেছে।

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত দক্ষিণী বৈষ্ণবেরা শ্রীরামপুরে তাঁদের একটি আখড়া স্থাপন করেন ও মদনমোহন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে আখড়া উঠে গেলে ওই স্থানে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ালস হাসপাতাল গড়ে তোলা হয়। মদনমোহনের বিগ্রহ অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হয় এবং ডেনীয় সরকার এই বিগ্রহের সেবার জন্য বাৎসরিক ১২০ টাকা বরাদ্দ করেন। বৃটিশ সরকার এই ব্যবস্থা রদ করেন ১০,০০০ টাকা এককালীন অনুদান দিয়ে। এই টাকায় মদনমোহনের বর্তমান আটচালা মন্দির তৈরি হয়। লাহিড়ী পাড়ায় গোস্বামীদের প্রতিষ্ঠিত একটি আটচালা শিবমন্দির আছে। এটির নির্মাণকাল ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ। রাজীবলোচন ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রায়বাহাদুর লাহিড়ী

স্ট্রিটের উপর অবস্থিত শিব মন্দিরটি মধ্য অষ্টাদশ শতকে নির্মিত। এটি প্রথাগত আটচালা।

উত্তরে চাতরা ও দক্ষিণে মাহেশ-বল্লভপুর নামক স্থানগুলি শ্রীরামপুর পুরসভার অন্তর্গত। চাতরা একটি প্রাচীন স্থান, শ্রীরামপুর রেল স্টেশন থেকে দুই কিমি উত্তরে অবস্থিত। এখানকার চৌধুরীপাড়ায় অবস্থিত গৌরাঙ্গ মন্দিরটি শ্রীচৈতন্যের পার্ষদ কালীশ্বর পণ্ডিত কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলে কথিত। তিনটি শিখরবিশিষ্ট এই মন্দিরে মাঝের শিখরটি দুই পাশের অন্য দুই শিখরের চেয়ে বেশি উচ্চতাসম্পন্ন। শিখরগুলি পিরামিডাকার ও রেখ ধরনের খাঁজকাটা। মন্দিরের সামনের সমতল ছাদ বিশিষ্ট বারান্দাটি পরবর্তীকালে নির্মিত। মন্দিরের মধ্যে কৃষ্ণ-রাধা ও শ্রীগৌরাঙ্গ-বিষ্ণুপ্রিয়া দুইটি সিংহাসনে পাশাপাশি বিরাজিত আছেন। এ রকম অবস্থান নবদ্বীপ ভিন্ন বড় একটা দেখা যায় না। কথিত আছে যে মহাপ্রভু স্বয়ং পুরী যাত্রার সময় নিমাই-তীর্থের ঘাট থেকে চাতরার এই মন্দিরে এসেছিলেন। মন্দিরে তাঁর নিজের মূর্তি দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হন এবং তাঁর বিগ্রহ গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং এই নির্দেশ পালিত হয়। পরে মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর কাশীশ্বর পণ্ডিতের পৌত্র পুনরায় মহাপ্রভুর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গনে অবস্থিত দোলমঞ্চদ্বয় নতুন করে নির্মিত হয়েছে।

শ্রীরামপুর

আরামবাগ থানার অন্তর্গত গ্রাম, হেলান থেকে চার কিমি দূরে অবস্থিত। এখানকার ঘোষ বংশ প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, প্রথাগত আটচালা এবং তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিশিষ্ট। নির্মাণকার্য ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদ। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবমূর্তি, রামায়ণের কাহিনী, রাজদরবারের দৃশ্য ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণের সমাবেশ।

সন্তোষপুর

তারকেশ্বর থানা ও ব্লকের অন্তর্গত সন্তোষপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে. এল নম্বর ১। তারকেশ্বর থেকে চৌতারা ও কুমরুল হয়ে সন্তোষপুরে যেতে হয়। সন্তোষপুর দামোদর নদের বাম তীরে অবস্থিত। এখানে দাস পরিবার কর্তৃক ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি পূর্বমুখী, আটচালা, সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর উদ্ভিজ্জধর্মী কারুকার্য।

সপ্তগ্রাম সম্পর্কে এই গ্রন্থের ভূমিকায় কিছু কথা বলা হয়েছে। বঙ্গের সেন রাজাদের রাজত্বকালে সপ্তগ্রামের প্রতিষ্ঠা ছিল। রুকনুদ্দীন কৈকায়ুস যখন বঙ্গদেশে রাজত্ব করতেন (১২৯১-১৩০২ খ্রীষ্টাব্দ) সেই সময় জাফর খান সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। বিখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেছেন। সপ্তগ্রাম বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি বড় কেন্দ্র ছিল। ষোড়শ শতকে সরস্বতী নদী মজতে শুরু করলে সপ্তগ্রামের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়। যে সাতটি গ্রাম নিয়ে সপ্তগ্রাম গঠিত—বাসুদেবপুর, বাঁশবেড়িয়া, খামারপাড়া (অথবা নিত্যানন্দপুর), কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর (অথবা সাম্বাচোরা) এবং ত্রিশবিঘা (অথবা বলদঘাটি)—সেই সাতটি গ্রামের অস্তিত্ব এখনও আছে কিন্তু তাদের প্রাচীন সমৃদ্ধির কোনও নিদর্শনই খুঁজে পাওয়া যায় না। বর্তমানে সপ্তগ্রামের পরিচয় আদি সপ্তগ্রাম নামক রেল স্টেশনকে দিয়ে যেটি হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে ব্যাণ্ডেল ও মগরার মধ্যবর্তী স্টেশন। বর্তমানে সপ্তগ্রাম একটি পঞ্চায়েত অঞ্চল এবং আদি-সপ্তগ্রাম সংলগ্ন এলাকাটির জে এল নম্বর ৪৫। এখানকার পুরাকীর্তির একমাত্র নিদর্শন একটি ছাদহীন ভাঙা মসজিদ। এই মসজিদের বাইরের দেওয়ালে এবং তিনটি মিহ্‌রাবের চারদিকে 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণ বিদ্যমান। এই মসজিদে একটি প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ আরবীয় লেখে বলা হয়েছে যে এই মসজিদটি ৯৩৬ হিজিরায় রমজান মাসে আমুলের আবুল সৈয়দ ফকরুদ্দীন কর্তৃক নির্মিত। মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে সৈয়দ ফকরুদ্দীন, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর খোজার সমাধি আছে। নিকটে কয়েকটি ছড়িয়ে থাকা প্রস্তরফলকে ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মাহমুদ শাহের রাজত্বকালে তরবিয়ৎ খান কর্তৃক একটি এবং ফথ শাহের রাজত্বকালে ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করার কথা বলা আছে। মসজিদ ছাড়া সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট আছে। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বিশেষ ভক্ত বৈষ্ণব মহাত্মা উদ্ধারণ দত্ত ১৪৮১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। তাঁর সমাধি এখানে আছে। মন্দিরসহ আদি শ্রীপাট জীর্ণ হয়ে গেলে বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে হুগলী জেলার সুবর্ণমণিক সমাজ এটির আমূল সংস্কারসাধন করেন। সপ্তগ্রামের নিকটস্থ কৃষ্ণপুরে রঘুনাথ দাসের শ্রীপাট আছে। সপ্তগ্রাম থেকে প্রাপ্ত অনেকগুলি 'টেরাকোটা' শিল্পের নিদর্শন নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত কর্তৃক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে প্রদত্ত হয়। এতদঞ্চলের একটি কূপ থেকে প্রভাসচন্দ্র পাল 'টেরাকোটা' শিল্পের কিছু নিদর্শন আবিষ্কার করেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সপ্তগ্রাম থেকে একটি ভগ্ন প্রস্তরনির্মিত সরস্বতী মূর্তি আবিষ্কার

করেন। মূর্তিটির উচ্চতা প্রায় এক ফুট, দ্বিভঙ্গভঙ্গিতে বীণাহস্তে দণ্ডায়মান। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এই মূর্তিটি রক্ষিত আছে।

সাটীথান

পোলবা থানার ও পোলবা-দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত সাটীথান পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত গ্রাম, জে. এল. নম্বর ১৪। এই গ্রামের রামচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পুরাতন শিবমন্দির, দুর্গাপূজার দালান ও বৃহৎ বৈঠকখানা ঘোষবংশের প্রাচীন বৈভবের সাক্ষ্য দেয়। শিবমন্দির দুইটি, তন্মধ্যে একটি পঞ্চরত্ন, উত্তরমুখী, ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর দেবতা, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী। চুঁচুড়া-তারকেশ্বর বাস রাস্তার উপর সাটীথান অবস্থিত।

সালেপুর

আরামবাগ থানা ও ব্লকের অন্তর্গত সালেপুর এক নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে. এল নম্বর ৯৬। সালেপুর আরামবাগ থেকে আট কিমি দূরে অবস্থিত। এখানে ধর্মঠাকুরের দুটি মন্দির আছে। প্রাচীনতর মন্দিরটি ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ভুক্ত বংশ কর্তৃক নির্মিত। পশ্চিমমুখী এই মন্দিরটির পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৬ ফুট এবং প্রস্থে ১৪ ফুট। মন্দিরটি সমতল ছাদবিশিষ্ট এবং স্তম্ভযুক্ত। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর রামায়ণের কাহিনী, কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতা, রাজদরবারের দৃশ্য, উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ প্রভৃতি বর্তমান। দ্বিতীয় মন্দিরটি স্থানীয় পণ্ডিত বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, নির্মাণকাল ঊনবিংশ শতাব্দী। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, প্রথাগত আটচালা। বহির্ভাগে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী অনুপস্থিত।

সাহাগঞ্জ-খামারপাড়া

চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত। চুঁচুড়া-হুগলী থেকে সোজা উত্তরবাহিনী পথে ব্যাণ্ডেল গীর্জা পার হলেই বাঁশবেড়িয়ার পথে পড়ে সাহাগঞ্জ। এই গ্রামটি মুঘল বাদশাহ আজিমুস্থান শাহর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী গ্রামটি তাঁর নামযুক্ত হয়ে সা-আজিমগঞ্জ নামে পরিচিত হয়। পরে এই নাম সংক্ষেপিত হয়ে সাগঞ্জ বা সাহাগঞ্জে পরিণত হয়। সাহাগঞ্জের নন্দী পরিবার খুবই বিখ্যাত। এঁরা জাতিতে তিলি। এই পরিবারের বীরেশ্বর নন্দী শিবমন্দির, চতুষ্পাঠী, দাতব্য চিকিৎসালয়, রথপ্রতিষ্ঠা, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি নানা সৎকার্যের দ্বারা প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। এই নন্দী পরিবার পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম একান্নবর্তী পরিবার জামগ্রামের নন্দীদের সঙ্গে সম্পর্কিত। ব্যাণ্ডেল স্টেশন থেকেও সহজে সাহাগঞ্জে আসা যায়। এখানে ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি ছোট আটচালা

মন্দির আছে। মন্দিরটি একদ্বারবিশিষ্ট, দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে তের ফুট ও এগারো ফুটের কিছু বেশি, বর্তমানে পরিত্যক্ত। পশ্চিমমুখী এই মন্দিরটির সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর মূর্তি ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ বিদ্যমান। প্রধান রাস্তার উপরে গঙ্গাতীরে নন্দী পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আটটি শিবমন্দির ও একটি রাসমঞ্চ আছে। এগুলির মধ্যে দুটি মন্দির প্রথাগত আটচালা, একদ্বারবিশিষ্ট ও বক্র কার্নিসযুক্ত, মধ্য-উনিশ শতকে নির্মিত। অপর ছয়টি মন্দির ও রাসমঞ্চ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরগুলি নামযুক্ত, আকারে ছোট, আটকোণা, দক্ষিণমুখী, সাধারণ ধরনের খিলানের দরজা, উদ্গত অনুভূমিক কার্নিস ও গম্বুজাকার শিখরবিশিষ্ট। রাসমঞ্চটিরও গঠন অনুরূপ। অনতিদূরেই প্রতিষ্ঠাতা নন্দীদের বৃহৎ ভবনের জীর্ণাবশেষ। এ ছাড়া প্রধান রাস্তার উপরেই দে পরিবারের মালিকানাধীন একটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির এবং বাঁধাঘাটে মুখোপাধ্যায় পরিবারের মালিকানাধীন দুটি আটচালা শিবমন্দির আছে। সবগুলিই মধ্য-উনিশ শতকে নির্মিত। সাহাগঞ্জের নন্দীবাজারে মীর কালামির মাজার ষোড়শ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত। এই রকম আট কোনওয়ালা সমাধিসৌধ পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোথাও নেই। পীরবাগানে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত একটি জীর্ণ মাজার আছে—আয়তাকার, চারটি খিলানবিশিষ্ট দ্বার ও কুলুঙ্গি, এবং সছিদ্র পরটযুক্ত। উনিশ শতকের শেষের দিকে নির্মিত গরীব আলম বাগের মসজিদটির ছাদ সমতল, কোণের থামগুলির উপর পলাণ্ডুসদৃশ গম্বুজ, বৃহৎ মিহরাবের দুই পাশে অনুরূপ দুটি ছোট কুলুঙ্গি। নিকটে একটি মাজারও আছে। সাহাগঞ্জের সোজা উত্তরে ডানলপ রবার কারখানা পেরিয়ে খামারপাড়ায় অষ্টাদশ শতকে নির্মিত দুটি জরাজীর্ণ মন্দির বর্তমান। একটি পঞ্চরত্ন, অপরটি নবরত্ন। মন্দিরগুলি বর্গাকার, পরিমাপ তের বর্গফুটের কাছাকাছি। শিখরগুলি বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের রেখ দেউল ধরনের। একদ্বারবিশিষ্ট। মন্দিরগাত্রে 'টেরাকোটা'র সুন্দর কারুকার্য।

সিঙ্গুর

চন্দননগর মহকুমার অন্তর্গত আধা শহর, শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর রেলপথে অবস্থিত, হাওড়া থেকে দূরত্ব ৪২ কিমি। সিঙ্গুর ব্লকের অধীনে অনেকগুলি পঞ্চায়েত এলাকা আছে। প্রাচীন নাম সিংহপুর। সিঙ্গুরের বিভিন্ন মন্দিরের মধ্যে বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির, কালী মন্দির ও মনসা মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশালাক্ষী মন্দিরটির নির্মাণকাল ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দ। কালীমন্দিরটি উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত। দক্ষিণমুখী আটচালা মন্দির। সিঙ্গুরের পলতাগড় অঞ্চলে একটি প্রাচীন মনসামূর্তি আছে। সিঙ্গুরের জমিদার দ্বারিকানাথ জলঘাটা নামক

স্থানে রাধাগোবিন্দের নামে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। সিঙ্গুরের সপ্ত শিবমন্দির এবং আরও বহু দেবালয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত। সাতমন্দিরতলার মন্দিরগুলি প্রথাগত আটচালা, ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের গড়খাত সমন্বিত প্রাসাদোপম অট্টালিকার অবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। পুরুষোত্তমপুরে অবস্থিত পূর্বোক্ত বিশালাক্ষী মন্দির এবং মল্লিকপুরে অবস্থিত ডাকাতে কালী মন্দির মৃৎফলকের উপর অলঙ্করণযুক্ত।

সিতিপলাশী

তারকেশ্বর-ধনিয়াখালি রাস্তায় অবস্থিত গ্রাম। এখানকার বারোয়ারিতলায় একটি শিবমন্দির আছে, আটকোণা, এক শিখরবিশিষ্ট, নির্মাণকাল ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দ।

সিমলাগড়

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত সিমলা-ভিটাসীন পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৫১। সিমলাগড় গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর অবস্থিত, হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনে পাণ্ডুয়ার পরের স্টেশন। এখানে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পাল যুগের (দশম-একাদশ শতকের) একটি সূর্যমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। মূর্তিটি প্রভাস চন্দ্র পাল কর্তৃক দিল্লীর জাতীয় সংগ্রহশালায় প্রদত্ত হয়। পার্শ্ববর্তী পোঁটবা গ্রামে (জে এল নম্বর ৫৫) নন্দকিশোর রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যমুনা দিঘি ও গোপাল দিঘি উল্লেখযোগ্য। এখানে আনন্দময়ী দেবীর একটি আটচালা মন্দির আছে। এটি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংস্কৃত হয়। সংলগ্ন গ্রাম পাটরায় (জে এল নম্বর ৪৭) সুপ্রাচীন লৌকিক দেবতা বুড়োশিবের স্থান আছে।

সুলতান ছা

মগরা থানার অন্তর্গত গ্রাম, মগরা-মহানাদ রাস্তার উপর অবস্থিত। এখানে উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠিত চারটি আটচালা শিবমন্দির ও একটি দালান ধরনের কৃষ্ণমন্দির অবস্থিত।

সুখাড়িয়া

ভাগীরথী তীরস্থ সোমড়া ও বলাগড়ের মধ্যবর্তী সুখাড়িয়া গ্রামটি বলাগড় ব্লকের সোমড়া ২ নং পঞ্চায়েতের এলাকার অন্তর্গত (জে এল নং ৯৬)। ব্যাণ্ডেল বারহাওয়া লুপ লাইনের বলাগড় অথবা সোমড়াবাজার রেলস্টেশন থেকে রিকশায় যাওয়া যায়। এখানকার পুরাকীর্তিসমূহের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর বহু দেবালয় উল্লেখযোগ্য, অধিকাংশই স্থানীয় প্রসিদ্ধ মুস্তৌফী বংশের

প্রতিষ্ঠিত। এই বংশ শ্রীপুরের মুস্তৌফী বংশের শাখা। এঁদের আদি নিবাস ছিল নদীয়া জেলার উলা-বীরনগর। বংশের প্রতিষ্ঠাতা অনন্তরাম মুস্তৌফী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিরাগভাজন হওয়ার ফলে এতদঞ্চলে চলে আসেন। তাঁর ভাই রঘুনন্দন শ্রীপুরে বসতি করেন (শ্রীপুর দ্রষ্টব্য)।

সুখাড়িয়ার মন্দিরসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য আনন্দ ভৈরবীর মন্দির। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দিরটি বীরেশ্বর মুস্তৌফী কর্তৃক নির্মিত হয়। এই মন্দিরটি পঞ্চবিংশতিরত্ন মন্দিরের একটি বিশেষ নিদর্শন। দক্ষিণমুখী এই ত্রিতল মন্দিরটিতে মোট পঁচিশটি চূড়া বা শিখর আছে—প্রথম তলের প্রতিটি কোণে তিনটি হিসাবে বারোটি, দ্বিতীয় তলের প্রতিটি কোণে দুইটি হিসাবে আটটি, তৃতীয় তলে প্রতিটি কোণে একটি হিসাবে চারটি এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় শিখর। এই ধরনের পঞ্চবিংশতিরত্ন মন্দির পশ্চিমবঙ্গে আরও চারটি আছে—বর্ধমান জেলার কালনায় তিনটি এবং বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে একটি। মন্দিরের পরিমাপ ৩৬ বর্গফুট। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভূমিকম্পে আনন্দভৈরবী মন্দিরের সর্বোচ্চ পাঁচটি চূড়া ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেগুলিকে আবার নূতন করে স্থাপন করা হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহে বেদীর উপর শায়িত শিবের বক্ষোপরি উপবিষ্টা আনন্দময়ী-কালীর বিগ্রহ বর্তমান, উচ্চতায় প্রায় তিন ফুট। বাঁকানো কার্নিসযুক্ত এই মন্দিরের একতলার তিনদিকে বারান্দা বিদ্যমান, বারান্দার ছাদের অভ্যন্তরভাগ অবতলিত ও তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ সমন্বিত। খিলানগুলি পলকাটা এবং স্তম্ভোপরি ন্যস্ত। উপরের চূড়া বা শিখরসমূহ আড়াআড়িভাবে খাঁজকাটা। মন্দিরগাত্রে পোড়ামাটির ভাস্কর্য লক্ষণীয়। মৃৎফলকের উপর নানা দেবদেবীর মূর্তির মধ্যে রাধাকৃষ্ণ, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, সিংহবাহিনী, রামসীতা প্রভৃতিকে সনাক্ত করা যায়। এতদ্ব্যতীত রাজদরবারের চিত্রাবলী, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণের পরিচয় পাওয়া যায়। মন্দির এলাকার মধ্যে দুই সারিতে ছয়টি হিসাবে বারোটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত। দুইটি পঞ্চরত্ন, বাকি দশটি আটচালা। একটি পঞ্চরত্ন মন্দির গণেশের, বাকিগুলি সব শিবের।

দেওয়ান রামনিধি মুস্তৌফী কর্তৃক ১৭৩৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হরসুন্দরী কালীর মন্দিরটি নবরত্ন ধরনের, অর্থাৎ নয়টি শিখর বা চূড়াবিশিষ্ট। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরের ছাদ সমতল ও কার্নিস সরলরৈখিক। একতলার ছাদের চারকোণে চারটি ক্ষুদ্র কক্ষবিশিষ্ট বেলনাকার শিখর, দ্বিতলে ছাদের চারকোণেও অনুরূপ ক্ষুদ্রতর চারটি শিখর, এবং তদুপরি চারদিকে চারটি খিলানযুক্ত সর্বোচ্চ শিখর। দ্বিতলের প্রকোষ্ঠের প্রবেশদ্বারে তিনটি সমমাপের অর্ধবৃত্তাকার খিলান বর্তমান। খিলানের স্তম্ভগুলিতে বিদেশী শৈলীর আভাস পাওয়া যায়। গর্ভগৃহের ছাদের অভ্যন্তরভাগ অবতলিত। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে

মন্দিরটি সংস্কার করা হয় যার ফলে মূল বৈশিষ্ট্যগুলির অধিকাংশই এখন লুপ্ত। হরসুন্দরী কালীমন্দিরের এলাকার মধ্যে দুইটি পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট মন্দির এবং আরও বারোটি শিবমন্দির বর্তমান।

গঙ্গোটিয়া নামক খালের ধারে নিস্তারিণী কালীর সুবৃহৎ, দক্ষিণমুখী প্রায় পঞ্চাশ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট নবরত্ন মন্দির সুখাড়িয়ার আরও একটি দর্শনীয় বস্তু। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে কাশীগতি মুস্তৌফী এই মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দিরের গঠন পূর্বোক্ত হরসুন্দরী মন্দিরের অনুরূপ, তবে কয়েকক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। বেলনাকার শিখর বা চূড়াগুলির উপরিভাগের গঠন গোল গম্বুজের ন্যায়। এই মন্দিরেরও ছাদ সমতল এবং কার্নিস সরলরৈখিক কিন্তু কার্নিসের নিচে সারি সারি সমচতুষ্কোণ খোপের অলঙ্করণ বিদ্যমান। কৌণিক গহ্বর চতুষ্টয় লিঙ্গবিশিষ্ট, গর্ভগৃহের ভিতরের ছাদ অবতলিত ও আলম্বনিবদ্ধ। উপরিতলের সম্মুখভাগ তিনটি খিলানের দ্বারা শোভিত, বারান্দার ছাদ টালি নির্মিত এবং ডোরীয় ধরনের স্তম্ভোপরি স্থাপিত। মন্দিরস্থ দেবীমূর্তি কৃষ্ণপ্রস্তর দ্বারা নির্মিত।

গঙ্গাতীরে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির সম্ভবত সুখাড়িয়ার সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির, নির্মাণকাল ১৭০৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দ। সমতল ছাদবিশিষ্ট ইস্টকনির্মিত দক্ষিণ পশ্চিমমুখী এই মন্দিরটি বেশ উচ্চ ভিত্তির উপর স্থাপিত। মন্দিরের সামনের বারান্দা সমপার্শ্ববিশিষ্ট স্তম্ভোপরি ন্যস্ত। দুই পার্শ্বে খিলানযুক্ত উন্মুক্তিও বর্তমান। প্রবেশদ্বারের দুই দিকে খিলানের মধ্যে কুলুঙ্গী অবস্থিত। অবৈজ্ঞানিকভাবে সংস্কারের দরুন মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্তমানে অবলুপ্ত বললেই হয়।

সুখাড়িয়ার আনন্দভৈরবী মন্দির চত্বরের গণেশ মন্দিরটিও পুরাতন, অষ্টাদশ শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত। এটি একটি পঞ্চরত্ন মন্দির। ধনুকাকার কার্নিসের উপর অর্ধগোলাকৃতি ছাদ। চার কোণে চারটি ছোট খিলানের উন্মুক্তিসহ প্রকোষ্ঠ ধরনের শিখর, শিখরগুলির উপরিভাগ রেখ-দেউলের ভঙ্গীতে আড়াআড়িভাবে খাঁজ কাটা। ভিতরের ছাদ অবতলিত ও আলম্বনিবদ্ধ। কেন্দ্রস্থ শিখরটি গঠনের দিক দিয়ে পার্শ্বস্থ শিখরগুলির অনুরূপ, তবে আকারের দিক থেকে বৃহত্তর এবং অধিকতর উচ্চতাসম্পন্ন। তরঙ্গিত পলকাটা প্রবেশদ্বারের খিলানটি স্তম্ভনিবদ্ধ। সম্মুখভাগে কার্নিস ও প্রবেশদ্বারের মধ্যবর্তী অংশে মৃৎফলকের উপর ভাস্কর্য। দেবমূর্তি, রাজদরবারের চিত্রাবলী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ কারুকর্মের বিষয়বস্তু। চারদিকে যে চারটি স্তম্ভের জোরে কার্নিস ও ছাদ দাঁড়িয়ে আছে, সেই স্তম্ভগুলিও অলঙ্করণযুক্ত। মন্দিরটি যথেষ্ট ভাল অবস্থায় বিদ্যমান।

শিবমন্দিরগুলির উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। অধিকাংশ শিবমন্দিরই আটচালা এবং দেবী মন্দিরগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে

এবং উনবিংশ শতকের গোড়ার দিক। তবে আনন্দভৈরবী মন্দির চত্বরের একটি শিখরমন্দির পঞ্চরত্ন, চারদিকের অর্ধমাদলাকৃতি সরু খিলানের উন্মুক্তিসহ। উপরের মোচাকৃতি অংশ রেখ দেউল ধরনে আড়াআড়িভাবে খাঁজ কাটা, কেন্দ্রস্থ শিখর মাপে ও উচ্চতায় বড়। চারদিকে যে স্তম্ভগুলির কাঠামোর উপর মন্দিরের অবস্থিতি সেগুলির স্তরবেষ্টনী সৌকর্যময়। চারদিকের বাঁকানো কার্নিসের উপরের ছাদ অর্ধগোলাকৃতি। কার্নিস থেকে প্রবেশদ্বারের খিলান পর্যন্ত অলঙ্করণ, খিলান তরঙ্গিত পলকাটা, কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য সাদামাটা অথবা সূক্ষ্মাগ্র ধনুকাকৃতি। বহির্দেওয়ালের কোনগুলিতে চতুষ্কোণ ফলকের উপর রেখাবেষ্টনী ইত্যাদি।

সুখাড়িয়ার অন্যান্য পুরাকীর্তির মধ্যে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে নির্মিত মিত্র-মুস্তৌফীদের ঠাকুরদালান, রাধাজীবন মিত্র-মুস্তৌফীর ঠাকুরদালান ও প্রাসাদ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত। প্রথম ঠাকুর দালানটি প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত, দুইটি সমান্তরাল তোঁরণশ্রেণীর মধ্যে পাঁচটি করে ধনুকাকার ও তরঙ্গায়িত পলকাটা খিলান দিয়ে তৈরি। স্তম্ভগুলির শীর্ষদেশ কারুকার্যমণ্ডিত, কার্নিসের নিচে কারুকার্যমণ্ডিত খোপের সারি, বাইরের দেওয়ালে মূর্তি, পক্ষী ও পুষ্পের অলঙ্করণ। দ্বিতীয় ঠাকুরদালানটি দক্ষিণমুখী, আইওনীয় ধরনের স্তম্ভশ্রেণীর মধ্যে পলকাটা খিলান দিয়ে তৈরি, সমতল ছাদ বিশিষ্ট। প্রাসাদটির ক্ষেত্রে ইউরোপীয় স্থাপত্যরীতির প্রকাশ দেখা যায়। সামনে চওড়া বারান্দা সারিবদ্ধ ডোরীয় স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান, ভিনিসীয় ধরনের জানালা, ভিতরের তোরণশ্রেণীতে গ্রীক স্থাপত্য প্রভাব—সব মিলিয়ে দর্শকের নিকট আজও আকর্ষণীয় এবং একই সঙ্গে বেদনাদায়ক।

সুগন্ধ্যা

পোলবা-দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত সুগন্ধ্যা নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৮০। চুঁচুড়া রেলস্টেশনর পশ্চিমে ৫ কিমি দূরত্বে সুগন্ধ্যার অবস্থান। কুন্তী ও সরস্বতী নদীদ্বয় এই স্থানটিকে বেষ্টন করে আছে। এই গ্রামে শীতলাদেবী ও মহেশ নামক ভৈরবের মন্দির আছে। এছাড়া রায় পরিবার প্রতিষ্ঠিত বালগোপালেরও একটি মন্দির আছে।

সুন্দুরুস

আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত চিল্লাডাঙ্গি পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৩৬। পুরশুড়া থেকে দূরত্ব তিন কিমি। এখানকার মান্না বংশ প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী জনার্দনের মন্দির ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মন্দিরটি নবরত্ন, খাঁজকাটা শিখর বিশিষ্ট, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ সহ।

সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর কৃষ্ণ, রাজদরবারের দৃশ্য ও উদ্ভিজ্জধর্মী কারুকার্য। মূর্তিগুলি আকারে বেশ বড়।

সেনহাট

খানাকুল থানা ও ব্লকের অন্তর্গত রাজহাটি ২নং পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৮৩। খানাকুল থেকে সামান্য দূরত্বে অবস্থিত। এখানকার রাজরাজেশ্বর মন্দির স্থানীয় দত্তবংশ কর্তৃক ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি পঞ্চরত্ন, খাঁজবিহীন রেখ ধরনের বক্রশীর্ষ শিখরবিশিষ্ট, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথসহ। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর দেবতা, রামায়ণ কাহিনী, রাজদরবার ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী। মিত্রবংশ প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরটি ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি প্রথাগত আটচালা, সম্মুখভাগে সামান্য 'টেরাকোটা' অলঙ্করণযুক্ত। এছাড়া এখানে একটি বারোচালা মন্দির আছে, বক্রকার্নিস ও উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট। বারোচালা মন্দির হুগলী জেলায় খুব কমই দেখা যায়। পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত ইলছোবাতে একটি বারোচালার মন্দির আছে যদিও সেটি এটির মত উচ্চ চূড়াবিশিষ্ট নয়।

সেনেট

দাদপুর থানা ও পোলবা-দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত চুঁচুড়া রেলস্টেশন থেকে ১৬ কিমি পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান রাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষীর জোড়বাংলা ধরনের মন্দিরটি খুবই প্রসিদ্ধ। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী বর্তমান। দেবতা, রাজদরবারের দৃশ্য ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ এই চিত্রাবলীর বিষয়বস্তু। সুদূর অতীতে কেদারমতী নদী যখন খুবই বেগবতী ছিল, তখন পারাপারের জন্য দুই তীরে দুটি ঘাট নির্দিষ্ট ছিল। সেই দুটি ঘাটে উত্তর দিকে দ্বারবাসিনীতে বিষহরি দেবী এবং দক্ষিণে সেনেটে বিশালাক্ষী দেবী প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের সেবার জন্য কুচপালের নবাবের জমি দান করা আছে। বিশালাক্ষী বিশালাকার দ্বিভুজা। আশ্বিন মাসে তাঁর বার্ষিক উৎসব হয় এবং এখানে একটি বিরাট মেলা বসে। ফাল্গুন মাসে কৃষকেরা এই দেবী মন্দির চত্বরে রান্না উৎসব পালন করে। এটি ফসলের উৎসব, রাঁধাবাড়া করে সকলে একত্রে ভোজন করে।

সেলানপুর

আরামবাগ মহকুমার গোঘাট থানার অন্তর্গত বদনগঞ্জ-ফুলুই ২নং পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত গ্রাম, জে এল নম্বর ১৫৩। কয়াপাট থেকে কৃষ্ণনগর হয়ে সেলানপুরে যেতে হয়। এখানে একটি পরিত্যক্ত চারচালা মন্দির আছে। এই

মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর কারুকার্য যৎসামান্য। এখানকার দামোদর মন্দিরটি বহুলাংশে মাকড়া পাথর দিয়ে তৈরি। পরিমাপ ১৫ বর্গফুট। সমতল ছাদ ও বক্র কার্নিসযুক্ত। এখানে তৃতীয় আর একটি মন্দির আছে। এটি উনিশ শতকে নির্মিত আটচালা মন্দির। মন্দিরটির কার্নিস বাঁকানো নয় সমান। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বারের স্তম্ভে ও উপরে 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণ।

সোমসপুর

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত সোমসপুর-১ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৯৭। ধনিয়াখালি হয়ে সোমসপুর যেতে হয়। এখানে মুখোপাধ্যায় বংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত, বর্তমানে সংস্কৃত, পশ্চিমমুখী এই মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর দেবতা ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী বর্তমান। এই গ্রামে আর একটি শিবমন্দির গাত্রে 'শ্রীশ্রীরঘুনাথ শিবমস্ত শকাব্দা ১৭৫৯' লিখিত আছে। এই মন্দিরটি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশচন্দ্র শর্মা, রাজচন্দ্র শর্মা ও শিবচন্দ্র শর্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানকার শ্যামসুন্দর মন্দিরটিও প্রাচীন যদিও এটিকে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্নির্মাণ করা হয়। মন্দিরটি সমতল ছাদবিশিষ্ট দালান ধরনের, তিনটি সাধারণ ধরনের খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার। নাথ সম্প্রদায়ের দুখীরাম চিত্রকর প্রতিষ্ঠিত বুড়ো দামান এখানকার লৌকিক দেবতা, যাঁর কাছে মানত করলে সন্তানাদি লাভ হয় এইরকম জনশ্রুতি বর্তমান। পঞ্চরত্ন শিবমন্দিরটি গড়বাড়ি অঞ্চলে অবস্থিত। শ্যামসুন্দরের মন্দিরটি দালান ধরনের, আদি নির্মাণকাল ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ। মাঝেরপাড়ার বুড়োশিবের আটচালা মন্দিরটি অষ্টাদশ শতকে নির্মিত।

সোমড়া

বলাগড় থানা ও ব্লকের অন্তর্গত সোমড়া-২ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৩৭। ব্যাণ্ডেল বারহারোয়া লুপ লাইনে সোমড়াবাজার রেলস্টেশন আছে। সোমড়া অঞ্চলটি পূর্বে গুপ্তিপাড়ার মঠের সম্পত্তি ছিল। গুপ্তিপাড়া মঠের বিরাট কাছারিবাড়ির অবশেষ এখনও সোমড়ায় দেখা যায়। মধ্য একাদশ শতকে দেওয়ান রায়রায়ান রামচন্দ্র সেন এবং দেওয়ান রামশঙ্কর রায় নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিরাগভাজন হওয়ার ফলে এখানে বসতি স্থাপন করেন এবং তারপর থেকেই এই অঞ্চলের প্রভূত উন্নতি হয়। তাঁদের প্রাসাদোপম অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। যেখানে একটি প্রস্তরফলকে ইংরাজীতে লিখিত আছে যে 'এখানে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ান রায়রায়ান রাজা রামচন্দ্র বাস করতেন। রামশঙ্কর রায় অনেকগুলি মন্দির নির্মাণ করেন যেগুলির মধ্যে ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত জগদ্ধাত্রী মন্দির এবং ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত মহাবিদ্যার মন্দির

উল্লেখযোগ্য, প্রথমটি নবরত্ন এবং দ্বিতীয়টি পঞ্চরত্ন। জগদ্ধাত্রী মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৯ ফুট ৯ ইঞ্চি, প্রস্থে ২৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। মন্দিরের গর্ভগৃহ চতুষ্কোণ, আয়তাকার। গর্ভগৃহের চাল ক্রমহ্রস্বায়মান আকৃতিতে ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠে গেছে। পিরামিডাকার ছাদটিকে দূর থেকে উল্টানো নৌকার মত দেখায়, যা দ্রাবিড় স্থাপত্যরীতির পরিচায়ক। গঠনের ক্ষেত্রে উড়িষ্যার পীড়া দেউলেরও কিছু প্রভাব আছে। এছাড়া সোমড়ায় একটি অষ্টকোণ আটচালা মন্দির ও রেখধরনের শিখরবিশিষ্ট একটি পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ বিদ্যমান। (সুখাড়িয়া ও শ্রীপুর দ্রষ্টব্য)।

হামিরবাটি

আরামবাগ থানা ও ব্লকের অন্তর্গত মাধবপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত একটি গ্রাম, জে এল নম্বর ১২৭। হামিরবাটি যেতে হলে প্রথমে আরামবাগ থেকে মায়াপুরে আসতে হবে। মায়াপুর থেকে হামিরবাটির দূরত্ব সামান্য। এখানকার পুরাকীর্তি হিসাবে ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় রায় পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দামোদর মন্দির উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি প্রথাগত আটচালা, পূর্বমুখী, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথসহ। সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর দেবমূর্তি রামায়ণের কাহিনী এবং উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ।

হরাল

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত হরাল-দাসপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৭১। এখানে সাতটি মসজিদ আছে। যেগুলির মধ্যে বাদশাহ শাহ আলমের আমলে নির্মিত এক গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদটি সবচেয়ে প্রাচীন। এই মসজিদগাত্রে আরবীতে রচিত একটি লেখ বর্তমান। যদিও সেটির এখনও পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। এই মসজিদটি বরকতপাড়ায় অবস্থিত এবং এটির নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতক। উনিশ শতকে নির্মিত একটি এক-গম্বুজ মসজিদ মণ্ডলপাড়ায় অবস্থিত। হালদারপাড়ায় একটি তিন-গম্বুজ বড় ধরনের মসজিদ আছে। এটি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে শেখ মৌলা বক্স কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

হরিণাখালি

আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত কলাপাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। জে এল নম্বর ১৭। তারকেশ্বর থেকে দেউলপাড়া হয়ে হরিণাখালি যেতে হয়। এখানে সরকার বংশ প্রতিষ্ঠিত অষ্টাদশ শতকে নির্মিত সমতল ছাদ বিশিষ্ট ধর্মঠাকুরের একটি একদ্বার বিশিষ্ট দালান ধরনের মন্দির আছে। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটির সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর অল্প কয়েকটি মূর্তি আছে।

হরিপাল

হাওড়া-তারকেশ্বর রেলপথে অবস্থিত হরিপালের দূরত্ব হাওড়া থেকে ছয় কিমি। অনেকগুলি গ্রাম নিয়ে হরিপাল থানা ও ব্লক এলাকা গঠিত। হরিপালের পুরাতন নাম সিমুল। দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে নৃপতি কুলপালের পুত্র হরিপাল সিংহপুর বা সিঙ্গুরের পশ্চিমে স্বীয় নামানুসারে হরিপাল রাজ্যের পত্তন করেন। এই হরিপালের কন্যা কানড়ার বীরত্ব কাহিনী মাণিকলাল ও ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে বর্ণিত আছে। রাজা হরিপাল সম্ভবত বঙ্গের পালবংশের কোন শাখাভুক্ত ছিলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও হরিপাল একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে রাজবলহাট হতে হরিপালে কোম্পানীর এজেন্সি স্থানান্তরিত হয়। হরিপালে বহু প্রাচীন মন্দির আছে। সর্বাপেক্ষা পুরাতন ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রায় বংশ প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দের আটচালা মন্দির। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ২৬ ফুট ৭ ইঞ্চি প্রস্থে ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার ও সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী বিশিষ্ট। স্তম্ভশ্রেণীর উপর গঠিত সম্মুখস্থ নাটমন্দিরটি অবশ্য পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে। পঞ্চরত্ন রাসমঞ্চটিও স্থাপত্যশিল্পের একটি অপূর্ব নিদর্শন। বৃহৎ তোরণের মত সম্মুখভাগ, চারদিকে চারটি শিখর এবং কেন্দ্রস্থ সুউচ্চ শিখর সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে! রাধাগোবিন্দের স্নানমন্দিরটি প্রস্তরনির্মিত 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণশূন্য। নির্মাণকাল উনিশ শতকের মধ্যভাগ। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত সীতারাম মন্দির এবং ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ঘটকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির উভয়েই আটচালা, তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার এবং বহির্ভাগে 'টেরাকোটা' অলঙ্করণবিশিষ্ট। এছাড়া পূর্বোক্ত রায় বংশের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি শিবমন্দির আছে। এগুলির মধ্যে একটি পঞ্চরত্ন, একদ্বার বিশিষ্ট, রেখ ধরনের খাঁজকাটা শিখরসহ। বাকিগুলি আটচালা, মধ্য উনিশ শতকে নির্মিত এবং কমবেশি 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণযুক্ত। বর্ধমানের মহারাজা প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দির এবং ভড়দের জোড়া শিবমন্দির এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এগুলিও আটচালা, 'টেরাকোটা'র অলঙ্করণবিশিষ্ট এবং অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে নির্মিত। রায়পাড়ায় অবস্থিত শিবমন্দিরের সংখ্যা বারোটি অধিকাংশই অষ্টাদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত। তবে গম্বুজাকৃতি শিখরবিশিষ্ট মন্দিরটি সপ্তদশ শতকের, সম্ভবত রাধাগোবিন্দ মন্দিরের সমকালীন। এটি ১৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত হয়েছিল বলে প্রকাশ। এছাড়া ভট্টাচার্য পাড়া, ঘোষপাড়া ও হাজরাপাড়ায় কয়েকটি প্রথাগত আটচালা শিবমন্দির আছে। ভট্টাচার্যপাড়ায় অনন্তদেবের মন্দিরটিও আটচালা, নির্মাণকাল অষ্টাদশ শতক। গাঙ্গুলিপাড়ায় অবস্থিত উনিশ শতকে নির্মিত ছয়কোণা দোলমঞ্চটি মণ্ডপ ধরনের। ঘোষপাড়ায় একই সময়ে নির্মিত

একটি অষ্টকোণ দোলমঞ্চ বিদ্যমান। হরিপালের স্থাপত্যকীর্তিসমূহ অন্যান্য স্থানের তুলনায় একটু বেশি প্রাচীন ও বৈচিত্র্যময়।

হরিরামপুর

জাঙ্গীপাড়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত কোতলপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৫৯। জাঙ্গীপাড়া থেকে প্রসাদপুর হয়ে হরিরামপুর যেতে হয়। এখানে ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ঘোষবংশ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বর্তমানে পরিত্যক্ত দুটি 'টেরাকোটা' অলঙ্করণসমৃদ্ধ আটচালা শিবমন্দির আছে। পরিমাপ যথাক্রমে সাড়ে তের ও এগার বর্গফুট। এছাড়া এখানে একটি বুড়ো শিবের মন্দির আছে। এটিও আটচালা মন্দির। মধ্য উনিশ শতকে নির্মিত এবং বর্ণাঢ্য 'টেরাকোটা' অলঙ্করণে সজ্জিত।

হাটবসন্তপুর

আরামবাগ থানা ও ব্লকের অন্তর্গত মায়াপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৮৫। আরামবাগ থেকে ছয় কিমি দূরে অবস্থিত এখানকার জয়চণ্ডী মন্দিরটি আটচালা, নির্মাণকাল ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দ। দক্ষিণ-পশ্চিমমুখী এই মন্দিরটির সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর বর্ণাঢ্য চিত্রাবলী বিদ্যমান। কৃষ্ণ প্রভৃতি দেবমূর্তি, রামায়ণের কাহিনী, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ এই চিত্রাবলীর বৈশিষ্ট্য। জয়চণ্ডী ছাড়া এখানে একটি জোড়াশিব ও পৃথক শিবমন্দির আছে। সবগুলিই স্থানীয় চীনা বংশ প্রতিষ্ঠিত। জোড়া শিবমন্দিরের নির্মাণকাল ১৭৯১। পশ্চিমমুখী, আটচালা। বর্তমানে অবহেলিত ও ভঙ্গুর দশা। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর উদ্ভিজ্জধর্মী সামান্য কিছু অলঙ্করণ বিদ্যমান। অপর শিবমন্দিরটি পঞ্চরত্ন, দক্ষিণমুখী, বর্তমানে অবহেলিত ও ভঙ্গুর দশা। মন্দিরগাত্রে মৃৎফলকের উপর দেবতা, পক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ আছে। তবে সংখ্যায় পর্যাপ্ত নয়। এছাড়া এখানে নন্দীবংশ প্রতিষ্ঠিত একটি দুর্গাদালান আছে। নির্মাণকাল ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দ। এটি দক্ষিণমুখী, সমতল ছাদবিশিষ্ট, বহির্ভাগে অলঙ্করণ বর্জিত।

হাজিপুর

ধনিয়াখালি থানা ও ব্লকের অন্তর্গত সোমসপুর-২ পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ১৬। গুড়াপ রেলস্টেশন থেকে খানপুর হয়ে হাজিপুর যেতে হয়। এখানে মিত্রবংশ প্রতিষ্ঠিত গোপাল ও শিবের দুটি আটচালা মন্দির আছে। গোপাল মন্দিরটি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। শিবমন্দিরটির নির্মাণকাল মধ্য উনিশ শতক। উভয় মন্দিরেই সামান্য 'টেরাকোটা'র কাজ আছে, প্রধানত মৃৎফলকে দেবতা ও উদ্ভিজ্জধর্মী চিত্রাবলী।

হাজিপুর

গোঘাট থানার অন্তর্গত হাজিপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত। জে এল নম্বর ১৭০। কামারপুকুর থেকে বেঙ্গাই হয়ে হাজিপুর যেতে হয়। এখানকার লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরটি নবরত্ন, পরিমাপ ১৫ বর্গফুট। নির্মিত ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতল ছাড়াই মন্দিরে নয়টি শিখর সংযোজিত। তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার। সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর কারুকার্য। এখানে ঘোষবংশ প্রতিষ্ঠিত একটি পঞ্চরত্ন মন্দির আছে। নির্মাণকাল ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী, সম্মুখভাগে মৃৎফলকের উপর চিত্রাবলী, বিষয়বস্তু দেবতা, রামায়ণের কাহিনী, পশুপক্ষী ও উদ্ভিজ্জধর্মী অলঙ্করণ।

হাতনী

পাণ্ডুয়া থানা ও ব্লকের অন্তর্গত হরাল-দাসপুর পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত, জে এল নম্বর ৬৩। এখানে একটি পুষ্করিণী খননের সময় একটি চতুর্ভুজা দেবীমূর্তি ও একটি বিষ্ণুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। উভয় মূর্তিই পাল আমলের, দশম-একাদশ শতকে নির্মিত। মূর্তিদ্বয় বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত। এখানে উত্তরপাড়ায় দুটি আটচালা ধরনের শিবমন্দির আছে। একটি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। পূর্বপাড়ায় একটি রেখধরনের একশিখরবিশিষ্ট শিবমন্দির আছে। যেটি বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে নির্মিত। এছাড়া উত্তরপাড়ায় উনিশ শতকে নির্মিত সমতল ছাদবিশিষ্ট একটি ঠাকুরদালান আছে।

হাদা

হরিপাল রেলস্টেশন থেকে রিকশায় হাদায় যেতে হয়। এখানে অষ্টাদশ শতকে নির্মিত একটি আটচালা শিবমন্দির, ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত একটি আটচালা বিষ্ণুমন্দির এবং সমসাময়িককালে নির্মিত জোড়াবারান্দাযুক্ত একটি দুর্গাদালান আছে।

হারিট

দাদপুর-পোলবা ব্লকের অন্তর্গত হারিট নামেরই পঞ্চায়েত এলাকায় অবস্থিত গ্রাম। জে এল নম্বর ৯১। চুঁচুড়া স্টেশন থেকে সহজেই হারিট যাওয়া যায়। এই গ্রামে হরেকৃষ্ণ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ মন্দিরের রাধাগোপীনাথ ও মদনমোহনের বিগ্রহ বর্তমান। শ্যামদাস গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে প্রতিবছর বৈশাখী কৃষ্ণা পঞ্চমী থেকে তিন দিন ধরে এই মন্দিরে যে উৎসব হয় তাতে নানাস্থান থেকে বহু বৈষ্ণবের সমাবেশ হয়। মন্দিরটির ছাদ পূর্বে

মাদলাকৃতি ছিল, বর্তমানে সমতল। নিকটে ই একটি পঞ্চরত্ন দোলমঞ্চ অবস্থিত। মন্দির এবং দোলমঞ্চ উভয়েরই প্রতিষ্ঠাকাল উনিশ শতক।

হাসনান

পোলবা-দাদপুর ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম, জে এল নম্বর ৩৪। বেলমুড়ি রেলস্টেশন থেকে যাওয়া যায়। এখানে একটি নীল ঠির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

হুগলী

চুঁচুড়া ও হুগলী যমজ শহর, একই পৌর র অধীন। হুগলীতে পর্তুগীজদের উত্থান-পতনের কাহিনী আগেই বলা হ ছ। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে মুঘলদের অভিযানের ফলে পর্তুগীজরা উৎখাত হয়ে গেলে মুঘলরা হুগলীতে একজন ফৌজদার নিযুক্ত করে এবং সরকারী দপ্তরখানা সপ্তগ্রাম থেকে হুগলীতে স্থানান্তরিত করে। ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজ বণিকগণ যতদিন না পর্যন্ত নিজেদের নিজস্ব স্থানলাভ করেছিল ততদিন তাদের বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলীতেই বজায় রেখেছিল।

চুঁচুড়া থেকে হুগলী যাওয়ার পথে প্রথমেই পড়ে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত ত্রিকক্ষ, বারান্দা, ছাদের প্রতি কোণে মিনার ও চারদিকে সছিদ্র পরটযুক্ত মল্লিক কাসেম হাট মসজিদ। বারবার আগাগোড়া সংস্কারের ফলে এর প্রাচীনত্ব বোঝার কোন উপায় নেই। পিপুলপাতির মোড়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নির্মিত একটি বর্গাকার একগম্বুজী ও অলঙ্করণবর্জিত মসজিদ আছে। আরও অগ্রসর হলে ইমামবাড়ার সম্মুখে একটি ভগ্ন ও পরিত্যক্ত শিয়া মসজিদ বর্তমান। চকবাজারে দুটি পুরাতন মসজিদ আছে। প্রথমটির নাম শাহ সৈয়দ চাঁদ মসজিদ। এটি বর্গাকার, এক গম্বুজ বিশিষ্ট। জনশ্রুতি অনুযায়ী এই মসজিদটি হাজী মহম্মদ মহসীনের পিতার আমলে নির্মিত, দ্বিতীয়টির নাম শাহজাহান মসজিদ। এটিকে সপ্তদশ শতকের বলে মনে করা হয়। আয়তাকার ত্রিকক্ষবিশিষ্ট, বাঁকানো কার্নিস এবং বৃহৎ গম্বুজযুক্ত।

বালির মোড়ে থেকে ব্যাণ্ডেল যাওয়ার পথে ডানদিকে একটি গলিতে অবস্থিত একটি মসজিদ শাহ তোসদ্দক ফকির কর্তৃক ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত। শাহ তোসদ্দক ফকির সপ্তগ্রামের হোসেনাবাদ থেকে আগমন করেন। এই মসজিদ চত্বরেই তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর সমাধি আছে। মসজিদটি বর্গাকার, চার কোণে চারটি পুরু থামের জোরে দণ্ডায়মান, একদ্বারবিশিষ্ট। উপরে বড় গম্বুজ। পরবর্তীকালে মসজিদটির দেখাশোনা করতেন কায়েম ফকির। তিনি গত হওয়ার পর থেকেই এটি পরিত্যক্ত। আরও একটু পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে বলাগড় পল্লীতে বন মসজিদ অবস্থিত যা মুর্শিদকুলি খান

কর্তৃক নির্মিত বলে কথিত। ব্যাণ্ডেল গীর্জার সাবেকি জমিদারির এলাকার মধ্যেই এই মসজিদের অবস্থান। মসজিদটি আয়তাকার ত্রিকক্ষবিশিষ্ট। দুই দিকের কক্ষ কেন্দ্রস্থ কক্ষের সঙ্গে খিলানের প্রবেশদ্বারের দ্বারা সংযুক্ত। চারকোণে সুদৃঢ় ভিত্তিস্তম্ভ উচ্চতায় ছাদ অতিক্রম করে মিনারস্বরূপ দণ্ডায়মান, পিছনের দেওয়াল, চারটি স্তম্ভের দ্বারা চার অংশে বিভক্ত। বাঁকানো কার্নিস, নির্মাণকাল আনুমানিক ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ। গঠনশৈলী সুলতানী আমলের। বর্তমানে নবীকৃত।

পিপুলাপাতির মোড়ে অবস্থিত হুগলী-চুঁচুড়া পুরসভা ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়। এর সূচনা ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান পুরসভা ভবনের সম্মুখস্থ পুষ্করিণীটি খনন করা হয় এবং বৃক্ষাদি—বিশেষ করে পামগাছের সারি রোপণ করা হয়। পুরসভার ভিক্টোরিয়া হলটি ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। এটির উদ্বোধন করেন তৎকালীন জঙ্গীলাট স্যার চার্লস এলিয়ট। হুগলী ইমামবাড়ার উত্তরদিকে গঙ্গাতীরের যে বাড়িটি হুগলির জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আবাস হিসাবে ব্যবহৃত হয়—সেই বাড়িটি চুঁচুড়া বড়বাজারের দত্ত পরিবার কর্তৃক নির্মিত হয় উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। দ্বিতল এই ভবনটি অনেকটা বড় বাগানওয়ালা চৌহদ্দির মধ্যে অবস্থিত। পশ্চিমমুখী প্রবেশপথে গাড়িবারান্দা। পূর্বদিকেও গঙ্গাভিমুখী বারান্দা, জোড়া স্তম্ভের উপর নির্মিত। চকবাজারের পুরাতন কাছারি বাড়িটি বাংলো ধরনের। স্তম্ভ ও বারান্দাযুক্ত, নির্মাণকাল উনিশ শতকের গোড়ার দিক। বর্তমানে শিক্ষণ কলেজের সঙ্গে যুক্ত। পাশেই ব্রাঞ্চ স্কুল ভবন যেখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর 'দত্তা' উপন্যাসের তিন চরিত্র—বনমালী, জগদীশ ও রাসবিহারী—পড়াশোনা করতেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত এই বিদ্যালয় ভবনটি তৎকালীন জেলা জজ ডি সি স্মিথ এবং রাজা জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ জমিদারদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি পূর্বে হুগলী কলেজের শাখা বা ব্রাঞ্চ হিসাবে কাজ করত বলে ব্রাঞ্চ স্কুল নামে পরিচিত হয়। স্তম্ভযুক্ত বারান্দা এবং উদ্গত ত্রিকোণ ছোট পেডিমেন্টযুক্ত জানালার সারি এই ভবনটির স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য। উনিশ শতকের মধ্যভাগে নির্মিত চকবাজারের নর্মাল স্কুল ভবনটিও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এটি একতলা, সমতল ছাদ ও খিলানযুক্ত স্তম্ভশ্রেণী বিশিষ্ট। বড়াল গলিতে বিখ্যাত দানবীর গৌরী সেনের মন্দির ও বাসভবন অষ্টাদশ শতকে নির্মিত। মন্দিরের সামনে তিনটি খিলানযুক্ত বারান্দা, উপরে ত্রিকোণ পেডিমেন্ট। গৌরী সেন ব্যাণ্ডেল গীর্জার দেওয়ান ছিলেন। বড়াল গলিতে উনিশ শতকে নির্মিত বড়াল বাড়ির কথাও উল্লেখযেগ্য।

হুগলী ঘাট ও গরিফা রেলস্টেশনের সংযোগকারী জুবিলী ব্রীজ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত। মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে লর্ড

ডাফরিন এই সেতুর নামকরণ করেন। হক্স গ্রসওয়ে ও জেমস গুডউইন কোম্পানীদ্বয়ের তত্ত্বাবধানে এই সেতু নির্মিত হয়। প্রধান ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন জন লেসলী। যিনি জনসাধারণের মধ্যে সিজলী সাহেব নামে অধিকতর প্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইঞ্জিনীয়ার জে· ডি· বেগলার এই সেতুর নির্মাণকার্যের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। সেতুটি ক্যান্টিলিভার ধরনের, দৈর্ঘ্যে ১২০০ ফুট, তিন অংশে বিভক্ত। ৩৬০ ফুট লম্বা মধ্যভাগটি গঙ্গাগর্ভে প্রোথিত দুইটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত। অপর দুটি ভাগ ৪২০ ফুট করে লম্বা এবং এই দুটি ভাগকে মধ্যভাগের সঙ্গে এমন কৌশলে যুক্ত করা হয়েছে যে তাদের ভর ধারণের জন্য কোন স্তম্ভের প্রয়োজন হয়নি। সেতুর সংলগ্ন একটি খিলানপথ বা ডাক্ট ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চল্লিশ ফুট উপর দিয়ে সিকি মাইলের উপর দূরত্ব অতিক্রম করেছে যার উপর দিয়ে যাত্রীবাহী সকল ধরনের ট্রেন ও মালগাড়ি অক্লেশে যাতায়াত করে। সিমেন্টের সঙ্গে সম্পর্করহিত শুধু চুনসুরকি দিয়ে গাঁথা এই খিলান শ্রেণী দর্শকের বিস্ময় উদ্রেক করে। জুবিলী ব্রীজের ঠিক দক্ষিণে গঙ্গাতীরে পর্তুগীজদের নির্মিত হুগলী দুর্গের অবস্থান ছিল। বর্তমানে একটি প্রাকারের দুটি ভগ্নাংশ কেবল দৃষ্টিগোচর হয়। ব্রীজের ঠিক উত্তরে গঙ্গাতীরে একটি উদ্যানের মধ্যে হাজী মহম্মদ মহসীন ও তাঁর আত্মীয়বর্গের সমাধি বর্তমান। মহসীনের সমাধিটি চারটি উন্মুক্ত খিলানের উপর একটি গম্বুজ দিয়ে গঠিত। ছাদের চার কোণে এরই অতিক্ষুদ্র অনুকৃতি বিরাজমান। এখানে যাঁদের সমাধি আছে তাঁরা হলেন মহসীনের ভগ্নীপতি আলাউদ্দীন খান; ভগ্নী মন্নু বেগম, মাতা জনাব বেগম, পিতা আগা মহম্মদ মুতাহার এবং গুরুদেব সৈয়দ কামালুদ্দিন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে খান বাহাদুর আসরাফউদ্দীন আহমদের চেষ্টায় এই সমাধি সৌধ নির্মিত হয়।

মহসীনের সমাধি ক্ষেত্রের সামান্য উত্তরে হুগলী ইমামবাড়া। মহসীনের অর্থে এটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। বাস্তুকার ছিলেন সৈয়দ কেরামতুল্লা খান যার চিত্র হলঘরে রক্ষিত আছে। মধ্যে অঙ্গন, চারদিকে ঘিরে দ্বিতল কক্ষের সারি, কক্ষসারির সম্মুখস্থ অলিন্দ সুদৃশ্য স্তম্ভশ্রেণীর উপর বিন্যস্ত। চারটি করে বেলনাকার স্তম্ভের জোটের উপর পলকাটা কারুকার্যময় খিলানের সারি। কক্ষশ্রেণীর উপরে কারুকার্যখচিত আলিসা। সম্মুখভাগে উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত দ্বিতল কক্ষরাজির ঠিক মধ্যস্থলে প্রবেশপথটি সুদৃশ্য বিরাট পরিসরযুক্ত খিলানের দ্বারা গঠিত। সামনে বৃহদায়তন কাঠের দরজা। প্রবেশপথের ঠিক উপরই একজোড়া টাওয়ার। চারতলা ও বেলনাকার, যেগুলির মধ্যে ঘোরানো সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির সংখ্যা ১৫২। টাওয়ারদ্বয় মধ্যস্থ একটি ত্রিতল শিখরকক্ষ দ্বারা সংযুক্ত। ত্রিতলের উচ্চতম কক্ষে একটি ঘড়ি

আছে, মধ্যকক্ষে আছে ঘড়ির তিনটি ঘণ্টা যেগুলির ওজন যথাক্রমে ৮০ মণ, ৭০ মণ ও ৪০ মণ। নিম্নকক্ষে আছে ঘড়ির যন্ত্রপাতি। প্রবেশদ্বার অতিক্রম করে গেলে বিশাল বর্গাকার বাঁধানো উঠান, মধ্যে একটি আয়তাকার চৌবাচ্চা। উঠান পার হলে মূলভবন, হলঘরের আকৃতিবিশিষ্ট। দৈর্ঘ্যে, বিস্তারে ও উচ্চতায় বিশাল। সামনে সোপানশ্রেণী, ছয়টি সরু স্তম্ভের উপর ঝোলানো বারান্দা, অভ্যন্তরে কারুকার্যময় চারটি খিলানের সারি। কোরাণপাঠের মঞ্চ, মানতের স্থান ও দৃষ্টিনন্দনভাবে রক্ষিত ধর্মীয় সামগ্রী। সিলিং থেকে প্রলম্বিত নানা আকারের ঝাড়লণ্ঠন। দেওয়ালে উৎকীর্ণ কোরাণের বাণী। পশ্চাতে গঙ্গাতীরের পূর্বমুখী দেওয়ালে পারসিক ও ইংরাজী ভাষায় মহসীনের উইল উৎকীর্ণ। গঙ্গাতীরে সুউচ্চ প্রাকার। সেখানে একটি সূর্যঘড়ি আছে, ভারতীয় স্ট্যান্ডার্ড টাইমের সঙ্গে যার সময়ের মাত্র আট মিনিটের ফারাক।

বালির মোড়ের অনতিদূরে প্রধান রাস্তার উপর গঙ্গাতীরে অবস্থিত ব্যাণ্ডেল গীর্জা বঙ্গদেশের সর্বপ্রাচীন খ্রীষ্টীয় উপাসনালয়। পর্তুগীজ ভাষায় ব্যান্ডেল শব্দের অর্থ মাস্তুল। ব্যাণ্ডেল গীর্জার দক্ষিণে একটি জাহাজের মাস্তুল প্রোথিত আছে। যেটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিকার কর্তৃক সংরক্ষিত। স্থানীয় খ্রীষ্টীয় কিংবদন্তী অনুযায়ী হুগলীতে মুঘল আক্রমণের সময় গীর্জায় অধিষ্ঠিতা মাতা মেরীর মূর্তিটিকে নিয়ে একজন ভক্ত নদীতে লাফিয়ে পড়েন। মূর্তি বা তার ভক্তটির কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। গীর্জার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দিন আশ্চর্যজনকভাবে মূর্তিটিকে নদীর তীরে পাওয়া যায়। ওইদিনই ঝড়ে বিধ্বস্ত একটি পর্তুগীজ জাহাজ গীর্জার ঘাটে উপস্থিত হয় এবং জাহাজের ক্যাপ্টেন কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ মাতা মেরীর উদ্দেশ্যে একটি মাস্তুল নিবেদন করেন। ব্যাণ্ডেল গীর্জা ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়, যদিও অন্যসূত্রে একটি প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ বিবরণের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দকে এই গীর্জার আদি নির্মাণকাল হিসাবে ধরা হয়েছে। মুঘলগণ কর্তৃক ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই গীর্জা ধ্বংস হওয়ার পর ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে গোমেশ ডে সেটোর প্রচেষ্টায় তা পুনর্গঠিত হয়। পরবর্তীকালে আরও সংযোজন ও পরিবর্তন করা হয়। দিল্লীর মুঘল বাদশাহ গীর্জার পুনর্গঠনকালে সহায়তা করেন এবং এই গীর্জাকে ৭৭১ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। এটি শুধু একটি গীর্জাই নয় সেই সঙ্গে মনাস্টারি বা সংঘারামও বটে। সেই হিসাবে অনেকটা জায়গা জুড়ে অবস্থিত বহুকক্ষবিশিষ্ট প্রাসাদের সঙ্গে এই গীর্জা তুলনীয়। গীর্জার সামনে দুটি প্রবেশ তোরণ, একটি পশ্চিমমুখী, অপরটি উত্তরমুখী। কিন্তু বর্তমানে প্রবেশপথ গঙ্গার দিক থেকে পূর্বদিকে। গীর্জাটি আয়তাকার, সমতল, ছাদবিশিষ্ট, কেন্দ্রশালা ও পার্শ্বশালা যথারীতি বিভাজিত, ভেস্ট্রী, পর্চ, লেডী চ্যাপেল প্রভৃতি যথাযথভাবে সংস্থাপিত,

স্তম্ভনির্মিত পার্শ্ববারান্দা, উদ্গত সরদলযুক্ত জানালা, উত্তর পশ্চিমে শিখরভবন, শিখরের উপর ক্রশ, শিখর সংলগ্ন দ্বিতলের ছাদের উপর ত্রিকোণাকৃতি পেডিমেন্টযুক্ত দ্বিতীয় একটি শিখরকক্ষ। লেডী চ্যাপেলে মাতা মেরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। তিনি 'আওয়ার লেডী অফ হ্যাপি ভয়েজ' নামে পরিচিতা। শিখরভবনটি পাঁচটি তল বিশিষ্ট। পশ্চিমদিকের শিখর সংলগ্ন অংশটি দ্বিতল এবং বহুকক্ষবিশিষ্ট। অভ্যন্তরভাগ চমৎকার কারুকার্যময়। ব্যাণ্ডেল গীর্জায় নানাস্থান থেকে প্রত্যহ বহু দর্শনার্থী আসেন।

প্রাসঙ্গিক গ্রন্থপঞ্জী

ঘোষ, বিনয়, **পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৯৫৭।**

দত্ত, অমর, **কাঙ্গাল হরিনাথের গ্রামবার্তা প্রকাশিকা,** কলিকাতা, ১৯৯০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ, **সংবাদপত্রে সেকালের কথা, দ্বিতীয় খণ্ড,** কলিকাতা, ১৯৪৯।

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস, **বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,** কলিকাতা, ১৯১৭; 'সপ্তগ্রাম', **সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৫ সংখ্যা, ১৯০৯।**

বসাক, রাধাগোবিন্দ, **সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত রামচরিত,** দ্বিতীয় সংস্করণ, **বাঙ্গালীর সারস্বত সাধনা,** তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৮।

ভট্টাচার্য, নরেন্দ্রনাথ, 'চুঁচুড়াঃ একটি প্রাচীন ডাচ উপনিবেশ', **হুগলী মহসীন কলেজ সার্ধশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ,** চুঁচুড়া, ১৯৮৭।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র, **বাংলাদেশের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড,** দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা ১৯৭৩; ঐ, **তৃতীয় খণ্ড,** কলিকাতা, ১৯৭৪।

মিত্র, সুধীরকুমার, **হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, তিন খণ্ড,** কলিকাতা, ১৯৬৩; **হুগলী জেলার দেব দেউল,** কলিকাতা, ১৯৬৫।

মুখোপাধ্যায়, সুখময়, **বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর,** কলিকাতা, ১৯৬২।

রায়, নীহাররঞ্জন, **বাঙ্গালীর ইতিহাস; আদি পর্ব,** কলিকাতা, ১৯৪৯।

শেঠ, হরিহর, **পুরাতনী,** চন্দননগর, ১৯৩৫; **প্রাচীন চন্দননগর পরিচয়,** কলিকাতা, ১৯৩২.

সান্যাল, মনস্বিতা, 'সপ্তগ্রাম', **ঐতিহাসিক, ৪ সংখ্যা,** জানুয়ারি ১৯৭৭।

Abul Fazl-i-Allami, **Ain-i-Akbari,** English translation by H.S. Jarret and J. N. Sarkar, Calcutta, 1949.

Banerji, A. K., **West Bengal District Gazetteers : Hooghly,** Calcutta, 1972.

Blakiston, J.F. (ed) **Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1934-35,** Delhi, 1937.

Bhattasali, N. K., 'Antiquity of the Lower Ganges and Its Courses,' **Science and Culture,** Calcutta, 1941.

Campos, J.J.A., **History of the Portuguese in Bengal**, Calcutta, 1919.

Crawford, D. G., **Hooghly Medical Gazetteer,** Calcutta, 1903,.; 'Place of Historical Interest in Hooghly District,' **Bengal Past and Present, Vol.II.**

Chakravarti, M. M., 'Pre-Mughal Mosques in Bengal,' Journal of the Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1910.

Chakravarti, P.N., 'Some Sites of Interest and Institutions of Note in Serampore,' **Serampore Municipality Centenary Celebration Souvenir,** 1965.

Datta, K.K., **The Dutch in Bengal and Bihar,** Patna, 1948.

Dey, N. L., **A Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India,** Calcutta, 1899.

Dey, S.C., **Hooghly Past and Present**, Calcutta, 1906.

Dodwell, H.H. (ed), **The Cambridge History of India, Vols. V-VI,** Cambridge, 1922.

Hunter, W.W., **Statistical Accrents of Bengal, Vol. III,** London, 1876.

Khan, S. Gholam Hossein, **Seir Mutaqherin, 4 Vols.,** edited and translated by anonymous scholars, Calcutta, 1902.

Majumdar, R.C., **History of Bengal, Vol. I,** Dacca University, Calcutta, 1943,.

Marshman, J.C., 'Note on the Right Bank of the Hooghly,. **Calcutta Review, Vol. IV.**

McCutchion, D., Late Medieval Temples of Bengal, Calcutta, 1972.

Michell, G., **Brick Temples of Bengal,** New Delhi, 1983.

Mitra, A. (ed), **Census 1951, West Bengal District Handbooks : Hooghly,** Calcutta, 1952.

Money, D., An Account of the Temples of Triveni,' **Journal of the Asiatic Society,** Calcutta, 1847.

O' Malley, L.S.S and Chakrabarti, M.M., **Bengal District Gazetteers : Hooghly,** Calcutta, 1912.

Prakash, Om, 'The Dutch East India Company in Bengal' **Indian Economic and Social History Review, Vol. IX, 1972.**

Roy, B. (ed.), Census 1961, West Bengal District Census Handbooks : Hooghly, Calcutta, 1966.

Risley, H.H., **Tribes and Castes of Bengal,** Calcutta, 1891-92.

Sarkar, J.N. (ed.), **History of Bengal, Vol. II,** Dacca, 1948.

Sen, P.C., 'Some Aspects of Ancient Radha,' **Indian Historical Quarterly, Vol. VIII,** 1932.

Sen, S.P. **The French in India,** Calcutta 1958.

Sengupta, Gautam, New Evidence on Early Bengal Sculpture **N. K. Bhattsali Centenary Volume,** edited by Debala Mitra and Gouriswar Bhattacharya, Delhi, 1989.

Seth, M. Jacob, **Armenians in India,** London, 1937.

Toynbee, G., **A Sketch of the Administration of the Hooghly District,** Calcutta, 1888.

Yule, H., **The Diary of William Hedges, 3 Vols.,** London, 1887-89.

নির্ঘণ্ট

* পুরাকীর্তিস্থলগুলির নাম পৃষ্ঠা উল্লেখ করে সূচীপত্রে দেখানো হয়েছে বলে, নির্ঘন্ট-র অন্তর্ভূক্ত হয়নি।

১। রাধাগোবিন্দ মন্দির ঃ আঁটপুর নীচে ঐ মন্দিরেরই টেরাকোট শিল্পের নিদর্শন। (পৃঃ ৩৮)

২। আঁটপুরের রাধাগোবিন্দ মন্দিরের টেরাকোটার কারুকার্য। (পৃঃ ৩৮)

৩। ভগ্ন ও পরিত্যক্ত আটচালা মন্দির ঃ ইদলবাটি। (পৃঃ ৪২)

৪। মন্দির চত্বর ঃ গুপ্তিপাড়া। (পৃঃ ৫৬)

৫। গুপ্তিপাড়ার মন্দিরে টেরাকোটার অলংকরণ। (পৃঃ ৫৬)।

৬। রাধাকান্ত মন্দির ঃ গোস্বামী-মালিপাড়া। (পৃঃ ৬০)
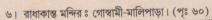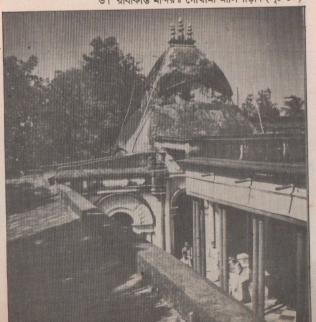
৭। নন্দদুলাল মন্দির ঃ চন্দননগর; ১৭৪০ সালে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এখানেই ডুপ্লে ও ক্লাইভের যুদ্ধ হয়। মন্দিরের গায়ে এখনও কামানের গোলার দাগ আছে। (পৃঃ ৬৩)

৮। দোলমঞ্চ ঃ চন্দননগর; বর্তমানে অবলুপ্ত। (পৃঃ ৬৩)

৯। সেক্রেড হার্ট বা পবিত্র হৃদয় গীর্জা চন্দননগর। (পৃঃ ৬৫)

১০। সেন্ট জোসেফ কনভেন্ট ঃ চন্দননগর। (পৃঃ ৬৫)

১১। ডাচ গীর্জা ঃ চুঁচুড়া; অধুনা লুপ্ত। (পৃঃ ৬৯)

১২। ষণ্ডেশ্বর মন্দিরের নবীকৃত শিখরদেশ
চুঁচুড়া। (পৃঃ ৭০)

১৩। সুসানা আন্না মারিয়ার সমাধিঃ চুঁচুড়া। (পৃঃ ৭২)

১৪। ডাচ সমাধিক্ষেত্র ঃ চুঁচুড়া। (পৃঃ ৭১)

১৫। আর্মেনীয় গীর্জা ঃ চুঁচুড়া। (পৃঃ ৭০)

১৬। তারকনাথ শিবের মন্দির
তারকেশ্বর। (পৃঃ ৭৭)

১৭। দশগম্বুজ মসজিদ ঃ ত্রিবেণী (পৃঃ ৮০)

১৮। জাফর খান গাজীর
আস্তানা ঃ ত্রিবেণী। (পৃঃ ৭

১৯। ত্রিবেণীতে জাফর খান গাজীর সমাধির
কারুকার্য। (পৃঃ ৭৯)

২০। টাটেশ্বরনাথের মন্দির ঃ পাউনান। (পৃঃ ৮৯)।

২১। বাইশ দরওয়াজা মসজিদের অবশেষ
পাণ্ডুয়া। (পৃঃ ৯০)

২২। কুতুব সাহিব মসজিদ ঃ পাণ্ডুয়া। (পৃঃ ৯১)
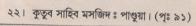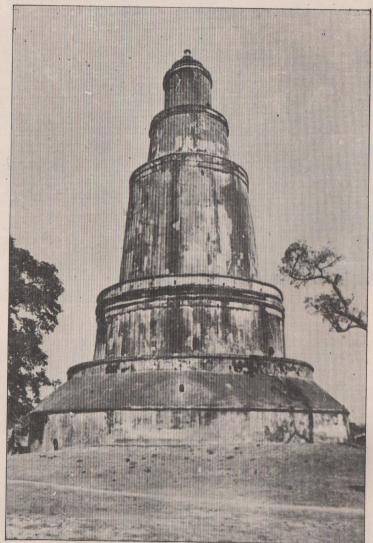
২৩। ফিরুজ মিনার ঃ পাণ্ডুয়া। (পৃঃ ৯০)

৩২। জগন্নাথ মন্দির ঃ মাহেশ। (পৃঃ ১১৭)

৩৩। রাধাকান্ত মন্দির ঃ রাজবলহাট। (পৃঃ ১১৯)

৩৪। ভাস্কর্যে অন্নপূর্ণা ঃ শ্রীরামপুর।
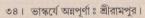
৩৫। কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের বাসভবন ঃ শ্রীরামপুর। (পৃঃ ১২৮)

৩৬। ডেনীয় কবরখানা ঃ শ্রীরামপুর। (পৃঃ ১২৮)

৩৭। সেন্ট ওলাফ গীর্জা
শ্রীরামপুর। (পৃঃ ১২৮)

৩৮। মিশন কলেজ
শ্রীরামপুর। (পৃঃ ১২৯)

। আনন্দ ভৈরবীর
মন্দির ঃ সুখাড়িয়া।
(পৃঃ ১৩৬)

৪০। বিশালাক্ষীর মন্দির ঃ সেনেট। (পৃঃ ১৩৯)

৪১। হাজী মহম্মদ মহসীনের সমাধি
হুগলী। (পৃঃ ১৪৭)
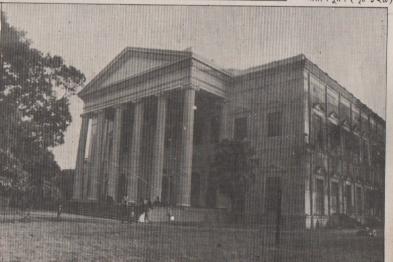
৪২। মল্লিক কাসেম হাট মসজিদ
হুগলী। (পৃঃ ১৪৫)

৪৩। ইমামবাড়াঃ হুগলী। (পৃঃ ১৪৭)

৪৪। ব্যাণ্ডেল গীর্জাঃ হুগলী। (পৃঃ ১৪৮)

৪৫। হুগলী ইমামবাড়ার ভিতর। (পৃঃ ১৪৮)

আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রস্তুত ত্রিবেণীতে প্রাপ্ত কৃষ্ণ প্রস্তরের সূর্যমূর্তি—রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা।
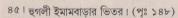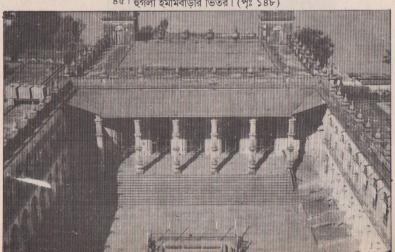
আনুমানিক নবম শতকে নির্মিত বৈঁচিতে প্রাপ্ত সবুজাভ ক্লোরাইট পাথরের বিষ্ণুমূর্তি রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব সংগ্রহশালা।
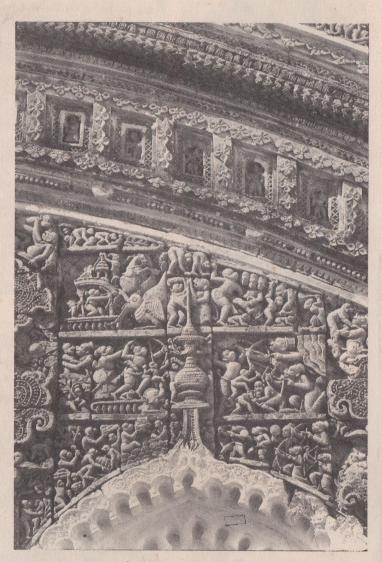
৪৮। গোপীনাথ মন্দিরের কারুকার্য ঃ দশঘরা (পৃঃ ৮১)